এই জগৎই ওদের চোখে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
৯ই পৌষ ১৩৫০

প্রকাশক :

অমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রণ :

কমলা সরকার
বীণাপাণি প্রেস
১৯ কৃষ্ণদাস পাল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

স্নেহের মানবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ও নাৎবৌ অনিন্দিতার হাতে

আশীর্বাদসহ

ব. ভ. ম.

ভূমিকা

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এই গল্পসংগ্রহটির মধ্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত গল্পকেই একত্র সংকলনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলা কথাশিল্পীদের মধ্যে তাঁকে অনন্য বলা চলে। অবশ্য শিশু-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে 'শিশু' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার মধ্যে। 'কাবুলিওয়ালা'র মিনি এবং 'সে'র পুপুকে মনে রেখেও বলা যায় তাঁর কথাসাহিত্যে এই জিনিসটির দৃষ্টান্ত তেমন পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট কয়েকটি শিশু-চরিত্র তাঁর কথাসাহিত্যের আকাশে মৃদু-দীপ্তি-বিকীরণকারী নক্ষত্রের মত বিরাজ করছে। শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি ইন্দ্রনাথ ও রামকে বয়সের দিক্ দিয়ে শিশু বলে গণ্য করা যায় না, যদিও তাদের মন শিশু-মনেরই সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও কেউ কেউ শিশু-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভল্লু-সর্দার' গল্পে এই শক্তির নিদর্শন মেলে; কিন্তু শরদিন্দুবাবু এই ধরনের দ্বিতীয় কোন গল্প লেখেন নি। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র অপুর কথা সকলেরই মনে আসবে। শিশু অপুর চিন্তা-ভাবনাকে তিনি যেভাবে রূপায়িত করেছেন, তা সত্যই অসামান্য। কিন্তু অপু-চরিত্র আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজেরই চরিত্র। নিজের শৈশবের চিন্তাভাবনা, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তিনি পরিণত বয়সের স্মৃতিতে অবিকলভাবে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারই নিখুঁত চিত্রণ সাধিত হয়েছে শিশু অপুর চরিত্রে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশু-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ-দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে অপুকে নেওয়া যায় না; এই জাতীয় অন্য কোন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেন নি সে কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের জন্যে লেখা কয়েকটি গল্পে শিশু-মনস্তত্ত্বের উপভোগ্য রূপায়ণ মেলে; অবশ্য মনস্তত্ত্বের (সে শিশু বা বয়স্ক যারই হোক্ না কেন) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শিশু-সাহিত্যে ঠিক্ চলে না, কারণ শিশু পাঠক-পাঠিকারা তা ভালমত বুঝতে ও তার রসগ্রহণ করতে পারে না; এই অসুবিধা

সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্র অসাধারণ প্রতিভার বলেই কয়েকটি শিশুপাঠ্য গল্পে আলোচ্য বিষয়ে সীমিত সাফল্য অর্জন করেছেন।

কিন্তু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বহু গল্পে শিশু-মনস্তত্ত্বকে শুধু নিপুণভাবে রূপায়িত করেন নি, তাঁর গল্পগুলি পড়লে মনে হয় শিশু-মনের প্রত্যন্ততম প্রদেশও তাঁর অনধিগত নেই। বস্তুতপক্ষে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে বাংলা কথাসাহিত্যে, বিশেষত বাংলা ছোটগল্পে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই রয়েছেন। এই বিষয়ের গল্প রচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মোহিতলাল মজুমদার থেকে সুরু করে নিতান্ত সাধারণ পাঠক পর্যন্ত সবাই স্বীকার করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে আমরা তাঁর লেখা এই বিশেষ শ্রেণীর সব গল্পই সংগ্রহ করতে পেরেছি বলে আমাদের ধারণা। তবে কোন গল্প আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। 'পোনুর চিঠি' বইয়ের গল্পগুলিরও বিষয়বস্তু শিশু-মনস্তত্ত্ব, কিন্তু এই বইটির রচনারীতি একটু স্বতন্ত্র ধরনের বলে একে আমরা এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করি নি। 'পোনুর চিঠি'কে এ-বইয়ের পরিপূরক বই বলে গণ্য করতে হবে।

এই বইয়ের গল্পগুলির বিশদ সমালোচনা আমরা করব না। কারণ তা করতে গেলে গল্পগুলির বিষয়বস্তুরও পরিচয় দিতে হয়; কিন্তু এই গল্পগুলির অধিকাংশের শেষে এমন চমৎকার একটি surprise রয়েছে যে বিষয়বস্তুর পরিচয় দিলে প্রথম-পাঠকের কৌতূহলকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে এই গল্পগুলিকে দেখলে একটা কথাই উপলব্ধি করতে হয় যে শিশুদের জগৎ কত বিচিত্র, তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা, গর্ব, ঈর্ষ্যা, অনুকরণপ্রবৃত্তি, অকপট বিশ্বাসপ্রবণতা—সমস্ত কিছুর মধ্যেই কত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য আছে, যা ইতিপূর্বে আমরা কখনই লক্ষ করিনি। এ সব ব্যাপারে এক শিশুর সঙ্গে আর এক শিশুর যে কত পার্থক্য, তা লেখক খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তা'ই নয়, একই শিশুর এক বয়সের মনের সঙ্গে আর এক বয়সের মনের যে কত তফাৎ, তা উপলব্ধি করা যায় 'ননীচোরা' ও 'খোকা' গল্প দুটি পরপর পড়লে।

এই গল্পগুলির মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর অল্প-বয়স্ক আত্মীয়-আত্মীয়াদের প্রভাবও অল্প নয়। বিখ্যাত 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের রাণু বাস্তব চরিত্র, লেখকের ঐ নামের একজন ভাইঝি (লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিভূষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভাল নাম কণিকা) সত্যিই ছিল (এখনও আছেন, তবে বর্তমানে তিনি প্রৌঢ়বয়স্কা); :তাকে প্রথম ভাগ পড়াবার প্রচেষ্টায় লেখককে

বারবার যে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছিল, তারই প্রায় বাস্তব, কৌতুকস্নিগ্ধ আলেখ্য পাওয়া যায় আলোচ্য গল্পটিতে। গল্পের রাণু লেখাপড়া শিখবে বলে মেজকাকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা কতকটা পালন করেছিল, 'দাঁতের আলো' গল্পে তার নিজের হাতে লেখা চিঠি থেকে (সে চিঠি ভুল বানানে লেখা হলেও) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তব রাণুও কিছু বিদ্যা অর্জন করেছেন।

'রাণুর প্রথম ভাগ' ছাড়া আরও চারটি গল্পে রাণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ গল্পগুলিতে তার বয়স বেড়েছে, 'বাঘ' গল্পে সে সন্তানের জননী—কিন্তু তার ছেলে-মানুষী একটুও কমে নি। অবশ্য এই গল্পগুলিতে অন্য যাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তারা শিশুই।

লেখকের আরও কয়েকজন ভাইপো-ভাইঝির নামও এই প্রসঙ্গে করতে হয়।

লেখকেরা আট ভাই—শশিভূষণ, বিভূতিভূষণ, হরিভূষণ, ইন্দুভূষণ, অরবিন্দভূষণ, মণিভূষণ, অবনীভূষণ ও বিনয়ভূষণ। এঁদের মধ্যে শশিভূষণের কন্যা রেখা ও ছবি (প্রতিমা), হরিভূষণের পুত্র বাদল (অজিতকুমার) ও কোঁদন (সুনীলকুমার), কন্যা মৈয়া (জয়ন্তী), ইন্দুভূষণের কন্যা আভা ও ডলি (অপর্ণা), অরবিন্দভূষণের পুত্র তরুণ (তরুণকুমার) ও বাবু (বরুণকুমার) এবং মণিভূষণের পুত্র মিটু (দেবাশিস) ও বাবুল (মনোজকুমার)—এরা স্বনামেই এ-বইয়ের কয়েকটি গল্পে দেখা দিয়েছে। 'মাসী' গল্পের তুলতুলও (মণিভূষণের শ্যালিকা) বাস্তব চরিত্র।

ভাইপো-ভাইঝিদের বাপ-মা থাকা সত্ত্বেও লেখকই ছিলেন তাদের অভিভাবক। এদের সঙ্গে লেখকের যে মধুর সম্পর্ক ছিল, তারই প্রতিচ্ছবি এই গল্পগুলি থেকে পাওয়া যায়। আজ তাঁর ভাইপো-ভাইঝিরা প্রাপ্তবয়স্ক (ডলি কয়েক বছর আগে পরলোকগমন করেছেন), কিন্তু সেই মধুর সম্পর্কে আজও এতটুকু চিড় ধরে নি। আমি দ্বারভাঙ্গায় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে নিজেই এর কিছু পরিচয় পেয়েছি। এই সব গল্পে লেখক শিশু ভাইপো-ভাইঝিদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অবিকলভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন ; তবে গল্পগুলির বিষয়বস্তু সবটাই সত্য নয় ; তার মধ্যে অনেকখানিই কল্পনা ও অতিরঞ্জন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের রাণুর বিবাহ-ঘটিত অংশটা কল্পিত ; বাস্তব রাণুর বিবাহ অল্প বয়সে হলেও অত অল্প বয়সে হয় নি এবং তার মেজকাকাই (লেখক) নিজে সম্বন্ধ করে তাকে পাত্রস্থ করেছিলেন—এ ব্যাপারে তাঁর বাবার কোন জেদাজেদি ছিল না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যায়। লেখক শুধু তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের মেজকাকা নন, তাঁর অনুজদের পুত্রকন্যারাও (দু-একজন বাদে) তাঁকে 'মেজকাকা' বলেই সম্বোধন

করে। সংশ্লিষ্ট গল্পগুলির মধ্যেও এর ইঙ্গিত আছে।

বর্তমান সংকলনগ্রন্থের গল্পগুলি শিশুদের নিয়ে লেখা হলেও বিশেষভাবে বয়স্কদেরই পাঠ্য—শুধু রসের দিক্ দিয়ে নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়েও। কোন কোন গল্পে বড়দের প্রেম ও বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে শিশুরা ভূমিকা গ্রহণ করেছে দেখতে পাই। দু'একটি গল্পে আবার শিশুদের বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের হাস্যকর কার্যকলাপও বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন গল্পেই শিশু-চরিত্র শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করে নি।

এ-বইয়ের দু'টি গল্প সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। 'দিদিমণির বেড়াল' গল্পটি ইতিপূর্বে লেখকের 'আনন্দ-নট' বইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে গল্পটির যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে—এ-বইয়ে লেখক তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন এবং গল্পটির এই পরিণতিই চূড়ান্ত। 'আবিষ্কার' গল্পটি লেখকের সর্বাধুনিক রচনা—গত ৬ই নভেম্বর, গল্পটি এর আগে কোথাওই মুদ্রিত হয় নি; তবে কয়েক বছর আগে এক অধুনালুপ্ত পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় লেখকের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল (এটিও এ পর্যন্ত কোন বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নি), এই গল্পটি তারই পুনর্লিখিত রূপ।

এই দু'টি গল্প ছাড়া বাকী গল্পগুলিও এ-বই ছাপতে যাওয়ার আগে লেখক সযত্নে পরিমার্জন করেছেন।

আর একটা কথা বলা দরকার। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মূলত হাস্যরসিক। কিন্তু তাঁর হাস্যরস কারুণ্যের শীকরনিকরে অভিষিক্ত, তা বিশুদ্ধ humour-এর পর্যায়ভুক্ত। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) লিখেছেন যে বিভূতিবাবুর "হাতে কারুণ্য ও পরিহাস মিশে গিয়ে দুগ্ধবৎ স্নিগ্ধ হয়েছে।" (কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩, পৃঃ ৬৪৩) এই "দুগ্ধবৎ স্নিগ্ধ" কারুণ্যমণ্ডিত হাস্যরসের নিদর্শন বিভূতিবাবুর শিশুমনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলিতেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, সেইজন্য এগুলি এত বেশি সার্থক।

ভূমিকা বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। বিভিন্ন বইয়ে ছড়িয়ে থাকা এই অনুপম গল্পগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি—এই কথাটি নিবেদন করেই আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করি।

শান্তিনিকেতন, সুখময় মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ওরা এবং আমরা

দুইজনেই প্রায় একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল ; নিমাই বলিল, "নড়নচড়ন", ঘুটু বলিল, "নট্-নড়নচড়ন নট্-কিচ্ছু !" নিমাই তাক করিয়া গুলি ছাড়িয়া দিল।

গুলিটা ঘুটুর গুলিতে লাগিল না বটে, তবে গুলির সংলগ্ন একটা কুটোকে আঘাত করিয়া যাওয়ায় ঘুটুর গুলিটাও নড়িয়া উঠিল। নিমাই বলিল, "টোয়েন্‌টি ; খাটো ঘুটু।"

ঘুটু বলিল, "আমি নট্-নড়নচড়ন নট কিচ্ছু বলেছিলাম।"

নিমাই বলিল, "আমি আগে নড়নচড়ন বলে তবে আঁটি ছেড়েছি।"

ঘুটু বলিল, "কক্ষনও নয়, আমি আগে বলেছি।"

"আলবৎ নয়, খাটান দিয়ে যাও। তিনবার উপরোউপরি হেরে বেইমানি করতে আরম্ভ করেছিস।"

"খবরদার, বেইমানির নাম নিবিনে নিমে ! তুই কখন আগে বললি রে ? মিথ্যেবাদী কোথাকার।"

"তুই মিথ্যেবাদী কাকে বললি রে ?"

"তুই বেইমানি কাকে বললি ?"

"আলবৎ বেইমানি, হেরো বেইমান। খাটান না দিয়ে এক পা এগুতে পারবি নি।" নিমাই আগাইয়া গিয়া ঘুটুর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

ঘুটু তাহার পানে তাচ্ছিল্যের সহিত রক্তদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "লে লে, ভারি পথ আটকানেওয়ালা হয়েছিস। এই বাড়ালাম পা, কর্ কি করবি !"

নিমাই তাহার কোমরের কাপড়টা ধরিয়া বলিল, "খাটান দিয়ে যা বলছি বাপের সুপুত্তুর হয়ে।"

আর বিলম্ব হইল না। "তুই বাপ তুললি কাকে রে ?"—বলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া একটা ঝটকা মারিয়া একেবারে নিমাইয়ের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর ঝাপটাঝাপটি, কিল, চড়, খামচানি, একবার এ ওপরে যায়, একবার ও ওপরে ঠেলিয়া আসে। ঘামে গায়ের ধুলা কাদা হইয়া উঠিতেছে, নিশ্বাস

হইয়া উঠিতেছে দ্রুত আর ঘন, ফোঁসফোঁসানির মধ্যে এক আধটা যা চাপা কথা বাহির হইতেছে তাহার সামনে 'বাপের সুপুত্তুর' অতি ভদ্র উক্তি।

নিমাই ওপরে ছিল, ঘুটুকে বাগাইয়া নীচে ফেলিয়া এইবার তাহাকে থেঁতো করিবে হঠাৎ নিজেই চিৎকার করিয়া উঠিল। ঘুটু নীচে থাকিয়া তাহার পাঁজরার কাছের মাংসটা কামড়াইয়া ধরিয়া এমন চাপ দিয়াছে যে তুলাভরা গেঞ্জি গায়ে না থাকিলে মাংসটা তাহার মুখের মধ্যে গিয়া পড়িত। নিমাই চীৎকার করিতে করিতেই তাহার কাঁধে পিঠে গোটাকতক ঘুষি কশাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িমুখো হইল।

ঘুটু ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উঠিয়াই প্রথমে হাতের টল-গুলি দুইটা প্রাণপণ শক্তিতে নিমাইয়ের পানে ছুড়িল। উগ্র রাগের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একটা থান ইটের আদ্ধা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়, পিছনে খানিকটা দূরে একটা খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কান্না কার রে ঘুটু?"

ঘুটু একবার ফিরিয়া দেখিয়াই দারুণ আতঙ্কে নিজের মনেই, 'পিসীমা রে।' বলিয়া হাতের ইট ফেলিয়া ছুট দিবে, কড়া হুকুম হইল, "দাঁড়া বলছি, এক পা নড়েছিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন—"

ঘুটু নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাকি ধুলা ময়লা ঝাড়িয়া লইতেছিল, ততক্ষণে পিসীমা হনহন করিয়া কাছে আসিয়া গিয়াছেন, গলার স্বরটাকে যতটা সম্ভব শান্ত অবিচলিত রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে শুনি?" ঘুটু মাটির পানে চাহিয়া বলিল, "কিছু নয়।"

পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হয়েছে কিছু, একশো বার হয়েছে। তুই নিমের কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিস নইলে সোনার চাঁদ ছেলে ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না অমন পাড়া মাথায় করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল কেন?·· বলি, তোমার চোখে জল দেন নি একচোখো ঠাকুর? গতর যে চুর হয়ে গেছে এদিকে। ভাব করে একসঙ্গে খেলা করতে গিয়ে কতরকম বজ্জাতি শিখছ, আর ঐ ঢঙের কান্নাটুকু শিখে নিতে পার নি? এক কান্নাতে যে শত দুষ্টুবুদ্ধি ঢাকা পড়বে এ বুদ্ধিটুকু একচোখো ভগবান তোমায় দেন নি কেন? হাড় গুঁড়ো করে দিলেও ওর মায়ে তোমার চোখে জল আসবে না তো, ও যে নিমাই ভাই!·· চল হতভাগা বাড়ি চল। আর এই দেখ, কান্না আসে কি না, দেখ তবে—"

কান্না না শিখিতে পারার জন্যে এই নিদারুণ ধিক্কারের উপর গোটা কতক চড় খাইয়া ঘুটু ভুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসীমা তাহাকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে

বাড়ির দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। মন্তব্যের উগ্রতার সঙ্গে তাঁহার নিজের গলা এদিকে ধাপে ধাপে উঠিতেছে। সমস্ত পাড়াটা যেন একমুহূর্তেই গমগম করিয়া উঠিল।

ঠিক গলি নয়, তবে রাস্তাটা অপরিসর। এই রাস্তার এক দিকে নিমাইদের বাড়ি, অপর দিকে ঘুটুদের। সামনাসামনি নয়, দুইখানা বাড়ির মাঝখানে খান-চারেক অন্য বাড়ি আর একটা এঁদো ডোবা। ডোবাটির পিছনে নিমাইদের বাড়ি। রাস্তা হইতে নামিয়া কচু, আশ্‌শ্যাওড়ার পাতলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া পৌছিতে হয়।

নিমাইয়ের জেঠাইমা উঠানে বড়ি দিতেছিলেন, হাত থামাইয়া বলিলেন, "যেন নিমাইয়ের গলা শুনছি না? দেখ্‌ তো রে বেরিয়ে।"

অন্য কেহ বাহির হইবার পূর্বে তিনি নিজেই বড়ির হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। নিমাই রাস্তা ছাড়িয়া নীচে নামিয়াছে, জেঠাইমা দরজায় দাঁড়াইয়া একটু কান খাড়া করিয়া কি যেন শুনিলেন, তাহার পর গলা উঁচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বলি, আবার কি হল? একদণ্ড আমায় তোরা সুস্থির হয়ে থাকতে দিবি কিনা ভেঙে বল্‌ দিকিন?"

নিমাই চীৎকারের সঙ্গে নাকী সুর মিশাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, "লক্ষ্মীছাড়া ঘুটে, বেইমান, খাটান দেবে না, উলটে—" জেঠাইমার গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল, "আবার তুই ঘুটুর সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি? যখনই নেত্য ঠাকুরঝির বাজখেয়ে গলা শুনেছি, তখনই ভেবেছি একটা কিছু ঘটেছে। তোকে না পইপই করে বারণ করেছিলাম, 'ওরে নিমাই, 'ও আদুরে দুলালের কাছে যাস নি।' তা শুনবে? আবার কান্না! বেরো, বেরো তুই, আর বাড়িমুখো হস নি।"

নিমাই সেই রকম সুরেই খিঁচাইয়া উঠিল, "ও আসে কেন ঘাড়ে পড়ে? সেধে! সেধে ভাব করে এসে খেলায় বেইমানি! বললে উলটে কামড়ে দেবে, খামচে রক্ত বের করে দেবে!

জেঠাইমা দুয়ার ছাড়িয়া হনহন করিয়া রাস্তার ধারে ডোবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েদের কণ্ঠে সপ্তমের পরেও একটা পর্দা আছে, সেই পর্দায় গলা তুলিয়া বলিলেন, "ওরে অলপ্পেয়ে, তুই যে জন্মেই মা খেয়ে বসে আছিস, তোকে কি একটা মনিষ্যির মধ্যে ধরে? তোকে তো করবেই সবাই পিটনে, তোকে না পিটলে ননীর হাতে সুখ হবে কি করে? তোকে মারলে তো তার নালীশ নেই, তোর জন্যে তো আদালত নেই। চল্‌ বাড়ি, আমিও দিই ঘা কতক বসিয়ে।...ঘুটু! ঘুটু না হলে ওঁর একদণ্ড চলে না। পইপই করে বারণ করি, ওরে

নিমে, যাস নি, তোর প্যাকাটির মতন শরীর, তুই পেরে উঠবি নে ওসব দজ্জাল ষণ্ডাগুণ্ডাদের সঙ্গে, তা গরীবের কথা বাসি না হলে তো—"

ঘুটুর পিসীমা ক্রন্দমান ভাইপোকে টানিতে টানিতে যখন বাড়ির রকে উঠিয়াছেন, নিমাইয়ের জেঠাইমার আওয়াজ হঠাৎ কানে গেল। থমকিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন, হাতের মুঠিটা আলগা হইয়া পড়ায় ঘুটু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। পিসীমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা শুনিলেন, তাহার পর পিছনে ঘুরিয়া পা বাড়াইলেন।

ঘুটুর মা বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি আবার এই দুপুরে রোদ্দুর মাথায় করে বেরিও না। অনামুখো ছেলে ঐ করে বেড়াবে চোপোর দিন, গালমন্দ খাবে না তো কি করবে?"

ঘুটুর পিসীমা চক্ষু কপালে তুলিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যাহাতে ডোবার ধার পর্যন্ত আওয়াজটা অবলীলাক্রমে পৌঁছায় এইরূপ কণ্ঠে ঝংকার করিয়া উঠিলেন, "তুই বের করতে পারলি কথাটা মুখ দিয়ে বউ? কথাটা আটকাল না মুখে একটু? (নামিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) ছিষ্টিধর ছেলে, সে হল অনামুখো? তাকে পাড়ার শতেকখোয়ারীরা এই ঠিকদুপুরে খুঁড়বে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনতে হবে আমায়?

"পরের ছেলের গতর দেখে ডাইনে। নিজের ছেলে হল প্যাঁকাটি! সাতটা বাঘ খেতে পারে না, তা পড়বে নজর সেদিকে?"

পিসীমা রাস্তার ধারে পৌঁছিয়া গেছেন। স্রোত সমানে বহিয়া চলিয়াছে, "তা হবে প্যাঁকাটি, হবে, হবে এই পাতোবাক্যে বলছি আমি। ছেলের ছেলের ঝগড়া, বুড়ো মাগী কোমর বেঁধে এল ছেলে খুঁড়তে!"

নিমাইয়ের জেঠাইমাও "তবে রে? যত মনে করি কিছু বলব না—" বলিতে বলিতে পুকুর ধার ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া উঠিলেন, এবং এর পর উভয় পক্ষের ভাষা উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া যাহা দাঁড়াইল তাহা লিপিবদ্ধ করা চলে না। ক্রমে ঘুটুর পিসীমার সঙ্গে ঘুটুদের বাড়ীর অন্য ছেলে-মেয়েরা আসিয়া যোগ দিল, নিমাইয়ের জেঠাইমারও দম্-গলা পুষ্ট করিতে লাগিল নিমাইদের বাড়ীর নানা বয়সের মেয়েরা মিলিয়া। উভয় দলই হাত পা নাড়া ও উৎকট ভাষা প্রয়োগের ঝোঁকে এক রকম অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইতে হইতে এক সময় খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমত প্রতিপক্ষ দলে নিজের নিজের জোড়া বাছিয়া লইল। নিমাইয়ের পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট ভাই এবং ঘুটুর চার বৎসরের

ছোট ভাগ্নীর মধ্যে নানা প্রকারের ভেংচি কাটার বিনিময় হইতে লাগিল। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে ধূলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; মেয়েটি বলিতে লাগিল, "তোল্ বাবা ম'লে যাক্, তোল্ মা ম'লে যাক্।"

ঘুটুদের ঝি খুব খরখরে—যেমনই ছড়া কাটায়, তেমনই হাত-পা নখ নাড়ায়। নিমাইদের ঝি কথার দিকে আদৌ গেল না, কোঁচড় পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং ঘুটুদের ঝি অনেকক্ষণ বকিয়া গেলে মাঝে মাঝে এক একবার 'এই নে, এই নে, বলিয়া কোঁচড়টা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল ; অর্থটা বোধ হয় এই যে, সে সমস্ত বাক্যবাণগুলি নির্বিচারে ফিরাইয়া দিতেছে। এই প্রায়-নীরব প্রক্রিয়ায় ঘুটুদের ঝি যেরূপ দ্বিগুণিতভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে অনুমানটা বিশেষ মিথ্যা-বলিয়া মনে হয় না। নিমাইয়ের জেঠাইমার পোষা বেড়ালটা কৌতূহলবশে সঙ্গে আসিয়াছিল, ঘুটুদের কুকুরটা তাহাকে তাড়া করিয়া গাছে তুলিয়া দিয়া ঊর্ধ্বমুখে আগলাইয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীদের কয়েকজন আসিয়া ও সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাব্ মত সে যাহার দল বাছিয়া লইয়া ব্যাপারটি পুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। বেচারামের মা ঘুটুর পিসীর পিঠটা চুঁচিয়া দিতে দিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল, "ওগো দিদি চুপ কর, মাথা খাও আমার। কখনও কাউকে উঁচু কথা বলনি একটা, তুমি পেরে উঠবে না ও খাণ্ডারের কাছে। তার ওপর আবার তোমার মাথার ব্যামো, বুকের ধড়ফড়ানি, কি আছে শরীরে তোমার ওদের শাপমন্যিতে? আমার মরা মুখ দেখো, চুপ কর।"

বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতেছে ; দিদির উৎসাহ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইতেছে।

ব্যাপার যখন চরমে, ঘুটুর বাপ নীরদ শনিবারের আফিসফেরত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। একবার থমকিয়া দাঁড়াইল ; ব্যাপারটা মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল ; তাহার পর ভগ্নীর কাছে গিয়া অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে, এত গোল কিসের?"

বেটাছেলের আগমনে কলহটা একটু থামিয়া গেল।

ঘুটুর পিসী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কিছু হয় নি, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। আমি উঠতে বসতে এ রকম গালমন্দ আর সহ্য করতে পারব না। তাও যত পারে না হয় আমায় দিক্, ঐ দুধের ছেলেটার ওপর নজর কেন? ঠাকুর দেবতার দোর ধরে কোন রকমে টেকে আছে, তা ডাইনীদের বুক কসকস করছে!

একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না। তার আগে ছেড়ে দে আমায়।"

নীরদ অধৈর্যভাবে বলিল, "আঃ, কে কি বলেছে, তাই বল না।" নিমাইয়ের জেঠাইমা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, গলাটা একটু আগাইয়া স্বর তুলিলেন, "বলেছি আমি। বলব, একশো বার বলব, হাজার বার বলব। আমার ঐ হাজা-মরা একটু গুঁড়ো আছে কি নেই, সে হল পালোয়ান, তার হাতীর মতন গতর। তাকে সাতটা বাঘে খেতে পারে না......"

নীরদ আবার প্রশ্ন করিল, "কিন্তু উঠল কি করে এসব কথা? কি জ্বালা।"

নিমাইয়ের জেঠাইমা বলিল, "যা করে চিরকাল ওঠে, ঝগড়া করবার জন্যে যদি কেউ কোমর বেঁধে বসে থাকে। হয়েছে ছেলেয়-ছেলেয় ঝগড়া; গুলি খেলতে খেলতে নিমেকে দুর্বল পেয়ে তোমার ঐ আদুরে গোপাল—"

নীরদ অধৈর্যভাবে বলিয়া উঠিল; "তা দেন কেন আসতে আপনার ছেলেকে—ছেলে যদি এতই ক্ষীণজীবী?"

নিমাইয়ের জেঠাইমা নীরদের পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া "ওরে আমার!" বলিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গিয়া হনহন করিয়া নিজেদের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন এবং দরজায় দিকে হাত দুইটা বাড়াইয়া গলা ছাড়িয়া দিলেন, "বলি অ মেনীমুখো! বাড়ির মেয়েছেলে যে দাঁড়িয়ে অপমান হচ্ছে, গুণ্ডোর হাতে, বেরিয়ে দেখতে পার না? শুধু যে মারতে বাকি রাখলেন! বাড়ির মধ্যে কনে-বউয়ের মত ঘোমটা দিয়ে বসে থাকলে সে ঘোমটা খোলবার মুখ থাকবে না যে চিরজন্মে!"

কথাগুলো নিমাইয়ের বাপ রসময়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলা, তাহার চেহারা দেখা না গেলেও। রসময় সেই প্রকৃতির জীব যাহাদের লেজে মোচড় না দিলে চাড় হয় না; তবে একটু মোচড় পড়িলেই যাহারা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠে। লোকটা দুয়ারের আড়ালে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল ও ঘুটুর পিসীমার সামনে বাহির হওয়া নিরাপদ হইবে কি না চিন্তা করিতেছিল, ভাজের ধিক্কারে বাংলা ছাড়িয়া একেবারে হিন্দী মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল, "কিস্‌কা বুকের পাটা হুয়া হ্যায় যে অপমান করেজা!"

ঘুটুর পিসীমা খপ করিয়া ভাইয়ের ডান হাতটা ধরিয়া তাহাকে মেয়েদের দলের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে নীরু, চলে আয়, ও গুণ্ডোর সামনে দাঁড়াস নি, যেভাবে তেড়ে আসছে। আমার অদৃষ্টে যে কি আছে।..."

হেঁচকা টানে নীরদ মেয়েদের দলের খানিকটা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল, গা ঝাড়া দিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "ওর মত দশটা গুণ্ডা আসুক, নীরে চাটুজ্যে একলা তাদের মোহড়া নেবে।··· বোঝা নেই সোঝা নেই, তুই যে মেয়েদের কথায় বিশ্বাস করে—"

রসময় আগাইয়া আসিয়া শীর্ণ বুকটা ফুলাইয়া বলিল, "আগে একটার মোহড়া সামলা নীরে, মেয়েদের দলে ঢুকে সেখান থেকে আস্ফালন করা পুরুষের কাজ নয়।"

দুই একটা এই ধরণের আলাপের পরই জমিয়া গেল। এক দিকে বোন আর এক দিকে ভাজ গোড়া থেকেই এমন দক্ষতার সহিত চালাইয়া গেল যে, মূলে যে ওরূপ উৎকট কলহের কিছুই নাই সেটা না রসময় না নীরদ কাহাকেই ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর দিল না। দুইটা পরিবারই একটু কলহপ্রিয় ও কলহে দক্ষ, অল্প সময়েই নূতন পুরানো বহু কুৎসা কাহিনী একত্র হইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িয়া হাতাহাতি বন্ধ করিল, কয়েকজন নীরদকে এবং কয়েকজন রসময়কে নানা রকম নীতিবাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে এক রকম ঠেলিতে ঠেলিতেই বাড়ির দিকে লইয়া গেল। যতক্ষণ দেখিতে পাইল ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পরকে শাসাইতে-শাসাইতে তাহারা নিজের বাড়িতে গিয়া উঠিল। জের কিন্তু মিটিল না। দুই বাড়িরই গর্জানি, আফসানি তখনও পুরা মাত্রায় চলিয়াছে। ঘুটুর পিসীমা কোট ধরিয়াছেন, হয় এ অপমানের বিহিত করা হোক, নয় তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হোক। নিমাইয়ের জেঠাইমা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। নীরদ বলিতেছে, জান কবুল, এর শোধ লইবে তবে তাহার নাম নীরদ। রসময় বলিতেছে, আজ কোন রকমে ফাঁড়াটা কাটিয়া গেলওবলিয়া নীরে যেন নিশ্চিন্ত না হয়।

যাহারা নীতিবাক্য প্রয়োগে ব্যাপারটা থামাইয়াছিল, তাহারা রাত্রে আবার উপস্থিত হইল। দুই বাড়িতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করিয়া স্থির হইল, ইহার একমাত্র উপায় আদালত।

নীরদের শুভার্থীরা ফৌজদারির ব্যবস্থা দিল। রসময়ের শুভার্থীরা দিল মানহানির পরামর্শ। সাক্ষী-সাবুদ সব ঠিক হইয়া গেল।

পরদিন দুপুর-বেলার কথা। নিমাই একটা মোটা খাতা কোলে করিয়া কি লিখিতেছে, একটা চাপা আওয়াজ হইল, "নিমে!"

ঘরের পিছনেই আগাছায় ঘন জঙ্গল। নিমাই ঘুরিয়া দেখিল, জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া জানালার কাছে ঘুটু। এমন কিছু অনভ্যস্ত দৃশ্য নয়, খুব বিস্মিত হইল না। ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, "এলি কি করে?"

পূর্ববৎ উত্তর হইল, "বাবা বেরিয়ে গেছে গুপী মোক্তারের কাছে মোকদ্দমার প'লা করতে। পিসীমা ক্ষীরী গয়লানীর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ক্ষীরী কাল তোদের দলে ছিল কিনা। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম।......খেলবি?"

"না!" —বলিয়া নিমাই গোঁজ হইয়া খাতায় মন দিল। ঘুটু প্রশ্ন করিল, "রাগ করেছিস?"

"না, করবে না রাগ! হেরে গিয়ে খাটান দেবে না, তার ওপর পেটে কামড়ে দাগ পড়িয়ে দেবে। যা বলছি, নইলে জেঠাইমাকে ডাকব এক্ষুনি।... ও জ্যেঠিমা! এই দেখ—"

ঘুটু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝোপের মধ্যে নামাইয়া লইল। একটু পরেই পাতার মসমসানিতে বোঝা গেল সে ফিরিয়া যাইতেছে। নিমাইয়ের মুখে একটু হাসি ফুটিল। খাতা ছাড়িয়া জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল "ঘুটু!"

ঘুটু ফিরিয়া তাকাইতে হাসিয়া বলিল, "শোন্, ভয় পেয়ে গেলি? জেঠাইমা কোথায়? সে বাবাকে নিয়ে দাসু উকিলের কাছে গেছে। বাবা বড্ড চটেছে কিনা তোদের ওপর·· খিক্—খিক্—খিক্—"

ঘুটু বলিল, 'খেলবি তা হ'লে? কালকের খাটান দিয়েই আরম্ভ করব।"

নিমাই—একবার খাতার দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহভাবে কহিল, "না. ভাই, হবে না। ফিচলেমি বুদ্ধি বাবার, কুড়িটা অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে গেছে; এসেই দেখবে। মানে, কোথাও যাতে না বেরুই আর কি। একে অঙ্ক আসেই না আমার।"

অঙ্কের জন্য আটকাইল না। ঘুটু অঙ্কে হুঁসিয়ার, জানালার মধ্য দিয়া খাতাটা লইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে টকটক করিয়া অঙ্কগুলো কষিয়া দিল। নিমাই নকল করিয়া লইল। এ পাড়ায় সম্ভব নয়, ও পাড়ায় গিয়া রাধারমণের মন্দিরটার পিছনে গিয়া খেলা ঠিক হইল।

যাইতে যাইতে ঘুটু পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়া বাহির করিল। নিমাইয়ের নাকের কাছে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "কি বল্ তো?"

নিমাই নাকটা কুঞ্চিত করিয়া দুই তিন বার ঘ্রাণ লইল, তাহার পর হাসিয়া, চোখ বড় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় পেলি রে?"

ঘুটু মোড়াটা খুলিয়া আমের মোটা পাঁচেক টক মিঠে আচারের বড় বড় ফালি

মেলিয়া ধরিল, গুঁড়োমসলার দিব্য নধর কান্তি। বলিল, "যা, পিসী ছাদে শুকোতে দিয়ে ক্ষীরীমাসীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল। ভাবলাম নিমের জন্তে এই তালে গোটাকতক সরাই। তুই ভালবাসিস কিনা—"

এক কামড়ে অর্ধেকটা মুখে পুরিয়া নিমাই অম্লরসে মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তোর পিসীর আচারের হাত খুব মিষ্টি।"

ঘুটু একটা নিজের মুখে পুরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ নিমাইয়ের দিকে একটু ঝাঁকিয়া কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কোঁদলের গলা।"

কথাটায় কি ছিল, দুইজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আসিয়া পড়িয়াছে। আচার কয়টা কাগজে জড়াইয়া মন্দিরের রকে রাখিয়া উভয়ে ট্যাঁক হইতে গুলি বাহির করিল।

ও পাড়ায় যে ঝগড়ার আওয়াজটা শুনা যাইতেছিল, সেটা হঠাৎ খুব উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আঁটি ছাড়িতে ছাড়িতে ঘুটু আর একবার হঠাৎ তেমনই ভাবে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কোঁদলের গলা।"

দু'জনেই আবার ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই নিমাই রাগ দেখাইয়া বলিল, "খবরদার, হাসিয়ে অন্যমনস্ক করিয়ে দিও না বলছি ঘুটু ভাল হবে না। এ—ই নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু আমি ফাষ্ট এগিয়ে আছি—"

ননীচোরা

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সৃষ্টির পাট, একটু যদি নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে; তাহার উপর ঐ দজ্জাল ছেলে সামলানো। ভোরে উঠিয়া বাসি কাজ সারা, তাহার পর স্নান সারিয়া পূজার বাসন মাজা, পূজার ঘর নিকোনো এই দুই প্রস্থ হইয়া গিয়াছে, এখন তিন নম্বর আরম্ভ হইয়াছে এই রান্নাঘরে! স্বামীর নয়টায় গাড়ি, দেবরের দশটায় স্কুল। আমিষের ল্যাঠা চুকিলে শাশুড়ীর হবিষ্য রান্না। মাথার ঠিক থাকে না।

কাকা ভাইপোতে দাপাদাপি করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। কাকা কুঁজো হইয়া অত জোরে দৌড়াইয়াও ভাইপোকে কোনমতেই ছুঁইতে পারিল না; যদিও

ভাইপো এরই মধ্যে তিন-তিনবার আছাড় খাইয়াছে এবং প্রচণ্ড হাসিতে তাহার নিজের গতিবেগটাও নিশ্চয় ব্যাহত হইয়াছে। উঠানের মাঝখানে এক লাফে পলাতকের সামনে আসিয়া দুই হাতের আড়াল দিয়া বলিল, "কী দৌড়ুস রে খোকা, কিন্তু এইবার?"

জেতার চেয়ে হারার নূতনতর কৌতুকে খোকার হাসিটা প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল।

"আবার কাল দু পয়সা লেট ফাইন হয়েছে, এই ছ পয়সা হল, দিও বউদি।"

"বউদির মস্তবড় মহাল রয়েছে, নিলেম করে নিও।"—বলিয়া হাসিয়া কড়ায় খুন্তির ঘা দিয়া বধূ ফিরিয়া বসিল।

"সে জানি না, দাদাকে বলো।"—বলিয়া দেবর হাসিয়া চলিয়া গেল।

বধূর ননদের কথা মনে পড়ে। সে দেবরের চেয়েও বয়সে ছোট কিন্তু এই জায়গাটিতে ঠিক কুটুস করিয়া কামড় দিয়া বসিত। আহা বেটাছেলে, বড্ড নিরীহ জাত!

"মা, মুনা।"—খোকা আসিয়া পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওই ওর রীতি।

"সর্ খোকা, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই, শুনলি তো কাকার তাগাদা?

"উঁ, থুনলি।—বলিয়া খোকা আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া ঝাঁকড়া মাথাটা মার উরু আর বাহুর মাঝখান দিয়ে বুকে গুঁজিয়া স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া গেল। মা একটু স্থির হইয়া দিল খানিকটা স্তন্য, তাহার পর তরকারি নামাইবার মতো হওয়ায় খোকার মাথাটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হয়েছে, যা এবার, ক্রমাগত দামালপনা করবি, ক্ষিদে পাবে ছুটে আসবি, ছাড়, যাও তো সোনা আমার। যা, একজন এবার নাইতে যাবে, যা দিকিন, গামছা-কাপড় দিগে।"

ছেলে মার পিঠের উপর লতাইয়া বাঁ হাতে মুখটা ঘুরাইয়া নিজের মুখের অত্যন্ত কাছে টানিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবা অঙ্গা অঙ্গা মা?"

এতও কাজের ভিড়েও অত কাছে রাঙ্গা ঠোঁট দুইটি পাওয়া গেলে মুহূর্তের জন্য সব ভুলাইয়া দেয়। একটা চুম্বন দিয়া মা বলিল, "হ্যাঁ, গঙ্গা গঙ্গা করবে, যাও।"

তরকারি নামাইতে, ঢালিতে, কড়া চাঁচিয়া আবার চড়াইতে একটু দেরি হইয়া যায়। কড়ায় তেল দিবার জন্য পিছনের দিকে তেলের বাটি লইতে গিয়া দেখিল, সেটা ছেলের দখলে; হাত দুইটি তেল চোবানো, পেটটি তেল চকচক করিতেছে, নীচে একরাশ তেলের ছড়াছড়ি। মার পানে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল, "অঙ্গা অঙ্গা।"

রোষে বিরক্তিতে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া মা বলিল, "ও মা গো। এ কি করছিস খোকা? না বাপু, আমি আর পারিনা এই হতভাগা ছেলেকে নিয়ে।"

চড় উঁচাইয়া ধমকাইয়া বলিল, "দোব ওই ওরই ওপর দু ঘা কষিয়ে. ভিরকুটি ঘুচিয়ে ?"

খোকা তৈলাক্ত হাত দুইটি পেটের উপর জড়সড় করিয়া অপ্রতিভ ভাবে মার কড়া চোখের উপর চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সে একটা মস্ত শ্লাঘনীয় কার্য করিতেছে, মা দেখিয়া তাহার বাহাদুরিতে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে ! এধরনের সম্ভাষণ মোটেই আশঙ্কা করে নাই। একবার উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, লাঞ্ছনাটা কাহারও নজরে পড়িল কি না ! তাহার পর মার দিকে চাহিয়া তাহার ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া গেল, বার দুই গালের একটা শিরা একটু কুঁচকাইয়া সামলাইয়া গেল, ভ্রূ-জোড়াটি দুই তিন বার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

এসব রঙ বেরঙের বিদ্যুৎস্ফুরণ বর্ষণের পূর্বলক্ষণ, মার জানা আছে। খোকার চোখের জল। সেটা দেখিতেও কষ্ট, সামলাইতেও কষ্ট, তাহা ছাড়া শাশুড়ীর গঞ্জনা, সে তো আছেই। মা হঠাৎ মুখের ভাব বদলাইয়া ফেলিল, বলিল, "ওবে খোকন, না না, তোকে বলি নি ; তোমায় কি বলতে পারি বাবা। আমি যে তেলকে বলছিলাম হতভাগা তেল, আমার যাদুর পেটে উঠে কি করছিস বলতো ?—ওরে খোকা, কি চমৎকার পাখি দেখ্, তুই নিবি ? ও মা !"

খোকা টালটা সামলাইয়া লইয়াছে, অর্থাৎ চোখের জল ছলছল করিতেছে বটে, কিন্তু উছলিয়া পড়িতে পায় নাই। মার পাশে ঠেস দিয়া ধরা গলায় বলিল, "আঙা পাখি।"

শান্তিদূতের মতো সামনের নিমগাছটায় একটা পাখি এই মাত্র আসিয়া বসিয়াছে। রঙটা রাঙা মোটেই নয় ; খানিকটা মিশ-কালো, খানিকটা সন্তী হলদে। দুই একবার গলা দুলাইয়া একটা হ্রস্ব তরল আওয়াজ করিল।

বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে ছেলেকেই মর্যাদা দিয়া মা বলিল, "হ্যাঁ, আঙা পাখি। নিবি খোকা ? তাহলে যা তোর কাকার কাছে, যা দিকিনি। আয় তেলটা একটু চারিয়ে দিই।......হয়েছে, এইবার যাও।"

খোকা অত্যন্ত ভালো ছেলে হইয়া গিয়াছে। একটু কুঁজো হইয়া ছড়ানো বাসন-পত্র বাটনা কুটনার মধ্যে খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, যেন কত ভয়। তাহার হঠাৎ ভাব পরিবর্তন দেখিয়া মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কয়েক পা গেলে বলিল, "ওরে খোকা, চুমো দিয়ে গেলি নি ? মা যে মরে যাবে তাহলে।"

খোকা ফিরিয়া আসিল। চুমা খাওয়া হইল, আবার বুড়ার চালে গন্তব্য পথে চলিল। মা একবার দেখিয়া লইয়া ঘুরিয়া বসিল। কড়ায় তেল দিতে দিতে বলিল, "যাও কাকাকে বলগে। বল কাকা রাঙা পাখিটা—"

পাখিটা মাঝখানের শব্দটায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল—"'গেরস্তের খোকা হোক।'

কি বলে পাখি সে-ই জানে; কিন্তু এই সূত্রে মানুষের সঙ্গে তাহার একটা গাঢ় আত্মীয়তা আছে। ঘরে ঘরে তাহার সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর কথা-কাটাকাটি চলে। বধু তপ্ত তৈলে একটা লঙ্কা ছিঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আর খোকার প্রার্থনায় কাজ নেই গাপু, ঢের হয়েছে, একটি সামলাতেই মানুষের প্রাণান্ত—"

"ওমা! অমন কথা বলো না বউমা; ওই একটিতে ঢের হয়েছে? পাখির মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, কোলে-পিঠে জায়গা না থাক, ঘর আমার ভরে উঠুক!"

শাশুড়ী যে ইহার মধ্যে কখন গঙ্গাস্নান সারিয়া পূজার ঘরের দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বধু সেটা শব্দের ভিড়ে, বিশেষ করিয়া ছেলের দৌরাত্ম্যে জানিতে পারে নাই।

হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, পরনে গরদ। বধু একটু লজ্জিতা হইয়া পড়িল, একটু থামিয়া বলিল, "দেখ না এসে কাণ্ডটা মা; এক বাটি তেল ফেলে নৈরেকার করেছে, অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম নাইতে যাচ্ছে—"

স্বামীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার লজ্জিতা হইয়া থামিয়া গেল।

"ফেলুক, দৌরাত্ম্যির বয়স এখন, সইতে হবে। হীরে থির থাকলে আলো ঠিকরোয় না বউমা। চারটে মাস ছিল না, বাড়ী যেন—ও বউমা, শিগগির দৌড়োও, খেলে আমার মাথা।"

খোকা ঠাকুরমার গলা শুনিয়া পাখির কথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে; তিনি বধুর প্রতি উপদেশ শেষ করিবার পূর্বেই দুলিতে দুলিতে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বিপর্যস্তভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "সরে যাও দাদু, আমায় ছুঁয়ো না—কি গেরো। ও বউমা! ওরে, তোর গায়ে রাজ্যির অনাচার দাদা, আমায় ছুঁসনি, দোহাই, তোর—ও বউমা, তুমি বুঝি তামাসা দেখছ? ও দাদু, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার—"

বউমা লঙ্কার ঝাঁজের অছিলায় মুখে কাপড় দিয়া তামাসাই দেখিতেছিল। খোকা মস্ত একটা কৌতুক পাইয়া গিয়াছে, যতই না এড়াইবার চেষ্টা সে ততই দুই হাত তুলিয়া ঠাকুরমাকে ছুঁইবার জন্য ছুটিয়াছে; হাসির চোটে সারা মুখটা সিন্দুরবর্ণ। ষাট বছরের বৃদ্ধা নাতির সমবয়সী হইয়া সমস্ত রকটা ছুটাছুটি করিতেছেন আর চেঁচাইতেছেন, "অ দাদু, খাও দি মাথা আমার আবার নাওয়াসনি বুড়িকে—

ও বউমা, শিগগির এস বাছা, সব ছেড়ে—"

বউমা গরম তেলে তরকারি ছাড়িয়া তাড়াতাড়ির ভান করিয়া ধীরে-সুস্থে হাত দুইটি ধুইয়া উঠিল। শাশুড়ী বুঝুন, উপদেশ দিলেই হয় না। ঠোঁটে কোথায় যেন একটু হাসি লাগিয়া আছে, পা চালাইয়া আসিয়া খোকাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই রকম দাপ্পাণ্ডা দিয়ে ঘর ভরে উঠলেই তো—"

কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই দুষ্টামির হাসি সজোরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। চাপা দিবার জন্য খোকাকে বলিল, "ঠাকুরমাকে ছুঁতে নেই এখন।"

খোকা মার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, ঘৃণায় নাকটা একটু কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "ঠাম্মা, অ্যা ছিঃ, মা ?"

ঠাকুরমা হাসিয়া রাগিয়া বলিলেন "হ্যাঁ, ঠাম্মা হল অ্যা ছিঃ, আর তুমি ভারি পবিত্তির, নবদ্বীপের পণ্ডিত। আমায় রীতিমতো হাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে গো! কুশাসনটা বার করে দাও তো মা, একটু বসে জিরিয়ে নিই, আর পেরেক থেকে মালাটাও নামিও দিও। ওইঃ একা হয় না, আবার জুড়িদার এল! সর্ সর্, পড়ল বুঝি ঘাড়ে!"

"হ্যাঁ" করিয়া ছোট্ট একটি আওয়াজ করিয়া তিন-চারি দিবসের একটি বাছুর সদর-দরজায় প্রবেশ করিল, এবং সমস্ত উঠানটা দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া সামনে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা উল্লাসিত আবেগে "গোউ গোউ!" বলিয়া করতালি দিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা সোজা করিয়া দিয়া মার কোল হইতে নামিয়া ছুটিল। ঠাকুরমা কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, "ঘাড়ে-টাড়ে পড়বে না তো বাপু ? দেখো!"

"না, ও নিজেই বাঁচিয়ে পালায়। যাই বাবাঃ!"—বলিয়া একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ হেঁসেলে চলিয়া গেল।

একটার পর একটা চলিতেছেই, শ্রান্তি নাই, বিরামও নাই। এবার বাছুরের সঙ্গে চলিল। হাতে একটা ছোট শুষ্ক আমের ডাল তুলিয়া লইয়াছে, বাছুরটাকে ছোঁয় ছোঁয়, সে উঠানময় দুই একটা চক্র দিয়া আবার দূরে দাঁড়াইয়া পড়ে। খোকা হাসিয়া লুটাইয়া যায়, ওঠে আবার ছোটে। সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত; কপাল, বক্ষ আর কাঁধের ধূলা ঘামের সঙ্গে কাদা হইয়া কণায় কণায় জমিয়া উঠিয়াছে। হাসির চোটে মুখে লালা উঠিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, গলার হারটা কখনও বুকে, কখনও পিঠে। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলার দুর্দশার আর পরিসীমা নাই। দেখাও যায় না। অথচ এই অশেষবিধি বিশৃঙ্খলতার মধ্যে খোকা যে কেমন

ভাবে কি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখাও যায় না। মা আড়-চোখে দেখিয়া হাসে। তরকারি নাড়িতে গিয়া খুন্তিটা এক-একবার কড়ার বাহিরে শূন্যে ওলট-পালট খায়।

ঠাকুরমার মালা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, জপের সঙ্গে যে তাঁহার একটা যোগ আছে, তাহা বোধ হয় না; কেন না, হিসাব রাখার মালিক যে মন সে উঠানে। খোকা সেখানে তাঁহাকে ধুলার মধ্যে, তাহার অকাজের মধ্যে, তাহার বিসদৃশ ভঙ্গীর মধ্যে, এক কথায় তাহার শত রকম বেহিসাবের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।

এ মোহ, এরূপ ভ্রান্তি হইবারই কথা। এই পরিবারের গৃহদেবতা গোপাল। ভগবান এখানে সম্ভ্রমের অধিকারী নন, স্নেহের ভিখারী। তিনি বিরাট নন, তিনি অপ্রমেয় অজ্ঞেয় নন, তিনি নন্দের দুলাল, যশোদার নয়নমণি, তাঁহার সম্বন্ধে ওসব কথা আর আসে কোথা হইতে? তিনি প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের সংসারের হাসি-অশ্রু দিয়া গড়া। যশোদা তাঁহাকে তাড়নাও করে, আবার নধর অধরে ক্ষীর সর ননী দেয়, চাঁদমুখ মুছাইয়া ললাটে তিলক আঁকে, মাথায় শিখিপাখা, শ্যামদেহে পীতধড়া, হাতে পাঁচনি দিয়া ধেনুদলের সঙ্গে গোচারণে পাঠাইয়া দেয়। গোপাল যখন যায়, যতক্ষণ দেখা যায়, মায়ের চির-অতৃপ্ত নয়ন লইয়া চাহিয়া থাকে; আবার সন্ধ্যার গোধূলিক্ষণে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়ায়, এখনই গোপাল মলিন বেশে আসিয়া মায়ের বক্ষলগ্ন হইবে।

সে সুদূর নয়; শিশুরা তাহাকে সবার ঘরে ঘরে আনিয়া দেয়, নিয়তই। খোকার মুখে কি তাহারই ছায়া পড়িয়াছে?

ধূলিপাটল পেলব অঙ্গে কি তাহারই বর্ণাভাস? কচি পায়ের চঞ্চলতায় কি তাহারই নৃত্যবিলাস? ঠাকুরমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে অশ্রু। ঝাপসা দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য এক এক বার মনে হয়, যেন গোপাল নিজেই,—ছায়া নয়, আভাস নয়।

শ্যামদেহ ঘিরিয়া পীতবাস, মাথায় বিস্রস্ত মোহন চূড়া, হাতে পাঁচনবাড়ি, কপালের চন্দন কাদার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমার অঙ্গ আলোড়িত করিয়া যশোদার স্নেহ নামে; আহা, অসহায় শিশু, খেলায় অসহায়, শাস্তিতে অসহায়, কি যে করে, কি না করে, নিজেই জানে না। ও আবার দেবতা কবে হইল।

যশোদা ঘরে ঘরে নিজের শিশুকে বিলাইয়া, মায়ের ব্যাকুলতা লইয়া সবার বুকে আসিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরমা বলে, "ওরে অ খোকা, ঘেমে নেয়ে গেল যে! দেখ্‌ তো ছিষ্টিছাড়া খেলা ছেলের।"

ওদিকে ধরলী "হাঁ।" করিয়া আওয়াজ করে; চারদিকে বিপদ আপদ ঢের,

অবুঝ বৎস, সে চোখের আড়ালে কেন যে যায়। কিন্তু খেলা তবু ও চলিতে থাকে।

অবশেষে বোধ হয় শ্রান্তি আসিল। খোকা অবশ্য ব্যহৃত সেটা স্বীকার করিল না। উঠানে বসিয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড় এলাইয়া একবার মার দিকে চাহিল, একবার ঠাকুরমার দিকে চাহিল। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে হইল, খুব সহজ ব্যাপার, অথচ খুব মজা হয় তাহা হইলে। রকের উপর উঠিয়া গিয়া, আমের ডালটা দুই হাতে পিছনে ধরিয়া, ঘাড় দুলাইয়া প্রশ্ন করিল "ঠাম্মা খেব্বি ?

ঠাকুরমা হাসিয়া উদ্বেলিত অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, খেলব, ডেকে নে, অনেক হয়েছে এখানকার খেলা।" দেবি হইয়া যাইতেছে, উঠিয়া সজল নয়নে পূজাব ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন এই পরিবারের ক্ষুদ্র ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল।

ঠিক পূজা সেদিন হইল না, যেন একটি দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল শিশুর পরিচর্যায় কাটিয়া গেল, তাহার চঞ্চলতা আর প্রতিকূলতার জন্য পদে পদেই বাধা। বৃদ্ধা গোপালের সাজগোজ একটি একটি করিয়া খুলিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া আবার অতি সন্তর্পণে, প্রাণের দরদ দিয়া পরাইয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে নানা রকম আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ—"এইবার এই রকম করে দাঁড়াও তো ঠাকুর, পীতধড়াটা এঁটে দিই। এই বাঁশী ধর। কতদিন থেকে ইচ্ছে, একটি সোনার বাঁশী গড়িয়ে দিই, সে সাধ আর গোপাল মেটাবে না। আব কবেই যে মেটাবে।"

যেন প্রত্যক্ষ গোপালের সামনে কথাটা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সারাদেহে ধূলি, বদনে স্বেদবিন্দু কল্পনা করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দেন। মুখে অনুযোগ, "জগতের ভাবনা ভেবেই তুমি সারা হলে, নিজের দিকে চায় দেখবে কখন ?"

হিন্দুর মন, পুতুলখেলার পাশে পাশে গীতার ধ্বনি উঠে। অলকা তিলকা দিয়া শৃঙ্গার শেষ হয়। তখন আবাব নিজেব প্রগল্‌ভতায় হাসি পায়। "হে ঠাকুর, আমার অহমিকা নিয়ে তোমাব এ খেলার মর্ম তুমিই বোঝ। আমি আবার তোমায় সাজাব, মোছাব।

"যেমন তোমার যশোদার ছেলে হওয়া, তেমনই আমার সেবা নেওয়া, তোমার লীলার অন্ত আমি আব কি পাব ঠাকুর ?"

শৃঙ্গারের সময় দেবতা বিগ্রহের মূর্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পূজার সময় তাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। আজ খোকার খেলার পথে আসিয়া তিনি যেন অতিমাত্র চঞ্চল। চিত্তেব সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়াও তাঁহাকে পূজার আসনে ধরিয়া রাখা যায় না। আজ তিনি ধ্যানাতীত। কখনও বায়ুর মতো স্পর্শের

অগোচর, সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অথচ আকারে ধরা যায় না। কখনও তিনি নাই, একেবারেই বিলুপ্ত, শুধু শিশুতে শিশুতে সমস্ত বিশ্ব একাকার হইয়া যায়।···মায়ের নতদৃষ্টির নীচে শিশুর হাসি, ছায়াশ্যাম বৃক্ষতলে খেলায় মত্ত শিশুর দল; কোথাও দরিদ্রপল্লীতে জীর্ণ গৃহ, অবসরহীন জননী, উঠানে ছিন্নবাস-পরা শিশু-ভগ্নীর কোলে রুগ্ন শিশু, অশ্রুভরা নিষ্প্রভ তাহার চোখ; কোথাও শিশুর দুর্জয় অভিমান, চাপা ঠোঁট, শ্রান্ত গম্ভীর ভাব খাবার খেলনা রাজ্যের যত জিনিস একত্র কাণ্ডয়াও মা মন পায় না, এক এক সময় সব মুছিয়া এক অপূর্ব দৃশ্য ভাসিয়া উঠে, নবদূর্বাদলশ্যাম নবনীতদেহ এক শিশু, মাথায় চিক্কণ চূড়া বায়ুভরে দোদুল। পীতবাস-পরা বঙ্কিম কটি, যমুনা-কূলের বেণুবন তাহার চঞ্চল নৃত্যপর রাঙা চরণের ঘায়ে তৃণগুচ্ছে রোমাঞ্চিত, কখনও সে ধেনুর গায়ে লুটাইয়া পড়ে, কখনও নাচিতে নাচিতে বংশীধ্বনি করে, তাহার বাঁশীর স্বরে আকাশ-বাতাস্ ভরিয়া যায়, বনপ্রান্তর পুষ্পে পুষ্পে মুঞ্জরিত হইয়া ওঠে, যমুনার কালো জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলোর খেলা চলে।

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া গেল। যশোদার গৃহ, ঘরের মেঝেয় ভাঙা ননীর পাত্র। গোপালের মুখে হাতে যেখানে-সেখানে চুরি করা ননীর পোঁচ, শ্যাম দেহখানি ননীর স্নিগ্ধ সাদা ছোপে ছোপে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রানী আর পারে না, নিত্যই এই চৌর্যবৃত্তি, এই অপচয়! শাসন মানে না এমন বিড়ম্বনার শিশুকে লইয়া কি করা যায়?······তোকে এবারে না বাঁধলে চলছে না গোপাল, রস্ তুই দড়ি নিয়ে আসি।···গোপালের কাতর দৃষ্টি, অনুনয় করিতে করিতে ক্ষুদ্র দেহখানি ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে,······মা গো আর হবে না, এই শেষ, তোর বাঁধন যে বড় কঠিন হয় মা।······আহা! শিশুর অদম্য লোভ কিই বা করে সে?

পূজার সম্ভার পড়িয়া থাকে, মন্ত্র অনুচ্চারিত। যদিও চোখের পদ্ম ভিজাইয়া শুধু অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়ে। "হে শ্যামসুন্দর, এস তোমার শিশু-মনের সমস্ত লোভ, তোমার সেই পরম করুণা নিয়ে এস। এখানে তোমার পায়ে সমস্ত উজাড় করে দোব বলে বসে আছি, অথচ তুমি বিমুখ!

"হোথায় যশোদার কি পুণ্যবলে তার সমস্ত লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিচ্ছ ঠাকুর?"

অনেকক্ষণ এই রকম যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে মনটা আচ্ছন্ন থাকে। হঠাৎ ছেলের বকাবকিতে চৈতন্য হয়।

"আবার আজ ভাতের দেরি করে ফেললে! যাঃ; চাকরিটা না খেয়ে আর—"

বধূর চাপা গলায় উত্তর, "কি করব মা দজ্জাল ছেলে হয়েছে! একটুখানি যে ডেকে নিয়ে উবগার করবে—।"

"ও! মনিব-ঠাকরুনের ছেলে না আগলালে বুঝি একমুঠো ভাত—"

আরও চাপা গলায় প্রত্যুত্তর হয়, "আঃ চুপ কর। পূজোর ঘরে মা।"

আবিষ্ট ভাবটা কাটিলে বৃদ্ধা নিজের মনেই বলিলেন, "আজ তুমি তো ঠিক ধ্যানের রূপে দেখা দিলে না ঠাকুর! কেন, তা—তুমিই জান।"

পুষ্পরাশি চন্দনে মাখাইয়া বেদীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর কুষিতে জল লইয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিতে যাইতেই "এ কি হল।" বলিয়া যেন চিত্রার্পিতের মতো কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হইয়া গেলেন।

চোখের জলে এখনও দৃষ্টিটা একটু ঝাপসা রহিয়াছে, অঞ্চল দিয়া মুছিলেন। না, ঠিকই তো, রেকাবির মাঝখানের নৈবেদ্যের চূড়ার উপর বড় যে ক্ষীরের নাড়ুটা—সবচেয়ে মোটা বড় সেইটি নাই। এইমাত্র নিজের হাতের রচনা করা নৈবেদ্য, ওই নাড়ুটি একবার পড়িয়া গিয়াছিল,—ভালো করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, ভুলে. তো কোনো সম্ভাবনাই নাই।

তবুও নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস হয় না, আবার ভালো করিয়া চোখ মুছিতে যান। কম্পিত হস্তে চোখে অঞ্চল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এক অননুভূতপূর্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। শরীর কণ্টকিত মনে হয়, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙ্গিয়া সমস্ত শরীরের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে। চোখের জল মুছিবে কে? কূল ছাপাইয়া বন্যা নামিয়াছে।

মুখে একটি মাত্র কথা, আনন্দ-ব্যাকুল একটি মাত্র বিস্মিত প্রশ্ন—"হে ঠাকুর এ কি দেখালে?"

যখন বাহির হইয়া আসিলেন, চোখের পল্লব সিক্ত, মুখে একটি শান্ত জ্যোতি। বধূর বড় আশ্চর্য বোধ হইল, একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, "মা! আজ তোমার এত দেরি হল?"

"বউমা একবার পূজোর ঘরে এস।"

ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘুরিয়া বলিলেন, "রান্নাঘরের কাপড়টা ছেড়ে এসো বউমা।"

বধূ কাপড় ছাড়িয়া আসিলে ভিতরে গিয়া বলিলেন, "এই দেখ বউমা, আমি নিজের হাতে বড় নাড়ুটি মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছিলাম, চোখ মেলে দেখি নেই।"

শাশুড়ীর মুখের আলো বধূর মুখমণ্ডলে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল, সে চোখ

দুইটি বিস্ফারিত করিয়া নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব, এ বাড়ির মাটির প্রতি কণাটি পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের রসে সিক্ত, বিশ্বাস এঁদের কোনোখানেও কখনও বাধা পায় না।

গোপালের এ গৃহে পদার্পণই অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়া। তাহার এই পরিবারের সঙ্গে তাহার লীলার লুকোচুরি চলিয়া আসিতেছে, বিশেষ করিয়া পূর্বজদের আমলে। তাহার মধ্যে কত ঘটনা ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কতক আজ পর্যন্ত সংশয়ের আলো ছায়ায় দুলিতেছে, কতক বা একেবারেই নিসংশয়িত ধ্রুব সত্য—জীবনের চেয়েও সত্য, গোপালের বিগ্রহের মতোই সত্য।

শাশুড়ী বলিলেন, "এ সেই, যাঁর নাম করতে পারি না, গোঁসাইয়ের বংশ বউমা, এ রকম ব্যাপার তো এ-বাড়িতে নতুন নয়, তবে আজকাল আর আমাদের পুণ্যির জোব নেই এই যা। পুজো সেরে শ্বশুর ভাগবত পড়তেন, খুব তন্ময় হয়ে পড়তেন কিনা—তেমনি সুকণ্ঠও ছিল। একটি বছব তিনেকের শ্যামবর্ণ ছোট ছেলে এসে বসল একখানি হলদে রঙে ছোপানো কাপড় কোমর থেকে খসে গেছে জড়িয়ে-সড়িয়ে কাঁখে পুঁটুলি করে নিয়েছে। বসল তো বসল, শ্বশুর একবার দেখে আবার নিজের মনেই পড়ে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে আর একবার একটু অন্যমনস্ক হতে গিয়ে ছেলেটির ওপর একটু নজর পড়ল, ঠায় এক-ভাবে বসে আছে। পাঠ শেষ করতে আরও অনেকক্ষণ গেল। বই মুড়ে চোখ তুলে দেখলেন ছেলেটি নেই, কখন উঠে গেছে। আহা ছোট্ট ছেলেটি হুড়োহুড়ি করে হাক্লান্ত হয়ে বসে ছিল, একটু নৈবিদ্যি হাতে দিই। এই ভেবে তিনি রেকাবি থেকে ক্ষীরের নাড়ুতে ফলেতে মুঠোটি ভরে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'হ্যাগো যে ছোট ছেলেটি আমার ঘরে গিয়ে এতক্ষণ বসে ছিল কোথায় গেল দেখেছ?'

"সকলেই বলল, 'কই, না, দেখি নি তো।'

"শ্বশুর বললেন, 'সে কি। এই যে এতক্ষণ বসে ছিল আমার কাছে—ন্যাংটো, কাঁধে একখানা হলদে কাপড়, ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দুটি।

"শাশুড়ি একটু খিটখিটে ছিলেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'জ্বালিও না বাপু, একবাড়ি লোক গিজগিজ্ করছে, ছোট ছেলে একটা এল, রইল, বেরিয়ে গেল —কাকে-কোকিলে জানতে পারলে না। বউমা ওঁর মিছরির পানাটা দিয়ে এস, রাজ্যির বেলা করবেন, না নিজের মাথার ঠিক থাকবে না অন্যের মাথা ঠিক থাকতে দেবেন।'

"কে আর মিছরির পানা খাবে? সেই নৈবিদ্যির ফল নাড়ু হাতে করে

সমস্ত পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালেন—'হ্যাগো এ রকম একটা ছেলে, হলদে কাপড় কাঁধে তোমাদের বাড়ির ছেলে কি? দেখেছ কি?' কিন্তু কে দেখবে? সে কি কারুর বাড়ির ছেলে যে লোকে দেখবে তাকে?"

শাশুড়ি একটু থামিলেন। দুই জনের চোখই জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

আবার বলিতে লাগিলেন, "তখন এসে, সেই হাতের নৈবিদ্যি হাতে করে পূজার ঘরে ঢুকে আসনে শুয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন গেল, সমস্ত রাত গেল, আহার নেই, নিদ্রা নেই। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এসে স্বপ্ন হল, "পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেই কি আমায় পাবি? ওঠ্ তোর নৈবিদ্যি খেয়েছি, ক্ষীরের এক পাশে আমার দাঁতের চিহ্ন দেখতে পাবি। খা, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, তুই আমাকেও উপোসী করে রেখেছিস।"

অশ্রু মুছিতে মুছিতে দুইজনে বাহিরের বকে আসিয়া বসিলেন। এই ধরণের গল্প চলিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে গীতা ও ভাগবতের তত্ত্বকথা, ভক্তের জন্য তিনি কি ভাবে কত লীলারূপ ধরেন, নিজের মুখে কোথায় কি আশার কথা করে বলিয়াছেন, সেই সব।

গল্পের মধ্যে শাশুড়ি বলিলেন, "এ সব কথা কিন্তু কাউকে আর এখন জানিয়ে কাজ নেই, বউমা। অবিশ্বাসীর কানে গেলে তিনি কষ্ট পান, কতবার স্বপ্নে বলেছেন, আমার লাঞ্ছনা হয় ওতে।"

উঠানের ওদিকে সদর-দরজায় খোকার আবির্ভাব, কে কাপড় পরাইয়া দিয়াছিল, শুধু কোমরের গেরোটি লাগিয়া আছে। বাঁ হাতে কাপড়ের পাড়ে বাঁধা একটা ভাঙ্গা কলাই-করা সানকি, ডান হাতে সেই চিরন্তন লাঠি। সানকির উপর এক ঘা বসাইয়া মার দিকে চাহিয়া বলিল, 'গোট—ছোনা।

মা হাসিয়া বলিল, "নির্ব্বিবাদে মাব খাচ্ছে কিনা, সোনা তো হবেই।"

খোকা হঠাৎ গরু আর গরু-শাস্ত-কয়া লাঠি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার রেওয়াজ মাফিক বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিল। ঠাকুরমা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে ভাই? আজ তোর সাথী তোর সঙ্গে খেলবার জন্যে যে—"

খোকার পাঁচ-সাত টানের বেশী গ্রহণ করিবার কোনো কালেই ফুরসত থাকে না। খেলার নামে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিল, "ঠাম্মা, তুই—"

এই সময় কাকা আসিয়া বলিল, "বউদি, ভাত।"

খোকা বোধহয় ঠাকুরমাকে খেলিবার জন্ত উৎসাহিত করিতে যাইতেছিল, সামনে এমন জবর সঙ্গী পাইয়া মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। ছুটিয়া গিয়া চোখে মুখে প্রবল আগ্রহের দীপ্তি ভরিয়া প্রশ্ন করিল, "ছেয়ে, খেব্বি?"

কাকা শখ করিয়া ভাইপোকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছে। পিতাপুত্রে আবার একচোট মাতামাতি চলিল।

আশায় আশায় দিন কাটিতেছে, গোপালের আগমনের কিন্তু কোনও নিদর্শনই আর পাওয়া যায়না। নৈবেদ্যের পরিবর্ধিত আয়োজন—শুদ্ধাচারে তৈয়ারী করা, দুইটি অন্তরের ভক্তিরস দিয়া সিঞ্চিত—যেমনকার তেমনই পড়িয়া থাকে। বাটিতে বাটিতে সর, ক্ষীর, ননী, রেকাবিতে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নাড়ু কোনটারই কোনোখানে প্রত্যাশিত করচিহ্নটুকু পড়েনা। বধূ উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে, শাশুড়ি বাহির হইলে মুখে গাঢ় নিরাশার ছায়া দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতেও সাহস করে না।

চারিটি দিন কাটিয়া গেল। হাতে দুইটি নাড়ু লইয়া রান্নাঘরের রকে আসিয়া শ্রান্তকণ্ঠে শাশুড়ি বলিলেন, "নাঃ বউমা, কাল থেকে গয়লা-বউকে বলে দিও, যেমন দুধ দিচ্ছিল তেমনই দেবে। মিছে আশা। —কই দাদু, পেসাদ খেয়ে যাবে।"

বধূ ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিল, "আমাদের কি সে রকম অদৃষ্ট মা?"

খোকার কাকা ঘর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "মা, ও হতভাগাকে কিছু দিও না; আমার সব নষ্ট করে দিয়েছে, দেখ এসে বরং।"

খোকা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল। বুকে পিঠে সর্বাঙ্গে কালি, একটা চড়ের উপর দিয়া ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মুখে হাসি। সিঁড়ি দিয়া রকে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ক, ক।"

মা ধমক দিয়া বলিল, "খুব ক খ হয়েছে। তোমার ঠ্যাং খোঁড়া না করে দিলে আর—"

ঠাকুরমা বলিলেন, "থাক, হয়েছে, আর বকেনা।" হাতে নাড়ু দিয়া খোকাকে আলগোছে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন, তোর সাথী আমার পূজোর ঘরে কবে আসবে দাদু, ক্ষীর সর নিয়ে এই রকম [illegible] করতে?"

খোকা নাড়ু চিবানো বন্ধ করিয়া কথাটা যেন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর পুনরায় বার কতক মুখ নাড়িয়া, খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "পেছা ঠাম্মা?"

"হ্যাঁ ভাই, পেসাদ খেতে সে আর আসবেনা ?"

খোকা ঠাকুরমার মুখের খুব কাছে মুখটা লইয়া গিয়া, নিজের চোখ দুইটা খুব জোর একটু বুজিয়া থাকিয়া, আবার খুলিয়া বলিল, "ঠাম্মা, এনো কনো।"

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "মিছিমিছি চোখ ও রকম করতে যাব কেন রে হনুমান ?

খোকা আর একবার চোখ বুজিয়া ব্যাপারটার পুনরভিনয় করিতে যাইতেছিল, "ও বুঝেছি !" বলিয়া ঠাকুরমা আবেগভরে বুকে চাপিয়া গভীর বিস্ময়ে বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন, "বউমা, দেখলে ? আমি বলি তোমাদের, এ আমাদের ছলতে এসেছে।'

বধূও বিস্মিত হইয়াছিল, তবে সেটা প্রধানত শাশুড়ির আচরণে; নির্বাক হইয়া সপ্রশ্ননেত্রে চাহিয়া রহিল। শাশুড়ি বলিলেন, "ওর বলবার ইচ্ছে একেবারে চোখ বুজে বসে থেকো, তা হলেই আসবেন। ঠিকই তো বউমা, এখন বেশ মনে পড়ছে কিনা, একটু দেখতে পাব আশা করে এ:কটা দিন ধ্যানের সময় ক্রমাগত চোখ খুলে যাচ্ছে, তাতে কি আর তিনি আসেন মা ? যে দিন আসেন, সেদিন কতক্ষণ যে একঠায় চোখ বুজে ছিলাম, এখন সে সব কথা মনে পড়ছে। তাতে মন সুস্থির না হলে তো হবে না মা, গাছটিকে যদি ক্রমাগতই ওপড়াও, তবে কি গোড়া বসতে পারে ?

"কিন্তু ওই শিশু নিজের খেলায়ই মত্ত, কি করে জানলে ও ?"

খোকাকে বুকে মিশাইয়া লইবার মতো করিয়া সজল নয়নে প্রশ্ন করিলেন

"তোর কি মনে আছে দাদু ? বড যে ভয় করে ভাই !'

অমঙ্গল আশঙ্কায় মাও চক্ষে অঞ্চল দিল।

তাহার পর দিন রবিবার ছিল, রান্নাবান্নার তাড়া নাই। বড়ছেলেকে রোজ আটটার সময় আহার করিতে হয় বলিয়া রবিবার দিন একটার সময় আহারে বসিয়া যুগপৎ নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং চাকরির উপর আক্রোশ মিটায়। শাশুড়ি বধূতে পরামর্শ হইল পূজার সময় সেদিন বধূ পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে না, খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে যাইবে। ভিতর বাড়িতে শুধু শাশুড়ি থাকিবেন একা পূজার ঘরে।

সেদিন রাত্রি থাকিতেই শাশুড়ি উঠিয়া, একান্ত শুচিতার সহিত স্নানাদি সারিয়া পূজার আয়োজন করিলেন। ক্রমে গব্য দ্রব্যের, ফুল ও চন্দনের গন্ধে ঘরটি ভরপুর হইয়া উঠিল। একটু বেলা হইলে বড়ছেলে রবিবারের অনিশ্চিত

আড্ডায় চলিয়া গেল। ছোটছেলেদের ক্যারাম প্রতিযোগিতা সামনে, সে মহলা দিতে গেল। বধূও এদিক-ওদিক একটু পাঠ সারিয়া খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে চলিয়া গেল। নির্জন নিঃশব্দ বাড়িটিতেও শুধু একটি ব্যাকুল ভক্ত সংসারের সহস্র প্রয়োজনে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সাধ্যমতো আকৃষ্ট করিয়া আশায় অবাধ্য নয়নদ্বয়কে প্রতীক্ষায় সংযত করিয়া পূজার আসনে বসিয়া রহিল। শিশুর কথা দেবতারই ইঙ্গিত, খোকা চোখ বুজিতে বলিয়া চোখ খুলিয়া দিয়াছে। অনেকক্ষণ গেল, ক্রমেই শরীর মন যেন কী একটা অপার্থিব সুষমায় ভরিয়া আসিতে লাগিল —প্রথম দিনের মতোই, ক্রমে ক্রমে প্রথম দিনকেও অতিক্রান্ত করিয়া।

কাকা খোকাকে ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারেনা, বিশেষ করিয়া ছুটির দিন। খেলার মধ্যেই বাড়ি আসিয়া দেখিল, আর কেহ নাই শুধু খোকা পূজার ঘরের নীচু জানালাটায় পেটটি চাপিয়া গভীর একাগ্রতার সহিত ভিতরে উঁকি মারিতেছে। কাছে যাইতে ডান হাতের কচি মাংসল আঙুল কয়টি জড়ো করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ফিসফিস করিয়া বলিল, "চুপ বাবা অবো।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বিশেষ করিয়া তাহার বাবা হওয়ার লোভ দেখাইবার ধরণ দেখিয়া কাকার বেজায় হাসি পাইল। ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কোথায় ?"

খোকা মুঠাটি গালের উপর বসাইয়া ক্ষুদ্র তর্জনিটি পাশের বাড়ির দিকে নির্দেশ করিয়া একটু কুঁজোর মত হইয়া দাঁড়াইল, কোনো কথা বলিল না। তাহার নূতনত্ব আর বিচিত্রতায় কাকার হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইল। পাশের বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বউদি, শিগ্‌গির এস ; একটা মজা দেখবে এস তোমার ছেলের।"

বউদিদি নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতেছিল, বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তাই তো। কখন চলে গেছে সেটা ?"

হন্‌হন্‌ করিয়া ছুটিল, ছোটদের মধ্যে দুই-একজন সঙ্গও লইল।

খোকা জানালার কাছে নাই। দেবরের সঙ্গে রকে উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে নজর দিয়াই বধূ বিস্ময়ে আশঙ্কায় নির্বাক হইয়া গেল। শাশুড়ির মুদিত নয়নযুগলে ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে ; একটু দূরে কালো পাথরের বাটিতে ক্ষীরের মধ্যে হাত ডুবাইয়া খোকা সতর্কভাবে ঠাকুরমার চোখের দিকে চাহিয়া ; পলাইবার উদ্যমে শরীরটা মাটি হইতে একটু উঠিয়া পড়িয়াছে। জানলা দিয়া ছায়া পড়িতেই ফিরিয়া চাহিয়া দুইটা হাত পেটে জড়ো করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

"ও মাগো!"—বলিয়া বধূ ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। শাশুড়ি হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া আচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বউমা?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামনের দৃশ্যটিতে নজর পড়ায় আর উত্তরের প্রয়োজন হইল না।

বধূ বলিতে লাগিল, "তোমার এই কীর্তি হতভাগা চোর? আমরা নাগাড়ে ক্ষীর সর মাখন তোয়ের করে করে হয়রাণ হচ্ছি আর তোমার ভেতরে ভেতরে এই মতলব? তুমি আমার কাছে না ছুটে যদি ধরে নিতে ঠাকুরপো, কি নৈরেকার কি অনাচার টাই—"

"আমি কি জানি? ভাবলাম এর পরে নকল করবে বলে জানালা থেকে মার পুজো দেখছে; ওঁর মালাজপের নকল করে দেখনা? ওর পেটে পেটে যে এই মতলব তা কেমন করে জানব? সে বুড়ুটে ভাব যদি দেখতে। আবার বলে বাবা হব চুপ কর।"

"হওয়াচ্ছি বাবা। এইজন্যে কাল ঠাকুরমাকে পরামর্শ দেওয়া হল, চোখ বুজে থেকো—চেপে। চারদিন থেকে জুত হচ্ছিল না, না?" বলিয়া রাগ না চাপিতে পারিয়া বধূ হাত উঠাইয়া আগাইয়া গেল।

শাশুড়ি এতক্ষণ বিস্মিত হাস্যে খোকার দিকে চাহিয়া এক রকম ধ্যানের ভঙ্গীতেই মৌন হইয়া বসিয়াছিলেন। বধূ অগ্রসর হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার বৌমা।" সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া খোকাকে কোলে লইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। ক্ষীর-মাখানো হাতটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই তাঁর চাঁদমুখ। বউমা, বললে বোধহয় বিশ্বাস করবেনা, আজ গোপাল এসেছিল। ধ্যান করবার সময় মনে হল, যেন ঘর আলো করে এলেন, ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবুলেন, এমন সময়ে তোমাদের গলা শুনে জেগে উঠলাম।"

খোকার কীর্তি রাষ্ট্র হইয়া গেল। কতমুখে বিদ্রূপের হলাহল উদ্গিরিত হইতে লাগিল। বধূরও ভ্রান্তি ঘুচিল বোধহয়। কিন্তু একজনের মনে কেমন করিয়া সত্যের একটি শিখা অম্লান আলোয় জ্বলিয়া রহিল। বধূকে আদেশ হইল, "কাল থেকে খোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বউমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।

খোকা

খোকাকে আপনাদের মনে থাকিতে পারে, কিছু পূর্বে তাহাকে গৃহদেবতা গোপালের জন্য সঞ্চিত ক্ষীর চুরি করিতে দেখা গিয়াছিল। ছেলেটি এখন আরও একটু বড় হইয়াছে। এখন তাহার মায়ের কোলে তাহার সেই সময়কার বয়সের একটি বোন।

খোকার ধারনা অবশ্য—একটু নয়, সে খুব বড় হইয়াছে। এত বড় যে কত বড় সে নিজেই ঠিক মত ধারনা করিতে পারে না। আন্দাজটা পাকা করিবার নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। এ বিষয়ে তাহার সহায়িকা খুকী। অমন লক্ষ্মী সহায়িকা থাকিলে পরীক্ষার সুবিধাও অনেক। খোকা যখন পাশের বাড়ির গৃহশিক্ষক নিবারণ পণ্ডিত হইয়া বসে, খুকী পাশের বাড়ির মনুর চেয়েও বেশি দুলিয়া দুলিয়া পড়া করিতে থাকে। দোলন একটু কমিলে নিবারণ পণ্ডিতের মতই খোকা গম্ভীর ভাবে বলে, "খুকু, তোমার বাবাকেও পড়িয়েছি, তোমাকেও পড়াচ্ছি—আমার কাছে ফাঁকি চলবে না। পড়।...তুমি এইবার এই রকম করে বল—'বাবাকেও পড়িয়েছেন মাস্টার—মশাই ?—ওরে বাবা'।"

খুকু অতটা পারে না, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করে, বলে, "পলেছিলে মছাই ? ওলে ব্বাবা !"

খোকা চোখ পাকাইয়া হাত দোলাইয়া বলে "হুঁ ! এই হাতে কত কানমলা খেয়েছে, জিগ্যেস ক'রো না তোমার বাবাকে।...এইবার তুমি আমায় এই রকম করে চেয়ে বল—'ওরে ব্বাবা' !"......

বড়য় রূপান্তরিত হওয়া ব্যতীত খোকা এক এক সময় নিজেই বড় হইয়া গিয়া বড় বড় কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়—বাবার জুতা পরিয়া, কি কাকার মোটা ডাক্তারী বই লইয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে, তাহার পর হঠাৎ খেয়ালি বদলাইয়া আসল বয়সের খেলার ঝোঁকে বই, জুতা কোথায় থাকে পড়িয়া—যথাসময়ে সেগুলোর খোঁজ পড়ে। খোকার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে কাকার কিল, বাবার চাপড়, মায়ের গঞ্জনা। পূজার সময় খোকাকে এখন আর ক্ষীর চুরি করিতে দেখা যায় না। নৈবেদ্য উৎসর্গের সময়টিতে খুকীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কাছটিতে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ; বড়র উপযোগী সব উপদেশ দিতে থাকে, "খুকু তুমি ওটা খাবো মনে করছ নাকি ? করতে নেই ! নোলায় খবরদার জল আসতে

নেই খুকুমণি, ঠাকুর তাহলে"—নিজের নোলা জলে অচল হইয়া পড়ার বোধ হয় থামিয়া যাইতে হয়।

খুকীর লোভটা অন্যত্র, রসনা আশ্রয় করিয়া ততটা নয়। রংচঙে কাপড় চোপড় জড়ান মূর্তিটির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে, "ঠাকুল নোব।"

এবার খোকা একেবারে অকৃত্রিম ভাবে বড় হইয়া পড়ে। খুকীর মুখটা খপ করিয়া চাপিয়া ধরে এবং যাহাতে এত বড় অনুচ্চরণীয় কথাটা ঠাকুরমা বা ঠাকুরের কানে না যায় সেই জন্য খুকীর একেবারে মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া খুব চাপা গলায় বলে, "বলতে নেই খুকু। চুপ কর।"

এমন ভীষণ অন্যায়টা খুকী যাহাতে আবার না করিয়া বসে সেই জন্য তাহার মুখটা চাপিয়া বসিয়া থাকে এবং ঠাকুরমার পূজা সাঙ্গ হইলেই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া ওঠে, "খুকুর কথা শোন ঠাকুমা। বলছিল ঠাকুর নেবে! ঠাকুরকে পুতুল ভেবেছে! এবার ঠাকুর ওকে কি করবেন?"

ঠাকুরমা চারিটি মুঠা ক্ষীরে কলায় ভরিয়া দিতে দিতে হাসিয়া বলেন, "কিচ্ছু করবেন না, এবারটি আমি বলে দেবখন।"

খোকা করুণায় মুখ-চোখ কুঞ্চিত করিয়া ঠাকুরমার পানে চাহিয়া বলে, "হ্যাঁ ঠাকুমা, বলে দাও, কচি মেয়ে বলে ফেলেছে একটা কথা—ওর তো জ্ঞান হয় নি এখনও তত।......"

ঠাকুরমার সঙ্গে কথাবার্তায় ঠাকুর যদি তাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, সেই জন্য খোকা আগে থাকিতেই সাবধান হইয়া প্রশ্ন করে, "আমি কখনও বলেছি ঠাকুমা?"

না, খোকা বলিবে কি করিয়া? তাহার পক্ষে তো বলা সম্ভবই নয়। সে যদি খুকুর মত না জানিত তবে তো বলিত? সে যে জানে ওটা পুতুল নয়, গোপাল। অবশ্য গোপালকে ঠাকুর ভাবিতে ওর এক এক সময় কি রকম মনে হয়—মনকে ভয় দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া মনে করাইতে হয়; কিন্তু ওটা যে রথযাত্রায় পাঁচুর মার দোকানের পুতুল নয়, এটা খোকা ঠিক জানে। এটা যে গোপাল তাহার একটা মস্ত বড় প্রমাণ এই যে, দিনমানে এটা পুতুল হইয়া থাকে। এই যে লুকোচুরি এইটিই গোপালের পরিচয়—গোপালের স্বরূপ। এ-পরিচয় খোকার জানা আছে—অবশ্য কথাটা খোকা আর গোপালের মধ্যে একটা গোপন

রহস্ত।…ঠাকুরমা রাত্রে বৃন্দাবনের গল্প করিতে করিতে যখন ঘুমাইয়া পড়েন তখন হইতে আরম্ভ হয় গোপালের লুকোচুরির এই খেলা। আরম্ভটা খোকা ঠিক ধরিতে পারে না। খুব চেষ্টা করে তবে এখন পর্যন্ত পারে নাই ধরিতে।

"গল্প বলিতে বলিতে ঠাকুরমা ঘুমাইয়া পড়িলে গোপাল আসিয়া তাহার খুব নরম হাতে খোকার চক্ষু দুইটি টিপিয়া ধরে—নিশ্চয়ই এই গোপালই, কিন্তু কেমন করিয়া ওর পাথরের হাত অমন ঘুমের মত নরম হইয়া যায় খোকা ঠিক বুঝিতে পারে না। গোপাল যখন ছাড়িয়া দেয় চোখ, তখন খোকা দেখে সে একেবারে তাহাদের খেলার জায়গায়—

বিছানায় তাহার ঠাকুরমার পাশে আর শুইয়া নাই। সেখানে তালপুকুরের মত কালো জলে-ভরা যমুনার ধারে কদম গাছের আড়ালে আড়ালে তাহাদের লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে। তাহাদের বাড়ীর মুংলীর মত অনেক গরু, বুধীর মত অনেক বাছুর—তাহাদের হাম্বারবের সঙ্গে গোপালের বাঁশির শব্দ খেলায়-ভরা যমুনার তীরে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে। ঠাকুরমা যে গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়েন সব সেই 'রকম—সুদাম আছে, শ্রীদাম আছে, বলাই আছে, সুবল আছে—আরও কত সব আছে। গোপাল সকালে ঠাকুরমার কাছে পূজায়-পাওয়া ক্ষীর সর বিলি করে। যতই বিলি করে ফুরায় না। কি করিয়া যে ফুরায় না খোকা এক এক দিন জিজ্ঞাসা করে।

ঘরের মধ্যে পূজার সময় গোপালের দিকে চাহিতে ভয় করে বটে কেন না, গোপাল একদৃষ্টে ঠাকুরমার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে; কিন্তু যমুনার তীরে খেলার সময় গোপালকে তো মোটেই ভয় করেনা—তাহা হইলে ওদের নন্তকেও ভয় করিত। না, পূজার গোপাল যখন খেলার গোপাল হইয়া যায় তখন করে না ভয়, তাই খোকা করে জিজ্ঞাসা এক একদিন, বলে,. "তুমি এত ক্ষীর সর পাও কোথায়? ঠাকুমা তো তোমায় একটুখানি করে দেন।"

গোপাল বলে, "পৃথিবীতে যত মা আর ঠাকুমা যত ক্ষীর সর লুকিয়ে রাখে আমি সব খুঁজে নিয়ে আসতে পারি।" যত ছেলেরা খেলে সবাই দুষ্টামির হাসি হাসিতে থাকে। খোকা চোখ বড় বড় করিয়া গোপালের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু কথাটা খোকার একটুও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, কেননা ঠাকুমাও তো খোকাকে এই কথা বলিয়াছে কয়েকবার। খোকা জিজ্ঞাসা করে, "তারা কেউ কিছু বলে না তোমায়?" ঘরের ঠাকুরের হাতে যেখানটায় বালা পরান আছে, যমুনাতীরের গোপাল সেইখানটা বাড়াইয়া বলে, "এই দেখনা দাগ, মা বেঁধেছিল…

খোকা দেখে একটুও মিছে কথা নয়, কড়া-বাঁধা রাঙা দাগে হাতটা ফুলিয়া গিয়াছে...আবার লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে। অবাধ খেলা—কাহারই বাবা কি কাকা কাছে নাই যে ধমক দিবে এমন কি মা কি ঠাকুরমাও নাই যে মুখের ঘাম মুছিয়া—কি পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া খেলার মধ্যে বিরতি আনিবে।

রোজ প্রত্যহ গোপাল আসিয়া যখন থেকে চোখ টিপিয়া ছাড়িয়া দেয় এই খেলা আরম্ভ হয়—শেষ হয় যমুনাতীরের সন্ধ্যাবেলায় সূর্য ভোরবেলায় যখন খোকাদের ঘরের সামনে নন্তুদের অশ্বত্থ গাছের পাতায় পাতায় রঙের ছিটে ছড়াইতে থাকে।

খুকী ভাবে ঠাকুর পুতুল। কচি মেয়ে—ভাবুক; কিন্তু খোকা জানে ঠাকুর কে; খোকা জানে ঠাকুরের হাতের বালার নীচে তার মায়ের বাঁধনের রাঙা দাগ লুকান আছে। ঠাকুরমাও বলে আছে। খোকা যেমন ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছে, ঠিক তেমনই করিয়া গোপাল বলে, "এ দাগ আমার সোনার বালার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। দাগের লোভেই তো মায়ের ভাঁড় থেকে ননী চুরি করি আমি।"—খোকা ঠিক বোঝে না কথাটা—বাঁধনের দাগ কেন লাগিবে ভাল?

গোপাল পাথরের গোপাল হইয়া লুকায়; যখন যমুনাতীরের গোপাল হইয়া যায়, মায়ের বাঁধনের রাঙাদাগ মেলিয়া ধরে।

এক একদিন পূজার সময় প্রসাদের জন্য বসিয়া বসিয়া খোকা এই লুকোচুরির ঠাকুরের চোখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার যেন এক একবার মনে হয় কাল পাথরের উপর টানা সাদা চোখে কি একটা হয়—মনে হয় একটা দুষ্টু হাসি চোখের কোণে আস্তে আস্তে ঢুকিয়া পড়িয়া গোপালের সমস্ত মুখটাতে ছড়াইয়া পড়ে। প্রায় কথা কওয়ারই মত কি এক ধরনের হাসি, কত দিনের চেনা—যমুনাতীরের কত কি সব যেন চারিধারে ওঠে জাগিয়া।

আবার সব মিলাইয়া যায়; হাসি বাঁশী সুদামভাই, ফোটা-ফুলে ভরা কদমগাছ, পেখমধরা ময়ূর সব। খোকা ঠাকুরের চোখের দিকে চাহিয়া খোঁজে যত খোঁজে ততই আরও পায় না; ভাবে ঠাকুরমার গোপালের হাসিটি পর্যন্ত কি লুকোচুরির না জানে!—ভয়ানক আশ্চর্য বোধ হয় খোকার।

আজ কয়েকদিন হইতে সমস্ত বাড়িটি বড় বিষন্ন হইয়া আছে। ঠিক এ-ধরনের অভিজ্ঞতা খোকার জীবনে এ পর্যন্ত হয় নাই। বাবা ডাকিয়া আদর-

করিতেছে না, খোকাকে তো নয়ই, এমন কি খুকীকে পর্যন্ত নয়। কাকা বই হারাইলে আগে মারিত, তাহার পর আদর করিত; বেশি মারিলে খেলনা পর্যন্ত কিনিয়া দিত এমন আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটিয়াছে কয়েকবার। আজ দুই দিন হইতে বই কোথায় আছে তাহার খোঁজই করেনা। খোকার মনটা এক একবার যেন কান্নায় ভরিয়া উঠে, শুধু কি লইয়া কাঁদিবে বুঝিতে পারে না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে। আজ সকালে বাবা কোথায় গেল? আগে যখন কোথায় যাইত, খোকাকে খুকীকে চুমা খাইত; আজ ঠাকুরমাকে আর কাকাকে কি বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। খোকার ঠোঁট ফুলিয়া যাইতেছিল বলিয়া কপাটের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বাবা তো ডাকিলও না একবার।

ওদিকে মায়েরও অসুখ। কাকা বলে খুব শীঘ্র ভাল হইয়া খোকাকে আর খুকুকে আদর করিবে বলিয়া খুব ঘুমায়। কাকা ঘুম ভাঙাইতে বারণ করিয়াছে খোকাকে। খোকা কখনও তো মাকে জ্বালাতন করে না খুকীর মত। বড়রা কখনও মাকে জ্বালাতন করে? কিন্তু মাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনটা যে ছটপট করিতেছে।

খোকা দিনগুলাকে আবার সেই পুরান খাতে চালাইবার জন্য নিজেই একবার ওপরপড়া হইয়া চেষ্টা করিল। কাকার সবচেয়ে মোটা ডাক্তারী বইটা কাঁধের উপর সাপটাইয়া লইয়া কাকার ঘরের দরজার পাশে গিয়া দু-একবার উঁকি মারিল, তাহার পর প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া বলিল—"কাকা, কি দুষ্টু খুকু। তোমার বইটা লুকিয়ে রেখেছিল ভাগ্যিস আমি…"

কাকা ফিরিয়া চাহিতে খোকা দেখিল, কাকার চোখ জলেভরা। কাকাকে তো কেহ মারে নাই, তবে?…খোকার মনটা কি রকম হইয়া উঠিল। কাকা যদি বলিত, 'খোকা, তোমারই কাণ্ড বই লুকুন' তাহার পর যদি চিরাচরিত পদ্ধতিমত একটা চাপড় বসাইয়া দিত, খোকা রাজি ছিল—তাহার পর আদর না করিলেও তাহার দুঃখ ছিল না। চোখে জল দেখিয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এ দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই, বড়রা কাঁদিবে কেন? কে তাহাদের মারে?

বইটা আস্তে আস্তে কোন রকমে এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া খোকা চোরের মত গা লুকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার মনটাতে কি রকম একটা হইয়াছে—কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব—খোকা চাহে না কেহ তাহাকে এ-অবস্থায় দেখিয়া ফেলে—কাকা ঠাকুরমা কেহই নয়, এমন কি খুকি পর্যন্ত নয়।…

:তাহার পর আবার কি হইল খোকা বুঝিতে পারিল না—তবে এই না-মার খাওয়া না-বকুনি খাওয়ার অপমানে খোকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কাকা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে কোলে জড়াইয়া মুখ নিচু করিয়া প্রশ্ন করিল, "খোকা তুই কাঁদছিস? কেন রে? মার জন্য মন কেমন করছে? মাকে তো গোপাল ভাল করে দেবেন, কান্না কিসের? চল্ দিকিন সারদার দোকান থেকে তোকে নতুন একটা খেলনা কিনে দিই…"

মায়ের নামে খোকার মনের সেই কেমন-কেমন ভাবটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। আবার অন্য দিক দিয়া সে যেন একটা কূল পাইল। কিছু বুঝিতে পারিতেছে না অথচ যে একটা কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহার জায়গায় মাকে লইয়া দুঃখ অভিমান, খোকা যেন একটা আশ্রয় পাইল। মার সে তত ভক্ত নয়, ঠাকুরমা আর কাকা লইয়াই তাহার জীবন। তবু খোকা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "মার কাছে যাব আমি"।

ভাল করিয়া প্রকাশ্যে কাঁদিয়া বাঁচিল যেন।

কাকা বলিল, "নিশ্চয় যাবি, বাঃ যাবিনি! তোর মা এখন ঘুমুচ্ছে খোকা, যেই উঠবে তোকে নিয়ে যাব। ততক্ষণ খেলনা নিয়ে আসিগে চল।…খুকুর জন্য কি খেলনা নিবি খোকা? খুকুকে যে বড্ড ভালবাসে খোকা আমাদের; দাদা হয়, বাসবে না? বারে!"

খোকার আর কান্না নাই, তবে চোখে জল আছে এবং কান্নার বিরামে এক-একবার ফুঁপাইয়া উঠিতেছে। বলিল, "খুকু ভারি দুষ্টু, মার মুনা খাবে বলে।"

"হ্যাঁ খুকু ভা—রি দুষ্টু। মাকে ঘুমোতে দেবেনা, খালি ক ব মুনা খাব। কৈ খোকা তো বলে না…খোকাকে খুব বড খেলনা দিতে হবে। চল্ কিনে নিয়ে আসি…"

নামিয়া উঠান দিয়া যাইবে, ওদিককার ঘর থেকে ঠাকুরমা বাহির হইয়া আসিলেন, ডাকিলেন, "বড খোকা, কোথায় যাচ্ছিস ওকে নিয়ে? এদিকে আয়।"

খোকা হওয়ার পর খোকার কাকা বড় খোকা হইয়াছে, কতকটা শঙ্কিতভাবে মার পানে চাহিয়া খোকাকে লইয়া অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছে বৌদি? আবার বাড়ল নাকি?"

মা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "বুঝ্‌ছি না। খোকাকে দেখতে চাইছে, আয় নিয়ে একবার বাছা, কোনও দোষ হবেনা।"

ছেলে একবার ভাবিল। ডাক্তার বলিয়া গেছেন, ছেলে মেয়েকে দূরে দূরে রাখিতে। একটু কাছে থাকিলে ভাবাবেগে মুমূর্ষু রোগিনীর আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে।…অথচ যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অভাবের বেদনাও তো কম আশঙ্কার বিষয় নয়।

সে মাত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র। বৌদির সংকটের কথা শুনিয়া আজ তিনদিন আসিয়াছে। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার করুণাবাবু মহকুমায় গিয়া কি করিয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, কাল রাত্রে আসিবার কথা ছিল, আজ এখন পর্যন্ত আসেন নাই। এদিকে রোগিণীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডাক্তার আসে না দেখিয়া দাদা নিজে আজ সকালে মহকুমায় গিয়াছে, করুণাবাবু না আসিতে পারেন, অন্য ডাক্তার লইয়া আসিবে। বড় খোকা একলা অকুলপাথারে পড়িয়াছে।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা একটু দাঁড়াও মা, বুকটা একবার দেখে নিই!"

ঘর হইতে স্টেথস্কোপটা আনিয়া রোগিণীর ঘরে প্রবেশ করিল। একটু পরে বাহির হইয়া আসিল—মুখটা খুব বিষণ্ণ।

মা চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না।

বড় খোকা খোকার হাতটা ধরিয়া বলিল, "চল্ খোকা, মার তোর ঘুম ভেঙেছে।"

খোকা আজ দুদিন পরে মা'র কাছে আসিল। ঘরের বাতাসটার মধ্যে কি একটা আছে, খোকার বড় ভয় করিতেছে। মাকে এরকম কখনও দেখে নাই, এত রোগা…পরশুও তো মা'র অসুখ ছিল, দাওয়ার রোদে বসিয়া তাহাকে গল্প বলিয়াছে, খুকুর পুতুলকে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে! মাকে দেখিয়া ভয় করে আজ।

মা ইসারা করিয়া খোকাকে ডাকিল। খোকা পা উঠাইতে পারিল না, ঠাকুরমার কাপড়টা খামচাইয়া ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুরমা এক হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"চল দাদু, মা ডাকছে।"

কতকটা জোর করিয়াই খোকাকে তুলিয়া খাটের উপর মা'র কাছে শোয়াইয়া দিলেন। খোকার এমন বিচিত্র অনুভূতি জীবনে কখনও হয় নাই। ভয়ে লজ্জায়, সব মিসে মিসে সে জড়সড়। মায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল।… মা আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে, চোখ দিয়া আস্তে আস্তে জল

গড়াইয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ পরে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়না এইরকম আওয়াজে বলিল, "কেঁদ না যেন, সোনা আমার।"

ঠাকুরমা খোকাকে বুকে চাপিয়া নামাইয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন। কাকা ঘরেই রহিয়া গেল।

খোকা মুখ তুলিতে সাহস করিতেছে না; বাহিরে আসিতে আসিতে ঠাকুরমারও কান্না নামিল নাকি?

একটা অব্যক্ত ভয় যেন খোকার অন্তরে অন্তরে ছাইয়া ফেলিল। খোকা অসুখ কাহাকে বলে জানে। অসুখে লেপ মুড়ি দিয়া কাঁপে লোকে, সাবু খায়, কাজ না করিয়া দাওয়ার রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর গোপাল ভাল করিয়া দেন—দু'দিন পরে রুটি খায়, তাহার পর ভাত। খোকার কাছে অসুখের এই স্বরূপ বিশেষ অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ এটা কি? গোপাল এখনও ভাল করিয়া দেন না কেন?

এর পরের অবস্থাটা খোকার অভিজ্ঞতার একেবারেই বাহিরে—চিন্তার মধ্যেই আসিল না। তবে অন্য সব নানান রকম প্রশ্ন বিশেষ করিয়া গোপালের এই নিশ্চিন্ততা তাহার সমস্ত চিন্তাকে জুড়িয়া তাহার মনটা ভার করিয়া রাখিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা;—মার কত কষ্ট হইতেছে। না, মা ভাল হইয়া যাক,—এ-মা'কে দেখিলে ভয় হয়, মিছামিছি কান্না আসে. বড় কষ্ট হয়…

মাকে দেখার পর হইতে সমস্ত বিকালটা খোকা খুব শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হইয়া রহিল, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সে বায়না ধরিল।

বায়নার কোনও হিসাব নাই। আরম্ভ করিল মার কাছে যাইবে বলিয়া। সন্ধ্যার সময় রোগিণী আরও নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। কাকা বলিল "একটু থাম্ খোকা, আবার তোকে যাব নিয়ে…খোকা গিয়ে মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে তাইতেই তো ওর মা ভাল হয়ে যাবে।…খোকা তুমি বড় হয়েছ, দাদার চেয়েও বড় খোকা, খোকাই তো বাড়ির কর্তা এখন। কই খোকা তোর মাকে ডাক্তার হয়ে দেখছি—টাকা দে…!"

রহস্যটা করিয়া কাকা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু খোকা যোগ দিল না। তিনটা আঙুল মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "মার কাছে যাব!"

কাকা অশেষ প্রকারে খোকাকে বড় বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, লক্ষ্মী প্রতিপন্ন করিল, কত রকমের প্রলোভন দিল; সব করার শেষেই খোকার ঐ একটি কথা, "মার কাছে যাব।"

আব্দার যখন কান্নায় দাঁড়াইল খোকাকে বাহিরে লইয়া যাইতে হইল এবং সেখানেও যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, কাকাকে হার মানিয়া রাজি হইতে হইল। খোকা বলিল, "না, যাব না, আগে কেন নিয়ে যাও নি?"...কত সাধ্য সাধনা ওদিকে মাও একবার দেখিতে চাহিয়াছে—কোনমতেই যাইবে না খোকা—তাহাকে আগে কেন লইয়া যাওয়া হয় নাই?...মা ছাড়িয়া জিদটা দাঁড়াইল যাওয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই না-যাওয়া লইয়া—আরও যত রকমের সব আদাড়ে জিদ। কোল মানে না, শাসন মানে না—কাকা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

রোগিণীর কাছ থেকে উঠিবার জো নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমাকে উঠিয়া আসিতেই হইল। বলিলেন, "তুই বোস গিয়ে বড় খোকা বৌমার কাছে আমি আসি একটু সামলে ওকে।...যতীন এ গাড়িতেও এলনা...আজকের রাতটা..."

নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া আঁচলে চক্ষু তুইটা মুছিয়া বলিলেন, "শ্রীহরি শ্রীহরি...এস তো দাদু, আজ অত আব্দার করতে আছে? মাকে তাহলে গোপাল ভাল করে দেবেন কি করে?'

ঠাকুরমার কাছে আসিয়া খোকা অল্পক্ষণেই শান্ত হইয়া গেল। বধূ অসুখে পড়া পর্যন্ত নবীনের মা রান্না করিয়া দিতেছে। ভাত লইয়া কত গল্পের সহযোগে নাতিকে খাওয়াইয়া ঠাকুরমা বিছানায় উঠিলেন। নবীনের মার মেয়ে খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া শোওয়াইয়া গিয়াছে, একদিকে নাতনী আর এক দিকে নাতিকে লইয়া ঠাকুরমা শুইলেন। তাহার পর গল্প আরম্ভ হইল।

"গোপালকে ক্ষীর নাড়ু দিওনা, আগে মাকে ভাল করে দিন...কি করছেন গোপাল, ঠাকুমা? তুমি বলেছিলে গোপালকে ঠাকুমা?"

"বলেছিলুম বইকি দাদু, আজ থেকে বলছি? কতবার বলেছি, তোমাদের ভালয় ভালয় রেখে যেন যেতে পারি। কতবার বলেছি—ঠাকুর আমার তো হল ঢের, এবার ডেকে নাও আমায়। তা কাকে ডাকতে কার ডাক পড়ল..."

কান্নাটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

খোকা ঠিক বুঝিতেছে না—প্রশ্ন করিল, "কেন ডাকবেন ঠাকুমা!—খেলবার জন্যে?"

ঠাকুরমা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "ঘুমো দাদু একটু তাড়াতাড়ি আজ। মনটা তোর মার কাছে পড়ে রয়েছে।"

খোকা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল একটু, কিন্তু গোপালের আচরণ লইয়া মনে অজস্র প্রশ্ন যাওয়া আসা করিতেছে, ঘুম আসিবার পথই বন্ধ।

একটু পরে ধীরে ধীরে ডাকিল, "ঠাকুমা।"

ঠাকুমা বোধহয় নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিলেন; বলিলেন, "ঘুমোস নি এখনও? এই দেখ্।"

খোকা তাহার দুর্ভাবনার একটা যেন সমাধান পাইয়াছে অনেক ভাবিয়া; বলিল, "তোমার কথা গোপাল বোধহয় শুনতে পায়নি।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "হবে হবে"—তাহার পর উদ্গত অশ্রুর সঙ্গে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তিনি সব শোনেন, শুধু আমার কথাই শুনতে পান না। কেন দাদু—কি দোষ করেছি আমি?"

এতো আরও গুরুতর সমস্যা। খোকা আরও ভাবিল, তাহার পর বলিল, "বোধহয় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন, ঠাকুমা।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ঠিক ধরেছিস দাদু তুই, ওঁর বাঁশিই হয়েছে কাল। ঘরে ঘরে আগুন লেগে যাচ্ছে, এত লোকের হাহাকার কান্না ওঁর কানে যায় না। চাষের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, গেরস্তর গোলায় ধান নেই, অত সাধের ধেনু তাঁর—তারাও একমুঠো খড় পায় না। এদিকে কেউ নাড়িছেঁড়া ধন শ্মশানে দিয়ে আসছে—আমিই এই ঘরের লক্ষ্মী সোনার প্রতিমে বিদায় দিতে বসেছি—এত দুঃখু এত হাহাকার তাঁর কানে যায় না। বাঁশি নিয়েই তিনি বিভোর। থাকুন, কিন্তু আমায় আর এত দগ্ধাচ্ছেন কেন দাদু?"

কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় ঠাকুরমা প্রশ্ন করিলেন, "ঘুমোলি দাদু?"

খোকা হাতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া বসিল, উৎসাহের সহিত বলিল, "ঠাকুমা! বাঁশি ভেঙে দেবে? কুটিলা যেমন দিয়েছিল?"

এত দুঃখেও ঠাকুরমার মুখে হাসি আসিয়া পড়িল না ঘুমাইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া নাতি একটা মতলব ঠাহর করিয়াছে বটে। বলিলেন, "তাই হবে'খন; তুই এখন ঘুমো দাদু একটু। পিদ্দিমটাও নিবে আসছে।"

চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খোকার কিন্তু আজ অনেক সমস্যা! গোপালের এই এত ব্যাপারের মধ্যে বাঁশি বাজানোর ব্যাপারটা তাহার অধিকতর দুর্বোধ্য এবং ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ খেলার সময় খুব রাগিয়া গোপালকে বলিবে সে।

অনেকক্ষণ কাটিল—অন্যবারের চেয়েও কিছু বেশিক্ষণ—তাহার পর আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঠাকুমা।"

"কি রে ডাকাত? দেখ তো কাণ্ড!"

"আমি ঘুমুচ্ছি কিনা জিজ্ঞেস করলে না?"

"তুই তো জেগে রয়েছিস দেখছি।"

"এইবার ঘুমুব। সত্যি, তুমি চোখে হাত দিয়ে দেখো…"

ঠাকুরমা খানিকক্ষণ পরে ডাকিয়া সাড়া পাইলেন না। কিন্তু কি ভাবিয়া একবার চোখে হাত দিয়া বুঝিলেন, খুব জোরে চোখ বুজিয়া থাকিবার জন্য খোকার নাক মুখ সব কুঁচকাইয়া রহিয়াছে এবং চোখের পাতা একটু একটু কাঁপিতেছে। হার মানিয়া বলিলেন, "এই তোমার ঘুম? তবে থাক শুয়ে তুমি—নবীনের মাকে ডেকে দিই। আর তোমার সঙ্গে গল্প করলে আমার চলবে না।"

সমস্ত রাত বধূকে লইয়া মাতাপুত্রে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। পুত্র প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভ্রাতৃজায়াকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের অসম্পূর্ণ ডাক্তারী বিদ্যায় যতটা কুলায় চেষ্টা করিয়াছে—মা করিয়াছেন অতন্দ্রিত প্রার্থনা—গোপালের কাছে—"হে ঠাকুর বাঁশি ছাড, ফিরিয়ে দাও আমার সোনার কমল। ছাড বাঁশি একদিনের তরেও। নইলে শিশুর মুখেও তো দুর্নাম রয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে…"

রোগিণীর অবস্থা বোঝা যাইতেছে না। ভোরের একটু আগে একবার খোকা আর খুকীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তুলিয়া দু-জনকেই দেখান হইল। তাহার পর হইতে আরও নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

ভোর হইয়া গিয়াছে। বড়খোকা নিজের ঘর হইতে একটু যেন ব্যস্ত হইয়া আসিল। রোগিণীর বিছানার এদিক ওদিক, বালিশের নিচে কি একটা খুঁজিতে লাগিল উদ্বিগ্নভাবে। মা প্রশ্ন করিতে বলিল, "স্টেথস্কোপটা পাচ্ছি না—একটু আগে বৌদির বুকটা দেখে নিয়ে গেলাম ওঘরে—"

মা প্রশ্ন করিলেন, "নেই?"

"না—একবার বুকটা দেখতে হবে যে! বেশ মনে পড়ছে নিয়ে গিয়ে বাইরে চেয়ারের হাতলটায় রেখে মুখটুকু ধোয়া সেরে নিতে গেলাম। আধ ঘণ্টাও হয়নি, ফিরে এসে দেখি।…"

পাড়ায় হনুমানের উপদ্রব কি যে হইয়াছে! কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। মা-র হাতটা বধূর মাথার উপর জপে নিরত ছিল, উগ্র নিরাশায় টানিয়া লইয়া

বলিলেন, "সব নাও ঠাকুর, চিকিচ্ছের সান্ত্বনাটুকুও আর রেখ না—"

চোখে অঞ্চল দিয়া বধূর শিয়র হইতে নামিয়া কতকটা জোরেই কাঁদিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলের গলার আওয়াজ, "মা। বড় খোকা!"

বড় খোকা তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দাদা আর করুণা ডাক্তার। দাদা শুধু প্রশ্ন করিল, "আছে?"

করুণা ডাক্তার গিয়া রোগিণীর পাশে বসিল। শান্ত প্রকৃতির লোক, ধীরে ধীরে হাতটা তুলিয়া লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়িটা পরীক্ষা করিল, তাহার পর "হুঁ" করিয়া ধীরে ধীরে একটা শব্দের সঙ্গে বড় খোকার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দিয়েছিলে?"

বড় খোকা ঔষধের নাম বলিল।

ডাক্তার রোগিণীর দিকে চাহিয়া ভিতর পকেটে হাত দিয়া একটু থমকিয়া গেল। বলিল "ঐ ঠিক ফেলে এসেছি, যতীন যা তাড়া দিলে, দেখি তোমার স্টেথস্কোপ্‌টা।"

বড় খোকার মুখটা একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "সেটা পাচ্ছি না—বাইরে রেখেছিলাম, বোধহয় হনুমানে···"

মা একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "ও করুণা! তুমি ওকে রাখতে পারবেনা না বাবা, গোপালই আজ বিমুখ আমার ওপর, সব পথ বন্ধ করে···"

ডাক্তার বৃদ্ধার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "চুপ কর খুড়ী।···বড় খোকা তুমি একবার ছোট আমার ওখানে সাইকেলটা নিয়ে। আর যতীন তুমি দেখ ভাল করে খুঁজে···হনুমানেরা এখন ঘুমুচ্ছে, স্টেথস্কোপের লোভে কেউ ঘুম ছেড়ে উঠবে না।"

হারাইলে লোকের প্রকৃতিই হইতেছে সম্ভব অসম্ভব স জায়গাতেই খোঁজে। সম্ভবপর জায়গায় গেল না পাওয়া। তখন অসম্ভব জায়গায় খোঁজ পড়িল এবং গেল পাওয়া।

পূজার ঘরটা একটু ওদিকে একটেরেয়। দেখা গেল ঘরের দুয়ারটা খোলা এবং চৌকাঠের সামনে একটা কাঠের চেয়ারের উপর একটা বেতের মোড়া বসান। স্বভাবতই একটু কৌতূহল হয়।

ঘরের মধ্যে গিয়া যতীন যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

ঠাকুরের হাতে রূপার ডাণ্টির ছোট বাঁশিটা নাই, নিচে দুই খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে!

শুধু তাহাই নয়, বাঁশির জায়গায় দুই হাতের আঙুল দিয়া গলান একটা স্টেথস্কোপ।...ঠাকুরের সাদা সাদা চোখের নির্বিকার দৃষ্টি শূন্যে চাহিয়া আছে"।

হাত পা ধুইয়া রাত্রের কাপড় ছাড়িয়া স্টেথস্কোপটি গোপালের হাত হইতে সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। ততক্ষণে বড় খোকাও ওদিক হইতে ডাক্তারের নিজের স্টেথস্কোপ লইয়া সাইকেল হইতে নামিল।

ডাক্তার সব শুনিল। নিজের ভাল স্টেথস্কোপটাই হাতে করিয়াছিল, একবার কি ভাবিল। সমস্ত গ্রামটাই বৈষ্ণবপ্রধান। ধীরে ধীরে ফিরাইয়া দিয়া বড় খোকাকে বলিল, "দাও তোমারটাই দেখি।"

ভাল করিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া একটা শান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "ওষুধটা কাজ করেছে। হার্টের অ্যাকসন্‌টাও ভাল।—কই গোপালের শাসকটি কোথায় লুকুলেন ?"

রাণুর প্রথমভাগ

আমার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

তাহার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এক তাহার প্রকৃতিগত অকালপক্ক গিন্নীপনা; আর অন্যটি, তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে মনে হয়, বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকুরমার মত প্রবীণা গৃহিনী এবং কাকার মত এম. এ, বি. এল. করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভাল এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরবর্তী ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার শরীর মনটিতে আর অাঁটিয়া উঠিতেছে না—রাণুর কার্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক-জামাও না এমন কি নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে, "আমার কি আর ওসবের বয়েস আছে মেজকা ?

বলিতে হয়, "না মা, আর কি—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকল।"

রাণু চতুর্থ কালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আর দ্বিতীয়ত—কতকটা বোধহয় শৈশবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াই—তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন-পুস্তক পর্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহার বেশ সৌহার্দ্য আছে, এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্ধেকটা সময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথম ভাগের নামেই সমস্ত উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচারীর মলিন মুখখানি ভাবিয়া আমি মাঝে মাঝে এলাকাড়ি দিই—মনে করি, 'যাগ্‌গে বাপু, মেয়ে—নাই বা এখন থেকে বই শ্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করেনি। নেহাতই দরকার বোধ করা যায় আর একটু বড় হোক তখন দেখা যাবে'খন।'

এই রকমে দিনগুলো রাণুর বেশ যায়; তাহার গিন্নীপনা সতেজ চলিতে থাকে এবং পড়াশুনারও বিষয় পড়িয়া যায়। বাড়ির নানা স্থানের অনেক সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয়, তাহার খোঁজ দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর হইতে সময় অসময়ে রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে—ঐ ক-য়ে য ফলা ঐক্য, ম-য়ে আকার ণ-য়ে হ্রস্বই ক-য়ে য ফলা—মাণিক্য বা পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, অথবা রাজা কাকার আইন মুখস্থ করার ঢঙে—হোয়ার অ্যাজ ইট ইজ, ইত্যাদি।

আমার লাগে ভাল, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক স্ফূর্তির এইরকম দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভাল লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া যায় এবং কর্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই—"রাণু!"

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে, উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদ কাঁদ করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালমানুষের মত ধীরে ধীরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। আমি কর্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি; সংক্ষেপে বলি, "প্রথম ভাগ। যাও।"

ইহার পরে প্রতি বারই যদি নির্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত এবং যেন-তেন প্রকারেণ দুইটা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি ইস্তক এই যে আড়াইটা বৎসর গেল ইহার মধ্যে মেয়েটাও যে প্রথম ভাগের ও-কয়টা

পাল্লা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমত তামিল না হইয়া কতকগুলো জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করে মাত্র—যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বার দুই তিন দিন পর্যন্ত রাণুর টিকিটি আর দেখা যায় না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল, তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যায় না। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ যখন নজরে পড়িল, তখন হয়তো সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া কাকাদের পড়ার খরচ পাঠানো কিংবা আহার্যদ্রব্যের বর্তমান দুর্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোন একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবল বেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের যোগাড়-যন্ত্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া সব বিষয়ে নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমার দিকে হয়তো একটু আড়চোখে চাহিল; বিশেষ কোন ভয় বা উদ্বেগ নাই—জানে, এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, সেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন।

আমি হয়তো বলিলাম, "কই রাণু, তোমায় না তিন দিন হল বই আনতে বলা হয়েছিল?"

সে আমার দিকে না চাহিয়া বাবার দিকে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন, "ওহো, সে একটা মহা মুশকিল ব্যাপার হয়েছে, ও বইটা যে কোথায় ফেলেছে—"

রাণু চাপা স্বরে শুধরাইয়া দেয়, "ফেলিনি—বল, কে যে চুরি করে নিয়েছে—"

"হ্যাঁ, কে যে চুরি করে নিয়েছে, বেচারী অনেকক্ষণ খুঁজেও—" রাণু যোগাইয়া দেয়, "তিন দিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও—" "হ্যাঁ, তোমার গিয়ে, তিন দিন হয়রান হয়েও, শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে—"

রাণু ফিসফিস করিয়া বলিয়া দেয়, "হাল ছাড়িনি এখনও।"

"হ্যাঁ, ওর নাম কি, হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হোক, একখানা বই আজ এনে দিও, কতই বা দাম।"

রাগ ধরে, "বলি তুই বুঝি এই কাটারী হাতে ক'রে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!"

কাতরভাবে বাবা বলেন, "আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্যে গালমন্দ করা কেন? এবার থেকে ঠিক ক'রে রাখবে তো গিন্নী?"

রাণু খুব ঝুঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই,

"তোমায় অত করে শেখাই, তবু একটুও মনে থাকে না দাদু। কি যেন হচ্ছ দিন দিন!"

কখনও কখনও হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটির আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস দিয়া, "তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ মেজকা। লোকে আর পড়াশুনা করবে কোথা থেকে?"

আমি বুঝি কাহার কাজ। কটমট করিয়া চাহিয়া থাকি।

দুষ্টু ছুটিয়া গিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধহয় তখন একখানা পাতা মুখে করিয়াছে এবং বাকিগুলোর কি করিলে সবচেয়ে সদ্‌গতি হয়, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে দপ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে, "পেত্যয় না যাও, দেখ। আচ্ছা এ ছেলের কখনও বিয়ে হবে মেজকা?"

আমি তখন হয়তো বলি, "ওর কাজ না তুমি নিজে ছিঁড়েছ রাণু? ঠিক আগেকার পাঁচখানি পাতা ছেঁড়া—যত বলি, তোমায় কিচ্ছু বলব না—খান তিরিশেক বই তো শেষ হ'ল।"

ধরা পড়িয়া লজ্জা-ভয়-অপমানে নিশ্চল নির্বাক হইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাত নৃশংস না হইলে ইহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না, তখনকার মত শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতেই হয়, "হ্যাঁরে দুষ্টু, দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস? আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন করবে রাণু? ওর আর কতটুকু বুদ্ধি বল?"

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে। তখন দুইজনের মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্য সহজ ভাবে তাহার গিন্নীপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড হইয়া যায় যে, ছোট ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ, খুড়া, ঠাকুরমা, এমন কি ঠাকুরদাদা পর্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এই রকম একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এইভাবে আরম্ভ হইল—"কি করে শাসন করব বল মেজকা? আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ—কাজ—আর কাজ।"

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "তা বটে, কতদিক আর দেখবে?"

"যে দিকটা না দেখছি সেই দিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখলে।

কেন রে বাপু, রাণু ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই? খাবার বেলা তো অনেক-গুলি মুখ, বল মেজকা! আচ্ছা, কাল তোমার ঝাল তরকারিতে মুন ছিল?

বলিলাম, "না, একেবারে মুখে দিতে পারিনি!" "তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারেনি। —ফুরসৎ ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি। আজ আর সে রকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেছি মুন।"

আমার শখের ঝাল তরকারী খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম, "তুমি যদি রোজ একবার ক'রে দেখ মা—"

গাল দুইটি অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল।—"হবার জো নেই মেজকা, রাণু হয়েছে বাড়ীর আতঙ্ক। 'ওরে, ওই বুঝি রাণু ভঁাড়ার ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে বসেছে, দেখ্—দেখ্! তোকে কে এত গিন্নীত্ব করতে বললে বাপু?' হ্যাঁ মেজকা, এত বড়টা হলুম, দেখেছ—কখনও আমায় গিন্নীত্ব করতে—কক্খনও—একবত্তিও?" বলিলাম, "ব'লে দিলেই হ'ল একটা, ওদের আর কি!" "মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়তো বললেন, 'ওই বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল!' রাঙী বেড়ালটা বলে, 'আমি পদে আছি।' কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে, রাণু বুঝি ওর বাপের—' আচ্ছা মেজকা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেছি বলে তোমার একটুও বিশ্বাস হয়?"

এ ঘটনাটি সবচেয়ে নূতন, গিন্নীপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া রাণু ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে, ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমি বলিলাম, "কই, আমি তো ম'রে গেলেও এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না।"

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল, "যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে—সে করবে না। আমার কি দরকার, মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার? কেন, আমার নিজের পেরথোম ভাগ কি ছিল না যে, বাবার ফুলদানি ঘাঁটতে যাব?"

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, "মিছি মিছি দোষ দেওয়া ওদের কেমন একটা রোগ হয়ে পড়েছে—।"

দুষ্টু একটু মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সুবিধা পাইয়া তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলিল, "তোমারও এ রোগটা একটু একটু আছে মেজকা,—এক্ষুনি বলছিলে, আমি পেরথোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেছি—।"

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি

সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। বই হারানো, কি ছেঁড়া, পেট কামড়ানো, মাথা ব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো যখন অনেক দিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন দুই এক দিনের জন্য নেহাত বাধ্য হইয়াই রাণু বই স্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোন কিছুর জন্য মনটা খিঁচ্‌ড়াইয়া থাকায় কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশী রকম সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে; তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস, কি আমার ধৈর্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরীক্ষা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন।

আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ—আম'র পাতা শেষ করিয়া 'অচল—অধম'র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া বসিয়া আছে। বই খুলিয়া আমার দিকে চায়—অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি, "আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হ'লেই যখন শ্বশুর বাড়ী চ'লে যাবে—মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ যত্ন-আত্তি করে কি না, সকালবেলা চা দিয়ে যায় কি না, নাইবার সময় তেল কাপড় গামছা দেয় কি না, হাত বুলিয়ে দেয় কি না—এসব কি ক'রে খোঁজ নেবে?"

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দশার কথা কল্পনা করিয়া একটু মৌন থাকে, কিন্তু বোধ হয় প্রথমভাগ-পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে, "আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয়ভাগ পড়লে হয় না? আমায় একটুও ব'লে দিতে হবে না। এই শোন না।—ঐ ক-য়ে য-ফলা—"

রাগিয়া বলি, "ওই ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ওইজন্যেই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়। সেদিন কত দূর হয়েছিল? 'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?"

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়, "হ্যাঁ।"

বলি, "পড় তা হ'লে একেবারে।"

'অচল' কথাটার উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহ, করুণা প্রভৃতি চিত্তপ্রবৃত্তিগুলো বাষ্প হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কি করিয়া? আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরৎ চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা।

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি, "ছাই হয়েছে। আচ্ছা, বল—অ—চ—আর ল—অচল।"

রাণু অ-র উপর হইতে আঙুলটা না সরাইয়াই তিনটি অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'ও ওই ভাবেই শেষ হয়, অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল।

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, "কোনটা অ?" রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া ল-এর উপর রাখে।

ধৈর্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি, "হুঁ, কোনটা ল হল তা হলে?"

আঙুলটা সট করিয়া চ-এর উপর সরিয়া যায়। ধৈর্যসাধনা তখনও চলিতে থাকে; শান্তকণ্ঠে বলি, "চমৎকার! আর চ?"

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর বলে, "চ? চ নেই মেজকা।"

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষাইয়া বলি, "তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে—রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন, আর এদিকে আড়াই বৎসরে প্রথম ভাগের আড়াইটে কথা শেষ করতে পারলে না। কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম, আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হল! কাজ নেই তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্যন্ত ব'সে ব'সে খালি অ-চ-আর ল-অচল অ-ধ-আর ম-অধম—এই আওড়াবি। তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।" বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিংবা বই লইয়া বসিয়া যাই, রাণু ক্রন্দনের সহিত স্বর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে, সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়িতে হইবে, কিন্তু চড়টা বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ওই পর্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না, বলি, "কি হল?"

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে, "নেই।"

"কি নেই?"—বলিয়া ফিরিয়া দেখি, চক্ষের জল 'অচল অধমে'র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথা দুইটা বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই-তিনখানা পাতার খানিকটা পর্যন্ত।

কিংবা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুইটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে, এইরূপ অবস্থাতে বলে, "আর দেখতে পাচ্ছি না, মেজকা!"

—এই রকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিওরিটা ফিরিয়া আসে; বলি, "না, তোর আর পড়াশুনা হল না রাণু; স্লেটটা নিয়ে আয় দিকিন্—দেগে দিই বুলো। পিঠটায় লেগেছে বেশি? দেখি?"

রাণু বুঝিতে পারে, তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে, "মেজকা!"

উত্তর দিই, "কি?"

"আমি, মেজকা, বড় হইনি?"

"তা তো খুব হয়েছো। কিন্তু কই, বড়র মতন—"

বাধা দিয়া বলে, "তা হলে স্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসব? চারটে উটপেন্সিল আছে আমার! স্লেটে খোকা বড় হয়ে লিখবে 'খর।" হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে, "ও মেজকা তোমার দুটো পাকা চুল গো! সর্বনাশ! বেছে দিই?"

বলি, "দাও। আচ্ছা রাণু, এই তো বুড়ো হ'তে চললাম, তুইও দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী চলবি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম, কি ক'রে খোঁজ নিবি? আমায় কেউ দেখে-শোনে কি না, রেঁধে-টেঁধে দেয় কিনা—"

রাণু বলে, "পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না, বড় হয়েছি কিনা। বাড়ির আর কোন্ লোকটা পেরথোম ভাগ পড়ে মেজকা, দেখাও তো।"

আমার দাদা আগে ধর্ম সম্বন্ধে খুব লিবারেল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাটা যেমন গভীর করিয়া রাখিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট এবং কবেকার জরাজীর্ণ জরুয়াস্ত্রিয়ানবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ ছিল। দরকার হইলে বাইবেল্ হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন্ তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একধার হইতে সমস্ত ধর্মমত সম্বন্ধে অধার্মিক ভাষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত, "হ্যাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্জে।"

দাদা বলিতেন, "না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নই।"

প্রায় সব ধর্মবাদকেই তিনি 'গোঁড়ামি' নামে অভিহিত করিতেন এবং গালা-

গাল না দেওয়াকে কহিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্য মানুষ। ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত বেশী কিছু খান বলিয়াই বোধ হয় না। পূজা পাঠ হোম লইয়াই আছেন এবং বাক্ ও কর্মে শুচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে, আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে, "ও রকম হবে, এ তো জানা কথাই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্তন ; এ একেবারে খাঁটি জিনিষ দাঁড়িয়েছে।"

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে—যে, এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দুধর্মের জন্য একটা বড় রকম ত্যাগস্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন এবং হাতের কাছে আর তেমন কিছু আপাতত না পাওয়ার ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোট কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন, "ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবছি,—ভাবছি বলি কেন, একরকম স্থিরই ক'রে ফেলেছি।"

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, "কি দাদা ?"

"গৌরীদান করব স্থির করেছি, তোমার রাণুর কত বয়স হ'ল ?"

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, "সে কি দাদা এ যুগে—"

দাদা সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "যুগের 'এ' আর 'সে' নেই শৈলেন, ওইখানেই তোমরা ভুল কর। কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা এবং যে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম সেই কালকে—

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম, "কিন্তু দাদা, ও যে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু।"

দাদা বলিলেন, "এবং শিশুই থাকবে ও, যতদিন তোমরা বিবাহবন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর ক'রে না দিচ্ছ। এটা তোমায় বোঝাতে হ'লে আগে আমাদের শাস্ত্রকাররা—" অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায়, তা তো বুঝতে পারি না! আমার কথা হচ্ছে—"

দাদা সেদিকে মন না দিয়ে নিরাশভাবে বলিলেন, "আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তাহলে আর কই হ'ল শৈলেন ? মনু বলেছেন, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষে তু-রোহিণী, জানি অতবড় পুণ্যকর্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে ? ছোটটার বয়স কত হ'ল ?"

রাণুর ছোট রেখা পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদানের জন্য কোন একটা পুণ্যফলের ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন, কিংবা অত পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম।

মনে মনে কহিলাম, "যাক, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।" দুই দিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন, "আমি ও সমস্যাটুকুর এক রকম সমাধান ক'রে ফেলেছি শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কি। ভেবে দেখলাম, যুগধর্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভাল বই কি—"

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত বলিলাম, "নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় বোল, সতেরো বছরে বিবাহ চলছে দাদা। এ সময় একটা কচি মেয়েকে— যার ন বছরও পুরো হয়নি—তা ভিন্ন খাটো গড়ন ব'লে—"

"ঝাঁটা মার তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে, যদি এই সময়ই রাণুর বিয়ে দিয়ে দিই, তা মন্দ কি? বেশ তো যুগধর্মটাও বজায় রইল, অথচ ওদিকে গৌরীদানেরও খুব কাছাকাছি রইল। ক্ষতি কি? এটা হবে যাকে বলতে পারা যায়, মডিফায়েড গৌরীদান আর কি।" আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কি করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়ের-ও মত আছে। তিনি অনেক ঘাঁটাঘাটি ক'রে দেখে বললেন, কলিতে এইটি-ই গৌরীদানের সম্যক্ ফলপ্রসূ হবে"

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, "পণ্ডিত মশায় তা হ'লে একটা নীচ মিথ্যা কথা আপনাকে বলেছেন দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হ'লে উনি এ কথাও বোধ হয় শাস্ত্র ঘেঁটেই বলে দেবেন যে, মেয়েকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন যে বিধানটি চাইবেন, পাকা ফলের মত টুপ করে হাতে এসে পড়বে।"

দুই জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা কহিলাম, "যাক, ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।" আসিবার সময়, ঘুরিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ বলে ভাবছি, মাস চারেক একটু

পশ্চিমে গিয়ে কাটাব, হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধ হয় বেরিয়ে পড়তে পারব।”—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস তিন-চার কোন রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান শুরু করিয়া দিলেন যে. আমায়ই হার মানিতে হইল। ধর্মের পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার ছিল না, তবুও নাতনীর মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওই দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। আমি বেখাপ্পা রকম একলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্ত বড ধর্মদ্রোহীর মত বিরাজ করিতে লাগিলাম।

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক, না পারুক—সে সমস্ত কাজেই আছে—এবং যেটা ঠিকমত পারে না, সেটার জন্য এমন একটা সঙ্কোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, যাহাতে সত্যই মনে হয়, নকলের মধ্য দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা বিশেষ পোষ্য ছিলই—, আজকাল আবার প্রথমভাগ বিবর্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুন একেবারে তাহার কোলের শিশুটি হইয়া পড়িয়াছে বলিলেই চলে।

সময় সময় গল্পও হয়; আজকাল বিবাহের গল্পটা হয় বেশী। অন্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে, কিন্তু আমার কাছে কোন দ্বিধা—কুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না; তাহার কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলীর আলোচনা চলিতে থাকে। বলি, “তা না হয় রাণু, তুমি মাসে দুবার ক'রে শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গেলে। আর সবই করলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কি বন্দোবস্ত করছ?”

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে; বলে, “আমরা সবাই ব'লে ব'লে তো হয়রান হয়ে গেলাম মেজকা যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমার চিরদিনটা দেখতে শুনতে পারবে মেজকা? এরপর তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?”

তোতাপাখীর মত, কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করিতে পারি না; বলি, “আচ্ছা, একটা গিন্নীবান্নী কনে দেখে এখনও বিয়ে করলে চলে না? কি বল তুমি?”

এই বাঁধা কথাটি তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ী লইয়া একটি ঠাট্টার উপক্রমণিকা। রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে, "যাও মেজকা আর গল্প করব না; তুমি ঠাট্টা করছ।"

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্যের সহিত বলি, "মোটেই ঠাট্টা নয় রাণু; তোমার শাশুড়ীটি বড্ড গিন্নী শুনেছি, তাই বলছিলাম, যদি বিয়েই করতে হয়—" রাণু আমার মুখের দিকে রাগ করিয়া চায় এবং শেষে হাসিয়া চায়। কিছুতেই যখন আমার মুখের অচল গাম্ভীর্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া গুরুত্বের সহিত বলে, "আচ্ছা, আমি তা হলে—না মেজকা, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, যাও—" আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি, "একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে রাণু; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা চলে মা?"

রাণু তখন ভারিক্কে হইয়া বলে, "আচ্ছা তা হ'লে আমার শাশুড়ীকে একবার ব'লে দেখব'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে করতে রাজী হন তো তোমায় জানাব'খন; তার জন্যে ভাবতে হবে না।" তাহার পর কৌতুক-দীপ্ত চোখে চাহিয়া ব'লে, "আচ্ছা মেজকা, পেরথোম ভাগ তো শিখিনি এখনও —কি ক'রে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব হ্যাঁ—"

আমি নানান রকম আন্দাজ করি; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে, "না হ'ল না—কখনও বলতে পারবে না, সে বড্ড শক্ত কথা।"

এই সব হাসি তামাসা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানেই শেষ হইয়া যায়; রাণু চঞ্চলতার মাঝে হাঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে, "যাক, সে পরের কথা পরে হবে, যাই. তোমার চা হ'ল কিনা দেখিগে।" কিংবা—"যাই, গল্প করলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে, একড়াই ধুলো রয়েছে—" ইত্যাদি।

এইরকম ভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝি বা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে, বুঝিতে পারে না, কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনেই স্লেট ও প্রথম ভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝিতে পারি, এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ; কেন না, প্রথম ভাগ শেখার আর কোন উদ্দেশ্য থাক আর না থাক ইহার উপরেই ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ-সুবিধা নির্ভর করিতেছে—রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই

বলিয়া তাহার শিশু-মনটি ব্যথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মত আমায় তবুও আশ্বাস দেয়, "তুমি ভেবো না মেজকা, তোমার পেরথম ভাগ না শেষ ক'রে আমি কক্‌খন-ও শ্বশুর বাড়ী যাব না। নাও, বলে দাও।"

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব কি, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া উঠে। ওদিকে আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের সমারোহ আয়োজন। বাড়ির বাতাসে আমার হাঁফ ধরিয়া উঠে। এক-একদিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি, "আমাদের কোন্ দোষে তুই এত শিগগির পর হতে চললি রাণু?"

অবশেষে একদিন সানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাণু কুণ্ঠিত আনন্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি রকম হইয়া গিয়া মুখটা নীচু করিল; বোধ করি, তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ-বাড়ী সে-বাড়ী করিয়া বেড়াইয়াছি। বিদায়ের সময়ে বরবধূকে আশীর্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার পরা, মালাচন্দনে চর্চিত রাণুকে দেখিয়া আমার তপ্ত চক্ষু দুইটি জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ও যে বড্ড কচি, এত সকালে কি করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ও কি জানে, আজ কতই পর করিয়া ওঁকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিটিকে আশীর্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—?" আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছে এতক্ষণ, কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয় এই যে, সংসারের প্রবেশপথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা সরিয়া গিয়া ওর মধ্যকার শিশু বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায় আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনও কচি মেয়ের মত ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলাঘরের মা হইয়া ওই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে, আশ্বাস দিয়াছে; সেইটাই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল মানাইত। আজ

প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম—যেমন দুধের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে—বুঝাইয়া, মিথ্যা কহিয়া, কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে থামিল। অভ্যাসমত আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছাইয়া লইল; তাহার পর হাতটাকে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এদিকে এস, শোন মেজকা।"

দুইজনে একটু সরিয়া গেলাম। সকলে এই অসম মাতাপুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রু-সিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, "সেরখোম ভাগগুলো হারাই-নি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।"

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিয়া, আবার বলিল "সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খুব লক্ষ্মী হয়ে প'ড়ে প'ড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।"

দাঁতের আলো

আমার ভাইঝি মৈয়ার সম্প্রতি তিনটি দাঁত উঠিয়াছে তাহাতেই তাহার নাকি মাটিতে পা পড়ে না। অবশ্য ঝিয়ের কোলে কোলেই কাটে, পা পড়িবার বয়স হয় নাই; তবে যাহারা বোঝে, তাহারা বলে, যদি বয়স হইত মাটিতে পা পড়িত না এমনই দেমাক।

আমার সঙ্গে মা ছেলের সম্বন্ধ, ডাকি 'মৈয়া'। কথাটা 'মা'র মত কোমল-ও নয় সরসও নয়। এ প্রান্তে ছোট ছোট পশ্চিমা শিশুরা 'মৈয়া গে' বলিয়া আবদার ধরে। ও হইয়া অবধি কি জাদুবলে আমার বয়সের গোটা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর ছাঁটিয়া দিয়া আমায় এই সব শিশুদের সামিল করিয়া দিয়াছে। আপিসে ইয়া ইয়া জোয়ানদের উপর হুকুম চালাইয়া আপিস কাঁপাইয়া সন্ত্রস্ত করিয়া বাড়ির

চৌকাট না ডিঙাইতে ডিঙাইতে আমি বদলাইয়া যাই। হাঁকি "মৈয়া, ভুখ লেগেছে বড্ড—"

আমার বিশ্বাস মৈয়া যে একজন মা, তাহা ওর বেশ স্পষ্টভাবে জানা আছে। ঝিয়ের কালো কুষ্টি কোলের মধ্যে ব্যস্ত হইয়া উঠে, রাখা দায়; ফুটফুটে হাত পা, টুকটুকে মুখখানি চঞ্চল হইয়া উঠে, পঙ্কিল জলে বায়ুচালিত পদ্মফুলের মত। মৈয়ার ছেলে আসিয়াছে, তাহার ভুখ লাগিয়াছে, স্তন্য দিতে হইবে, আব কি সে থাকিতে পারে?

বলি, "কোলে নাও মৈয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে কোলে লয়, বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবালের মত রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে সেই তিনটি দাঁতের বিকাশ।

প্রশ্ন হইতে পারে, তিনটি দাঁত এমন কি ব্যাপাব, যাহার জন্য এত?

বিজ্ঞমাত্রেই ওই কথাই বলিবে। উদাহরণস্বরূপ ওর বড বোন রাণুর কথাই বলি। বলে, "হ্যাঁ, বুঝতাম হাতী হয়েছে, ঘোড়া হয়েছে, মোটব কার হয়েছে, দেমাকও হয়েছে। তিনটি দাঁত এমন কি সম্পত্তি মেজকা, যে মৈয়ার তোমার ঠ্যাকার রাখতে জায়গা নেই? আমি তো বুঝি না বাপু।" বলি, "একেবারে ঠ্যাকার হয়ে গেল রাণু?"

"হ্যাঁ, ঠ্যাকার বইকি। তোমার মৈয়াকে নিয়ে কিছু বললেই তোমার লাগে, কিন্তু দাঁত হয়ে পর্য্যন্ত যা সব কাণ্ড, তা দেখে ঠ্যাকাব বলব না তো বলব কি? উনি আজ কাল দুধ খাবেন না। দুধ খেতে যাব কেন? ওতে কি দাঁতের দরকার হয়? আমি খাব কয়লা, চায়ের কাপ, খোলামকুচি, দাদুর খড়ম, কুটকুট করে শব্দ হবে, লোকে বলবে, হ্যাঁ ছবুরাণীর দাঁত হয়েছে। অথচ পুঁজি তো সবে, তিনটি। আর গজর গজর করে বকেই বা কেন এত? বড যে মৈয়াকে তোমরা চেনো, অত বকবার মতলবটা কি বল দিকিনি?"

রাণুকে এই তালে শিশুতত্ত্ব শিখাইবার লোভটা সংবরণ করিতে পারি না, বলি, "ওটা আপনা আপনিই হয় রাণু,—বকবার জন্য ওকে বড একটা চেষ্টা করতে হয় না। ইংরেজীতে একে অটোমেটিক অ্যাক্‌শন্ বলে, আর একটু বড় হলে তোমায় এসব বুঝিয়ে দোব'খন। ওর দ্বারা ওদের জিবের একসারসাইজ হয়, তারপর ক্রমে"—

রাণু হাসিয়া বলে, "তুমি কিছুই ধরতে পারনি মেজকা। তোমরা মায়ে পোয়ে [illegible] এক রকম, কি যে কতকগুলো আউড়ে গেলে। ছবিরাণীর কথায় আবার

ইংরিজী এল কোত্থেকে বুঝতে পারি না। না জান তো আমার কাছে শোন। বকে, কি না দাঁত তিনটি ঝিকমিক করবে; না হলে কথার মাথা নেই মুণ্ডু নেই অত আবোল তাবোল বকতে যাবে কেন বল তো?" আমি অজ্ঞতার নীরব হাসি হাসিয়া কথাটা মানিয়া লই।

প্রকৃত তত্ত্বটা বুঝিতে পারিতেছি দেখিয়া রাণু আবার প্রশ্ন করে, "দাঁতে দাঁত দিয়ে এক একবাব ঘষে কেন বলতে পারো, কুর-র-কুর-র করে শব্দ করে?" বলি, "তিনটি দাঁত ঝিকমিক করবে বলে।"

রাণু ধমক দিয়া উঠে, "বাস এইবার ওই এক কথাই চলবে, ঝিকমিক করবে বলে, ওর দাঁতের যেন আর অন্য কাজ নেই। দাঁত ঘষবার আর কোন হেতু নেই, শুধু কখন্ কষ্ট করে কামড় দিতে হবে, তার জন্য ঘষেমেজে তোয়ের করে রাখছে, ওকে তুমি কম মানুষটি মনে কর নাকি?"

"একবার যদি বাগিয়ে ধরতে পারলে তো তিনটি ছাপ না দিয়ে ছাড়বে না। আমি বাপে মুখে হাত দিতে রাজি আছি কিন্তু ও মেয়ের কাছ থেকে একেবারে সাত হাত তফাতে থাকব, এই বলে দিলাম তোমায়।'

সাত হাতের প্রতিজ্ঞা সাত মিনিটও টিকে না। হাসিতে মুক্তাবৃষ্টি করিতে করিতে মৈয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই ঝিয়ের কোল, সেই রাঙা ঠোঁটে বাঁধানো তিনটি দাঁত কিন্তু এত পরিচয়েও এতটুকু পুরানো নয়।

রাণু গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, ঝিয়েব কোল হইতে যেন ডাকাতি করিয়া কাড়িয়া লয়। হাসিতে গৌববে একশা হইয়া বলে, "দেখ মেজকা দেখ কি চমৎকার মানায় হাসলে।"

ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বলি, "হাত দিও না, দেবে এক্ষুনি কামড়ে রক্তপাত করে।"

"হ্যাঁ তোমার যেমন কথা, ছবুরানী আবার নাকি কামড়ায়। ক্ষীরে ঠেকলে দাঁতগুলো ভেঙে যাবে, এত নরম। তোমরা সবাই আমার ছবুরানীর একটা বদনাম তুলে দিয়েছ, এতে যে তোমরা কি সুখ পাও। কি ছেলে তোমার ছবিরানী, শুধু মায়ের নিন্দে, কি ছেলে তোমার?"

রাণু শেষের কথাগুলা মাথার একটা ঝাঁকানির সঙ্গে কপট গাম্ভীর্যে ও হাসিতে মিলাইয়া এমনভাবে বলে যে, মৈয়া হঠাৎ হাসিতে একেবারে কুটিকুটি হইয়া পড়ে। তিনটি দাঁতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতে থাকে, কচি শরীরের কূল ছাপাইয়া লহর উঠে। থামিবার অবসর পায় না, থামিলেই রাণু সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিয়া দেয়, হাসির স্রোত দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া যেন চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে।

বাড়ির নবীনতম সংবাদ—কাল বাবুলবাবুর শুভাগমন হইয়াছে, জন্মস্থান পুর্ণিয়া, বয়স ছয় মাস।

মানুষটি গম্ভীর প্রকৃতির। কপালটি প্রশস্ত হওয়ায় এবং মাথায় চুলের ভাগ অল্প হওয়ায় ভাবটি যেন একটু মুরুব্বি গোছের। আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, পাতলা ঠোঁট দুইটি চাপিয়া শান্তভাবে সংসারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন এবং রহিয়া রহিয়া অনেকক্ষণ পরে, সমস্ত শরীরটি দোলাইয়া এক একবার উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠেন; দেখিলে মনে হয়, হঠাৎ যেন জগৎ-বিধানের কোনো গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

সিমলায় বাণিজ্য-বৈঠকে জাপানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কি রফা হইল দেখিতেছিলাম, রাণু আসিয়া একটি গুরুতর সমস্যা হাজির করিল। বলিল, "আচ্ছা মেজকা, আমরা বড়রা ভাবি, কচি ছেলেমেয়েরা সুন্দর হয় ভাল চুল হলে, ভাল চোখ হলে, মোটা-সোঁটা নাদুস-নুদুস হলে, এই তো? কিন্তু ওরা নিজেরা কি ভাবে বল তো?"

এই রকম কোনো প্রশ্ন উপস্থিত করিলে আমি রাণুর কাছে একটু ভয়ে ভয়েই উত্তর দিই; কারণ, ও যেমন এক দিকে শিশুদেরও শিশু বলিয়া জানে, অপর দিকে আমাকেও একটি শিশুবিশেষ বলিয়া ধরিয়া লয়। তবুও বলিলাম, "ওদের সুন্দর কুৎসিত সম্বন্ধে কি কোনো ধারণা আছে রাণু? ও ধারণাটা জন্মাতে অনেক দেরি লাগে, বিশেষ করে নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে। সর্বপ্রথমে ওদের জ্ঞান হয় খাওয়া নিয়ে। তোমায় একদিন বুঝিয়ে দোব যে, সেটা আসলে আত্মরক্ষা অর্থাৎ নিজেকে বাঁচাবার যে ইচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে—"

রাণু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল "তুমি যখন ওই রকম করে কি সব বলে যাও, আমার এত মিষ্টি লাগে মেজকা; ফুরসত থাকলে বসে বসে শুনতে ইচ্ছে করে। ছেলেরা নিজেদের কিছু জানে না, যত জান তুমি। কোন্ দিন বলে বসবে ওই চিলটা যে উড়ে যাচ্ছে, তা ও নিজে জানে না।

"ওমা! শঙ্খচিল! প্রণাম কর মেজকা, মাথায় বুদ্ধি দেন। ওমা! শঙ্খচিলকে বুঝি ওই রকম করে প্রণাম করে? হাত দুটো একত্তর করে এই রকম শাঁখের মত কর। হয়নি ও। হ্যাঁ এইবার হয়েছে। অথচ বলবেন, ওঁর মতন কেউ কিচ্ছু জানে না। হ্যাঁ কি যে বলছিলাম, আমরা ভাবি চোখে চুলে রঙে ছেলেরা সুন্দর হয়। ওরা কিন্তু ভাবে দাঁত যদি না রইল তো কিছুই নয়। হ্যাঁ মেজকা ঠিক। আমি ভেবে সারা বাবুল সর্বদা অমন ঠোঁট বুজে থাকে কেন, একটা

ফিক করে হাসলে কখনও যদি, অমনই টপ করে ঠোঁট বুজে ফেললে। কোনো হদিস পাই না। তার পরে বুঝতে পারলাম আহা, বেচারীর একটি মাঝের দাঁত বলে এত লজ্জা গো, আহা! তার ওপর দাদু যখন একদন্ত হেরম্ব লম্বোদর গজানন বলে ঠাট্টা করেন—ও বেচারীর মনে হয় মা পৃথিবী দ্বিধে হও, আর কত সইতে হবে! আহা, না বিশ্বাস হয় এই দেখ।"

ছুটিয়া গিয়া বাবুলকে লইয়া আসে আদর করিতে করিতে এবং আদরের অধিক আশ্বাস দিতে দিতে বলে "না জাদু, তোমায় কেউ ঠাট্টা করতে পারবে না। বল তুমি, আমার সোনার মত একটি দাঁত কার আছে গো?" কাছে আসিয়া বলে, "দেখি কেমন দাঁত, হাঁ কর তো। জাদু আমার বড লক্ষ্মী ছেলে গো, বাবুলের মত লক্ষ্মী ছেলে—কর তো হাঁ।"

বাবুল অল্প একটু হাসির সহিত মুখটা গোঁজ করিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরে, কোনো মতেই ঠোঁট খুলিবে না। একটা খেলা চলিতে থাকে, রাণু গাল দুইটি টিপিয়' ধ.. আঙুলেব মধ্যে ঠোঁট দুইটি জোড়া করিয়া ধরে, চুমা খায়, শেষে কৃত্রিম রোষে ধমক দেয় পযন্ত, অবশেষে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে আমার দিকে চাহিয়া বলে, "দেখলে তো? একটা গোটা রাজ্যি দিলেও হাঁ করবে না। আর তাও বলি মেজকা দোষই বা দোব কি করে? কেউ কি নিজের খুঁত নিজে দেখতে চায় মেজক', তুমিই বল?"

বাবুলকে বুকে চাপিয়া দোল দেয় খানিকটা, তাবপর বলে, "ওদিকে তোমার মৈয়ার গুমর তিনটি দাঁত, আব এদিকে বাবুলবাবুর লজ্জা একটি দাঁত নিয়ে; তাহলে আর কি সন্দেহ বইল মেজকা যে কচি ছেলেরা—নিশ্চয় ভা া দাঁত নিয়েই তাদের যা কিছু বাহার?"

হাতে আপাতত একটা দরকারী কাজ ছিল, অব্যাহতি পাইবার জন্য হাসিয়া বলিলাম, "না, আর মোটেই সন্দেহ রইল না।"

অভিমতটা যে রহস্যমাত্র রাণুর মত মেয়ে তাহা না বুঝিয়াই পারে না; মুখটা একটু ভার করিয়া কহিল, 'বেশ, কর না বিশ্বাস, নিজেই সব জান যখন—"

বাবুলকে লইয়া চলিয়া গেল। জানি ও হারিবার পাত্রী নয়। এর পরে আরও গুরুতর প্রমাণ লইয়া হাজির হইবে, তখন ধীরে সুস্থে বিশ্বাস করিয়া ওর থিওরিটা মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট করা ..হইবে। কাজের তাগিদে সে-সময়টা অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছিল।

দিন দশেক হইল কর্মস্থানে আসিয়াছি। যতক্ষণ কাজের ভিড়ে থাকি, এক রকম কাটিয়া যায়। তাহার পর নিষ্কর্মতার সুপ্রচুর অবসরের মধ্যে মনটা যেন হাঁপাইয়া উঠে, দূরত্বের সমস্ত ব্যবধান ডিঙাইয়া বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে স্মৃতিবিস্মৃতির আলোছায়ায় ব্যাকুল অনুসন্ধান চলিতে থাকে। উঠানের মাঝখানে যেন কোথা হইতে অনেকক্ষণ পরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ডাকিলাম "মৈয়া কোথায় গা?"

ঘরের ছায়ার মধ্যে যেন খানিকটা আলো ফুটিয়া উঠে। মৈয়াকে কোলে লইয়া মুখে মুখ চাপিয়া রাণু বাহির হইল, "ও ছবু তোমার ছেলে ডেকে ডেকে খুন হল আর তুমি কিনা দিব্যি, এ কেমনতর মা বাপু।

বিদ্যুৎরেখার মত মৈয়া কোলে ঝাঁকিয়া পড়ে, ও আর থাকিবে না, কতক্ষণ পরে ছেলে আসিয়াছে।—দৃশ্যটা মিলাইয়া যায়। স্মৃতিমঞ্চে বাবুলের আবির্ভাব। গম্ভীর নতদৃষ্টি; নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভক্ষণ করিতে হইলে মাথাটা নামাইয়া আনা দরকার, কি পা-টা তুলিয়া ধরা দরকার, সে সমস্যা মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। উভয় রকম পরীক্ষাই চলিতেছে।…মৈয়া আমার কোল হইতে ঝিয়ের কোলে যাইবে না, এক-একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখে আর প্রবল আপত্তিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরে! হঠাৎ সব মিলাইয়া যায়, যতই বেশী চেষ্টা করি, ততই বাসার সামনের তালগাছ দুইটার নির্মম রুক্ষতা স্পষ্ট হইয়া উঠে, কোন পথে যে মনটা বাড়ি গিয়া উঠিয়াছিল, কোনোমতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ি হইতে চিঠি আসিয়াছে, প্রয়োজনীয় খবর এক একটি করিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু নবপ্রবাসীর মন যে সব অপ্রয়োজনীয় খবরের জন্য বেশী কাতর তাহার বিন্দুবিসর্গেরও উল্লেখ নাই।

কয়েকদিন এই ভাবেই কাটিল। মনটা নিজের নির্জীবতায় ক্রমেই ভারি হইয়া কর্মের স্রোতে তলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময়, একদিন ডাকপিওন আপিসের চিঠি আর তিনখানা আমার নিজের চিঠি দিয়া একটা আকণ্ঠ ঢাকা সবুজ লেফাফা বাহির করিল। বলিল, "দেখুন তো বাবু এটা কি আপনার চিঠি? একেবারে আণ্ডার-পেড, না আছে পুরো ঠিকানা না আছে কিছু। শুধু বাংলা অক্ষর দেখে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এখানে বাঙালী তো এক আপনিই আছেন, দেখি জিজ্ঞেস করে।"

প্রথমটা লইতে চাহিলাম না। ডাক বিভাগের দয়ায় এক আনার কনসেশন টিকিট হওয়া পর্যন্ত রোজই পড়ে তিন চারটা করিয়া পয়সা দণ্ড দিতে হইতেছে। একটা খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অন্যমনস্কভাবেই বলিলাম, "না, ফেরত দাও।"

পিওন একটু দূরে গেলে কেমন একটা কৌতূহল হইল। ঠিকানা নাই, কিছু নাই এ আবার কেমনধারা চিঠি। একবার দেখিতে হয় তো! ডাক দিয়া ফিরাইলাম। ঠিকানাটা পড়িয়া হাসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আমার চিঠিই বটে।" পকেট হইতে আড়াই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। রাণুর চিঠি। ঠিকানার মধ্যে শুদ্ধ ছোট বড অক্ষরে 'মেজকাকা'; আর রাণুর নিজের ব্যাকরণের পদ্ধতিতে গ্রামের নামটা। শহর পোস্ট আপিসের কোনো বাঙালী কেরানী সেটাকে লাল কালিতে ইংরেজীতে লিখিয়া দিয়াছে। গ্রাম আর পোস্ট আপিস একই হওয়ায় চিঠিটা আসিয়া নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে।

অন্য পত্র ছাড়িয়া আগ্রহের সহিত রাণুর পত্রই আগে খুলিয়া ফেলিলাম। হাতের লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া, বড বড রুল টানা চারখানা পাতায় ঠাসা লেখা একখানি বৃহৎ লিপি। যথাযথ তুলিয়া দিলে সকলের বোধগম্য হইবে না বলিয়া বানান প্রভৃতি একটু আধটু পরিবর্তিত করিয়া দিলাম—

"মেজকা, তোমার আর সব ভাল, কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর না—ওই এক কেমন রোগ। কচি ছেলেরা যদি দাঁত সব্বার চেয়ে ভাল না ভাববে তো ছবুরানী অমন করে কথায় কথায় হাসতে যাবে কেন, আর, বাবুলই বা মুখটি বুজে থাকবে কেন? বেশ আমার কথাটা না হয় মিথ্যে, কিন্তু সেদিন যে কাণ্ডটা হল, তা কিসের জন্য বলতো? দাদু বাইরে যান নি, সমস্ত দিন বেচারীকে ক্ষেপিয়েছেন 'একদন্ত গজানন' 'একদন্ত গজানন' বলে। সমস্ত দিন মুখটি চুন, কিছু খাবে না, শুধু বায়না আর বায়না। সন্ধ্যের পরে কাকীমা বললেন, "বড্ড গরমে ছেলেগুলো সেদ্ধ হচ্ছে রাণু, চল্ ছাতে নিয়ে যাই।" কাকীমা, আমি ছবি, ছোটকাকা আর বাবুল। জোছনা ফুটফুট করছে আর তেমনই হাওয়া। আমি বললুম মিথ্যে বলনি কাকীমা। তোমার মেয়া তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ল। উনি একটু আবার আয়েসী কিনা।

"মাদুরে শুইয়ে দিলাম। কি যে সুন্দর দেখাচ্ছিল, তা যদি দেখতে মেজকা। মুখটি একটু ফাঁক হয়ে গেছে। চাঁদের চেয়েও সাদা তিনটি দাঁত। বলে, চাঁদ ফেলে আমায় দেখ। ছোটকাকা বললে চল বউদি, আলসের ওপর বসি খুব হাওয়া লাগবে, অত চেপে মারা পর্দা মানি না। বাবুলকে ছবুরাণুর কাছে ঝুমঝুমিটা দিয়ে বসিয়ে ওদিকে আলসের ওপর উঠে বসলাম। বসবে কি লোকে ছাই, তার কি জো আছে? ছেলে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে সবাই দেখি চোরের তিনটি আঙুল জাঁতিকলে আটকে রয়েছে। দাঁত যে উপড়ে ফেলা

যায় না, সে আরও ছেলেমানুষ কি করে জানবে বল? ভাবলে দাঁতের গেরস্ত ঘুমচ্ছে, এই ফাঁকতালে একটা চুরি করে নিই। আমার তা হলে ছুটি হবে দিব্যিটি। শয়তানিটা বোঝ একবার। এদিকে গেরস্ত ছবিরানী যে কি হুঁশিয়ার মেয়ে তা তো আর জানেন না বাবু। না বিশ্বাস হয়, দাদুকে জিজ্ঞেস করে পাঠিও। তিনিই তো বললেন, এ ডাহা চুরির চেষ্টা।

"আহা মেজকাকা, লজ্জানিবারণ হরি সত্যি সব দেখতে পান। বললেন, 'হ্যাঁ, তোর দাঁতের জন্য এত হেনস্তা? রোস্।' তার পরদিন বাবুলের জ্বর পেটের অসুখ, ছেলে যেন নেতিয়ে পড়ল। বললে পেত্যয় যাবে না, তার পরের পরদিন নীচে একটি দাঁত! আমিই প্রথমে দেখে সবাইকে বললাম। বাবুল আর সে বাবুল নেই মেজকাকা। কথায় কথায় হাসি, আর কি দুরন্ত। ছবুরানীর মত আর একটি দাঁত হলে ও যে কি করবে ভেবে পাই না। পাঁচটি কচি দাঁতের হাসিতে বাড়ি একেবারে আলো করে রেখেছে মেজকাকা। কি যে চমৎকার, না দেখলে পেত্যয় যাবে না। তুমি শিগগির একবার ছুটি নিয়ে এস। নায়েবকে সব কথা খুলে বললেই ছুটি দিয়ে দেবে। তাদেরও কচি ছেলে আছে তো, আর তাদের তো এই রকম একটি দুটি করে দাঁত ওঠে।"

আজ উনিশ দিন ধরিয়া এই চিঠিরই প্রতীক্ষা করিয়াছি। এর অযথা কাকলি আমায় এক মুহূর্তেই আবার বাড়িতে আমার নিজের জায়গাটিতে লইয়া গিয়া দাঁড করাইল; যেখানে গম্ভীর সাংসারিকতার বাহিরে মৈয়া, বাবুল, রাণু আর ওদের দলের যত সব অকেজোরা দিবারাত্র তাহাদের অর্থহীন খেয়াল-খুশির স্রোত বহাইয়া চলিয়াছে।

মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক পড়িয়া রহিল। সেগুলো সহকারীর ওখানে পাঠাইয়া দিতে হইবে, আপাতত সাহেবের নিকট দুইটা দিনের ছুটি লইতে হয়। শেফালি-স্তবকের মত রাঙায় সাদায় আলো করা দুইটি কচি মুখের হাসি আমায় প্রবল আকর্ষণে টানিতেছে।

বাদল

চাণক্য যখন লেখেন, 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ', সে সময় নিশ্চয় আমাদের বাদলের মতো ছেলে জন্মগ্রহণ করিত না। ওই একফোঁটা ছেলে, সবে

বোধ হয় দুইটা বৎসর পুরা হইয়াছে, অথচ বাড়িসুদ্ধ এতগুলো লোক ওর পিছনে হিমসিম খাইয়া যাইতেছি! ওর ঠাকুরমার কাছে ওর সাতখুন মাপ, এমনকি প্রতিদিন সত্য সত্য সাতটি করিয়া খুন করিলেও। কিন্তু তাঁহার মুখেও কখনো কখনো শোনা যায়, "না, আমাদের কম্ম নয়; আমরা হার মানলাম বাপু, ও ছেলেকে শাসনে রাখবার জন্য একটা লেঠেড়া রাখতে হবে।"

অর্থাৎ লালনের ব্যবস্থাটা বাদলের সম্বন্ধে ক্রমেই অচল হইয়া উঠিতেছে। তবে লেঠেড়াতেও যে তাহাকে বেশ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, তাহার দৌরাত্ম্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং তাহার মা প্রভৃতি দুই একজন বড়দের মধ্যেও গোটাকতক অ্যামেচার লেঠেড়া গড়িয়াই উঠিয়াছে; কিন্তু বাদল তো এখন ঠিক যে বাদল সেই বাদল।

আমি তো "তোর যা ইচ্ছে কর্ বাপু," বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, এক রকম নিরাশ হইয়াই; কারণ ছোট ছেলেদের, দেশের ভবিষ্যৎ আশাদের, শরীর এবং মনের তত্ত্ব—এবং এই দুইটিকে উৎকর্ষিত করিবার উপায় সম্বন্ধে মোটা মোট দামী ফরাসী, জার্মান, ইংরাজী প্রভৃতি বই হইতে এত পরিশ্রমে যে জ্ঞান এবং ধারণা আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা বিলকুল ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার অত টাকার পাঁচখানা অতিকায় বইয়ের কোনো পাতাতেই বাদলের কোন অংশ ধরা পড়ে না। কেতাব লেখকের পাকা ঝুনো মাথায় সে সবের ধারণাও কস্মিন-কালে আসিতে পারে না, এমন সব নিত্যনূতন অনাসৃষ্টির মতলব এই একরত্তি ছেলেটির মাথায় ঠাসা। এই চরিতাখ্যানের আদ্যোপান্ত পড়িলে বুঝা যাইবে যে, চেষ্টার আমি কসুর করি নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছি, এ ছেলেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা খালি পয়সার শ্রাদ্ধ, সময় আর উৎসাহের অপব্যয়।

তবে ইহার মধ্যে বাড়ির লোকেদের বেশ একটু দোষ আছে। প্রথমত মা। তাঁহার একটা গুমর, ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে কোনো বেটাছেলে কিছু বোঝে না, জোর করিয়া বলেন, "একেবারে কিছু নয়, আমার কাছে লিখিয়ে নাও এ কথা।" আমাদের সম্বন্ধে এ রকম হীন ধারণায় রাগ হয়, বলি, "তুমি কি বলতে চাও মা, এই দামী দামী বইগুলো সবাই খাতিরে পড়ে কিনছে? এতে ছেলেদের—"

"দুধ জ্বাল হতে পারে পুড়িয়ে। থাম্, আর বকিসনি বাপু।" এর পর আর বকিতে ইচ্ছাও হয় না।

কিন্তু ইহাতেও তেমন কিছু ক্ষতি নাই। ক্ষতি হইতেছে এইখানে যে, বিশেষ করিয়া বাদলের সম্বন্ধে আবার দুনিয়ার মেয়েপুরুষ কেহই কিছুই বুঝে না, এক

তিনি ছাড়া—কি করিয়া এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ও এক মহাপুরুষ হইবে, ব্যাস্ ওর সাজা নাই, বকুনি নাই, এমন কি ওর দুষ্টামিতে বাধা দেওয়ারও হুকুম নাই বলিলে চলে। অত্যাচারের আতিশয্যে এক-একবার যে রাগ দেখান, সেটা একেবারে মৌখিক, আদরেরই রূপান্তর। সে দিন শিশুদের অনুকরণ-প্রিয়তা ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ পড়িতেছি, হঠাৎ ছেলেমেয়েদের পড়িবার ঘরে হাসি কান্নার একটা মস্ত হট্টগোল উঠিল। একটু পরে বাম হাতে দক্ষিণ হাতটা ধরিয়া রাণু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। দেখি, কব্জির উপর স্পষ্ট চারিটি দাঁতের দাগ, লাল হইয়া উঠিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে করেছে?"

"বাদল, রাক্ষস ছেলে।"

"হু", তা বুঝেছি। কোথায় সে চল দেখি।"

ঘরে গিয়া তদন্তে জানা গেল, গৃহশিক্ষক জগন্নাথবাবু যাওয়ামাত্র বাদল আসিয়া তাঁহার আসনটি অধিকার করিয়া বসে এবং শিক্ষকতার বাজে অংশগুলিতে সময় অপব্যয় না করিয়া একেবারে সার অংশ লগুড চালনায় লাগিয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা জাজিয়া পরা এই কচি মাস্টারের অভিনব মাস্টারি খানিকটা আমোদচ্ছলে উপভোগ করিল; কিন্তু তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানের চোটে আমোদের ভাগটা ক্রমেই সাংঘাতিক রকম কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন রাণু লগুডটি কাড়িয়া লয়, তাহার পর এই কাণ্ড।

বাদল একপাশে দাঁড়াইয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপ্রতিভভাবে সমস্ত শুনিতেছিল! হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া গটগট করিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখটা তুলিয়া বলিল, "কাকা হাম হাম।"

রাণু বলিল, "অমনই ছেলে ঘুষ দিতে এলেন, ভারি চালাকি।" ঘুষ লইবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। বাদলের হাতটা ধরিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া একটু রাগতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে একে ওদের পড়বার ঘরে যেতে দিয়েছিল, আমি না পইপই করে বারণ করে আসছি?" মা বললেন, "যেতে আর দেবে কে? ও কি কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে নাকি? তোমাদের এক অদ্ভুত ছেলে হয়েছে। রাজার রেয়ৎ নয়, মহাজনের খাতক নয়, মনে হল ভেতরে রইল মনে হল বাইরে টহল দিতে গেল; কে ওকে রুখছে বল।"

বলিলাম, "না, দিনকতক একটু সজাগ থাকতেই হবে মা; দরকার হয়, ওর মায় সংসারের পাট করা একেবারে বন্ধ করে দাও দিনকতকের জন্যে। তোমরা

বোঝ না. এটা ওদের নকল করবার বয়স কিনা, যত সৎ জিনিসের নকল করতে শিখবে ততই মঙ্গল। এখন যদি বাইরে গিয়ে জগন্নাথবাবুর হুঙ্কার, বেত আছড়ানি কিংবা ঠাকুর আর চাকরের নিত্য ঘুষোঘুষির নকল করতে যায় তো ও একটি আস্ত খুনে হয়ে উঠবে, এই বলে দিলাম। এখন ওদের মনটা—" মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, জানি, আমার কোনো কথাই তোমাদের পছন্দ হয় না।' কিন্তু এ তো আমার নিজের মনগড়া কথা নয়। এ যে ফরাসী লেখকের বই থেকে তুলে বলছি, সে যে-সে লোক নয়; বইটার এর মধ্যে সাত-সাতটা সংস্করণ—"

মা যেন উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ তুই থাম দিকিন বাপু; কচি ছেলে নকল করতে শেখে এ কথা জানবার জন্যে নাকি আমার ফারসী আরবী বই ওল-টাতে হবে, গেলাম আর কি? এই নকলের চোটেই তো গেরস্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, কিন্তু করা যায় কি। এই তো এক্ষুনি মায়ের ঘরে কীর্তি করে এল। ঘরের মেঝেয় এক বাটি দুধ আর একটা ঝিনুক রেখে বেচারী কি কাজে একটু এদিকে এসেছে। আর আছে কোথায়। লুসীর কোল থেকে তার ছানাটা টেনে নিয়ে গিয়ে, থেবড়ে বসে, সেটাকে চিৎ করে কোলে ফেলে, মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরে দুধ খাওয়ানোর সে ধুম দেখে কে। ঘরের মধ্যে কেঁউ কেঁউ শব্দ কিসের? গিয়ে দেখি, ওম্মা। ছেলে দুধের সমুদ্রের মধ্যে বসে, আর ওই কাণ্ড। থমকে দাঁড়াতে মুখের দিকে চেয়ে বলে 'বাদো-ভুড়ু'।—তার মানে উনি হয়েছেন মা, লুসীর ছানা হয়েছে বাদল, মার বাদলকে দুদু খাওয়ানো হচ্ছে। বাঁচাতে বাঁচাতেও বউমা এসে দিলে ঘা-কতক বসিয়ে। এখন বল চাও এমন সৎকাজের নকল' ওকে বাইরে রাখবে কি ওর জন্যে একটা খোঁয়াড় গড়বে তোমরাই ঠিক কর। বাড়ির সবাই তো হেরে বসে আছি।"

আমি বললাম, "আমার উদ্দেশ্য তুমি ঠিক ধরতে পার নি মা, ওর কাছে তো ভালোমন্দ বলে প্রভেদ নেই। কাকে নকল করতে হবে, কোন্‌টা নকল করতে হবে, কিভাবে নকল করতে হবে, আমাদেরই বেছে দেখিয়ে দিতে হবে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছে খাটাতে গেলেই গলদ। চোখে পড়লে আমাদের ধমকে ধামকে শুধরে দিতে হবে। বেশ তো আজকের এই দুটো ব্যাপারই এখনও টাটকা রয়েছে এই দুটো নিয়েই আরম্ভ করা যাক।"

বাদল মার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপরাধীর মতো নিজের কীর্তি-কাহিনী শুনিতেছিল, আমি হাতটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া চোখমুখ

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, "বাদল !"

আজ ঝোঁকটা বড় বেশি পড়িয়াছে, বাদলের ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া মার ভাবগতিটা লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বিষণ্ণ মুখ, সামলাইয়া লওয়া কান্নার দুইটি বিন্দু অশ্রু চক্ষে ঠেলিয়া আসিয়াছে। আস্তে আস্তে ধরা গলায় ডাকিল, "নিম্নী"।

ব্যাস, মা গলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইয়া আদরে চুম্বনে যতক্ষণ না মুখটাতে হাসি ফুটাইতে পারিলেন, ততক্ষণ নিরস্ত হইলেন না।

আমি নিরাশ হইয়া বলিলাম—"ওই, স-ব মাটি করলে, কি না একটু গিন্নী বলে ডেকেছে। মনের উপর নিজের দোষের জ্ঞানটি দিব্যি জমে আসছিল, তুমি সব ভেস্তে দিলে। ওই জিনিষটা হচ্ছে অনুতাপের অঙ্কুর। তোমরা নষ্ট করেছ ওকে—তুমি আর দাদা মিলে।"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, "ক্ষ্যামা দে বাপু, ওইটুকু ছেলের নাকি আবার অনুতাপ, প্রাশ্চিত্তির! অমুঙ্গুলে কথা শোন একবার! করে নিক যত দুষ্টুমি করবে ও, শেষ পর্যন্ত একটা মহাপুরুষ হবেই বলে দিচ্ছি। তোরা সব লক্ষণ চিনিস না।"

এই অবস্থা। চুপ করিয়া ভাবিতে থাকি, দুঃখ হয়, এঁরা বিজ্ঞানের দিক দিয়া যান না, মেথড বুঝেন না তিনি, আবার বিচার এবং শাসনের অভিনয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন সেটা।

কোর্ট হইতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাদার ঘরে তাঁহার দৈনন্দিন ঘরোয়া কোর্ট বসিয়া গিয়াছে। এক পাল ফরিয়াদী—রাণু, আভা, ভোম্বল, রেখা আরও সব। আসামী মাত্র একটি—বাদল। সে বিচারপদ্ধতির সনাতন ধারা লঙ্ঘন করিয়া জজের কোলে বসিয়া লেবেঞ্চুস খাইতেছে এবং অবসর মতো মাথা সঞ্চালন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছে।

নানা রকম ছোটবড় নালিশের চোটে ঘরের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। রাণুর হাতে দাঁতের ছাপ, আভার মাথা ভাঙ্গা কাঁচের পুতুল, রেখার ছেঁড়া বই, ভোম্বলের ছেঁড়া চুল এক প্রলয় কাণ্ড। চৌকাঠের বাহিরে লুসীও তাহার পাঁচটি নিরীহ, বিপন্ন, অত্যাচারগ্রস্ত শাবক পাশে লইয়া দীন নয়নে বিচারাসনের দিকে চাহিয়া আছে। দেখিলে এক একবার মনে হয় বটে, তাহার সপরিবারে ওই লেবেঞ্চুসটির দিকে লোভ। কিন্তু সে বেচারী ছা পোষা, বাদলের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হইয়া ন্যায়ের দ্বারস্থ হইয়াছে, এ অনুমানেও কোনো বাধা দেখি না।

এমন জবরদস্ত মকদ্দমা দাদা দুই কথায় শেষ করিয়া দিলেন। পকেট হইতে

কাগজ মোড়া খান চার-পাঁচ বিস্কুট বাহির করিয়া আসামীকে প্রশ্ন করিলেন, "এগুলো সমস্ত পেলে আর দুষ্টুমি করবে না ত বাদল ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মন্দ বিচার নয়। আমারও একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হচ্ছে। কাল আবার দুষ্টুমি করলে জরিমানার পরিমাণ ডবল হয়ে যাবে তো ?" দাদা বলিলেন, "ও ওইসব করেছে বলে বিশ্বাস হয় ? ওর চোখ দুটি দেখ্ দিকিন।"

বেঁটে, চওড়া চওড়া গড়ন, একটু ঘাড়ে-গর্দানে, আর এই রকম ধড়ের উপর প্রকাণ্ড একটা মাথা, এ গুলো সবই বাদলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুইটি সত্যই একটু গোল বাধায় বটে, যদি বাদলের সাথে অষ্টপ্রহর পরিচয় না থাকে। আর সে রকম পরিচয় দাদার বড় একটা নাইও। সকাল সকাল দুইটি খাইয়া অফিস যান, প্রায় সন্ধ্যার সময় আসেন। ডাক পড়ে —"বাদল !"

শান্ত-শিষ্ট শিশুটি আসিয়া উপস্থিত হয়। দাদার জন্য বিশেষ করিয়া পরানো পরিষ্কার জামা গায়ে, হাত মুখ যত্ন করিয়া মোছানো। আসিয়াই গোটাকতক চুমা-উপঢৌকন, প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া একবার 'একা' একবার 'আনু'র নাম উচ্চারণ। মানে, রেখা ও রাণুর হাতে আজ সমস্ত দিনটা নির্যাতন গিয়াছে। সান্ত্বনা-স্বরূপ লেবেঞ্চুস প্রাপ্তি।

তারপর জ্যাঠার সেবা। জুতা রাখিয়া দেওয়া, চটি আনিয়া তাঁহার পা দুই-খানি পাতিয়া বসাইয়া দেওয়া, হাত-পা ধুইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানো, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন কোন্ বাড়ি না কোন্ বাড়ির ছেলে।

দাদা তৈয়ার হইলে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া দাদার জলযোগের বন্দোবস্তের জন্য মোতায়েন হওয়া, পানের ডিবা হাতে করিয়া আবার প্রবেশ।

তাহার পর বসিয়া বেশ পরিপাটি ভাবে দাদার জলখাবারের রেকাবির ভার লাঘব করা।

এই অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায়, বাদল দাদার সঙ্গে খানিকক্ষণ হুড়াহুড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। দাদা আস্তে আস্তে তাহার রগের উপর করাঘাত করিতেছেন এবং বাদলের শান্ত অধরে 'ভাত আসছেন, আমি খাচ্ছেন' শীর্ষক তাহার স্বরচিত প্রিয় গানটি মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া আসিতেছে।

আমি বলিলাম, "ওর চোখ দুটো তো মারামারির জন্যে হয় নি, ওকে বাঁচাবার জন্য হয়েছে, বাঁচাচ্ছেও বেশ। কিন্তু ওর হাত পা আর দাঁত—যা

ওর অস্ত্র, সেগুলো দেখে তোমার কোনো সন্দেহের কারণ আছে? যদি থাকে তো না হয় বাখারিগুলোও আনিয়ে দিই।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "শুনছ বাদল, বাদীরা নিজের মুখে নালিশও করলে, আবার ভালো উকিলও রেখেছে। এখন তোমার কি বলবার আছে, বিশেষ করে বাখারি সম্বন্ধে?"

বাদল দাদার হাঁটু ঘোড়ার উপর ঘোড়সওয়ার হইয়া বসিয়া ঘোড়াকে চালাইবার নানা উপায় লইয়া ব্যস্ত ছিল, বাখারির কথা শুনিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া পড়িয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমরা তাহার এই হঠাৎ তিরোভাবের কারণ না ধরিতে পারিয়া তাহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বাদল একখানা চওড়া, প্রায় হাত খানেকের বাখারি লইয়া প্রবেশ করিল।

চৌকাঠ পার না হইতেই ছেলেমেয়েগুলো কলরব করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "ওটা আমার তরোয়াল, ওই দিয়ে আমার কপালে মেরেছিল, এই দেখ।"

কেহ বলিল, "ওটা আমার রাঁধার হাতা, আমায় দিয়ে দিতে বল।" সবচেয়ে ছোট সন্তানবৎসলা আভা প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "না-গো-না, ওটা হাতা নয় তরোয়াল নয় আমার ছেলে, ওর কাপড় কেড়ে নিয়েছে বাদলা।" বাদল এসবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সটান দাদার কোলে গিয়া বসিল এবং অচল ঘোড়াটিকে গতিবান করিবার জন্য তাহার এই নূতন আমদানি করা সূক্ষ্ম চাবুকটি উঠাইয়া ধরিল। দাদা হাসিয়া উদ্যত চাবুকটি ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আহা বাদল, ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন তোমার জ্যাঠাটিকে বয়ে বয়ে এলিয়ে পড়েছে; আর এর ওপর ঠেঙিয়ে কাজ নেই।" বাদল দাদার মুখের দিকে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল, "দুষ্টু।" দাদা বলিলেন, "আহা, কিছু খায় নি কিনা অনেকক্ষণ, তাই দুষ্টু হয়েছে। তোমায় একটা ভালো ঘোড়া কিনে দোব'খন, কি বল?"

তারপর আমায় বলিলেন, "কালকে ছুতোরকে ডেকে একটা কাঠের ঘোড়ার কথা বলে দিস তো।"

বলিলাম, "দোহাই আর উপসর্গ বাড়িয়ে কাজ নেই। যা সরঞ্জাম সব মজুত—"

দাদা কথাটা শেষ না করিতে দিয়া বলিলেন, "না কাজ কি? আমার ঠ্যাং দুটো ওই আখাম্বা বাঁশ পেটা থাক আর কি। এখন ওই ঝোঁক চেপেছে সেদিন রমনায় ঘোড়দৌড় দেখে।" বলিলাম, "ছুতোরকে বলে দিতে বিশেষ আমার আপত্তি নেই, শুধু ভয় এই যে আর একটা ঝগড়ার ঘর বাড়বে। আর তা ছাড়া কচি ছেলের ঝোঁকমতো সব বিষয়েই যোগান দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়, তাতে ওদের মন একটা

নির্দিষ্ট গতি পায় না। এ কথাটা বেশ সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন বিখ্যাত জার্মান লেখক ফন—"

দাদা বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোর ওই কেতাবী বুলি রাখ্ দিকিন। ছেলে-পিলের মন এখন হাজার পথে হুহু করে দৌড়বে। ও মাঝ থেকে পাহাড়প্রমাণ কেতাবের লাইন ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান হল। বাংলা কথা হচ্ছে ছোট ছেলের ঘোড়ার শখ হয়েছে তাকে একটা কিনে দিতেই হবে। না দাও, আমার হাঁটু, তোমার কাঁধ, চেয়ারের হাতল, ছাতের আলসে যা সুবিধে পাবে ঘোড়া করে বসে থাকবে। শেষকালে একটা কাণ্ড ঘটাক আর কি—"

আভা বলিল, "বারে ও আমাদের মারলে আর ওকেই বিস্কুট দেওয়া হল আবার একটা ঘোড়া পাবে—"

রেখার কথায় ইহার মধ্যেই বেশ ঝাঁজ হইয়াছে। একটু পিছনে ছিল, সেই আড়াল হইতেই বলিল, "ও ছেলে কিনা, আমরা সব বানের জলে ভেসে—"

দাদা রাগ দেখাইয়া বলিলেন, "কে রে? রাখী বুঝি? তা মেয়ে হতে গিছলে কেন?"

রেখা আর একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া বলিল, "বাদলের মার খাবার জন্যে।" দুইজনেই হাসিয়া উঠিলাম। দাদা বলিলেন, "একেবারে পেকে গেছে হতভাগা মেয়ে। নাঃ এরা বেজায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। আচ্ছা তোদের বিচার করে দিচ্ছি দাঁড়া।"

ডাকিলেন "বাদলবাবু। এদিকে এস তো, লক্ষ্মীছেলে।" বিচারের আশায় বাদীমহলে একটা চঞ্চলতা ফিসফিসানি পড়িয়া গেল। বাদল দাদার ইজিচেয়ারের পিছনে গিয়া তুলিয়া তুলিয়া বিস্কুট খাইতেছিল এবং লুকাচুরি খেলা করিতেছিল, ডাক শুনিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাদা রাণুর হাতটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "একি করেছ বল তো? এ তোমার কে হয়?

প্রতি সপ্তাহে এ রকম চার পাঁচটি বিচার-অভিনয় হওয়ায় বাঁধা গতটি বাদলের খুব রপ্ত। দাদার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে খাসা নির্বিকারভাবে নিজের কান দুইটি ধরিয়া বলিল, "ডিডি অয়।"

"প্রণাম কর।"

হুকুমের পূর্বেই সে অর্ধেক ঝুঁকিয়াছিল; প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধির স্বাক্ষর-স্বরূপ রাণু একটা চুমা খাইল। এটিও বাঁধা রীতির আর একটা অঙ্গ।

এই রকম ভাবে দোষের গুরুত্বলঘুত্ব নির্বিশেষে পাঁচটি মকদ্দমার এই একই

পদ্ধতিতে বিচারকার্য শেষ হইলে দাদা বলিলেন, "কেমন, তোমাদের আর কোনো দুঃখ নেই তো? বাদলের সাজা মনে ধরেছে? আর কোনো নালিশ নেই তো আজ?

ও বয়সে ভাব করিবার ইচ্ছাটাই প্রবল, সেইজন্যই হউক, কি ইহার বেশী বিচারের আশা নাই বলিয়াই হউক, এক রেখা ছাড়া সবাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

রেখার ঐতিহাসিক দৃষ্টিটা বেশ তীক্ষ্ণ। সে বলিল, "আবার কাল—" দাদা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, কালকের কথা কাল দেখা যাবে। এই চারখানা করে বিস্কুট নাও সব; বাদল যদি দুষ্টুমি করে, একটু করে ভেঙে দিও, ঠাণ্ডা থাকবে। যাও, বিচার শেষ।"

না বলিয়া পারিলাম না, "এই একঘেয়ে নকল বিচারে ওর মনে কোন দাগ বসাতে পারে না, এই জন্যেই—" দাদা তাঁহার সেই হাসির হিল্লোল তুলিয়া বলিলেন, "দাগ বসাতে হলে তো ওরই বিদ্যে শিখতে হয় আমাকেও, রাণুর কব্জিটা দেখেছিস তো? আমার দাঁতে অত জোর-টোর নেই বাপু।"

সবাই চেঁচামেচি করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাদল দাদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "দাত্তা, দুসী?" দাদা আমায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন; অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন; "হ্যাঁ জ্যাঠা, লুসী।......আমি যতদূর দেখেছি, শৈলেন—"

বাদল আধ খাওয়া বিস্কুটটা লুসীর দিকে বাড়াইয়া ডাকিল; "আঃ, আঃ।" লুসী আপনার বাচ্চাগুলিকে খাড়পিঠ হইতে ঝাড়িয়া দিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে উপস্থিত হইল।

দাদা বলিয়া যাইতেছিলেন, "এই তো গ্রামে নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব, দল পাকাতে সব ছেড়ে তাইতে মেতে ওঠে, কতটা দুঃখের বিষয় বল তো?......তুই হাসছিস যে?"

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তিনিও সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। বাদল তাঁহার বিচারের ক্রটিটুকু পূরণ করিয়া দুই হাতে দুইটি কান ধরিয়া লুসীর সামনের থাবা দুইটির উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছে এবং লুসী তাহার জিহ্বা দিয়া পরম ক্ষমাভরে তাহার মাথা পিঠ চাটিয়া চাটিয়া একশা করিয়া দিতেছে।

দাদার বিচারের সদ্য-সদ্য আলোচনা করিবার এমন চমৎকার সুযোগটা আমি নষ্ট হইতে দিলাম না। হাসিতে হাসিতেই বলিলাম, "তোমার বিচারের ফার্সটা যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, বাদল নিখুঁতভাবে সেটা পূরিয়ে দিলে দাদা।"

পরের দিন সকালে দাদার ঘরে বাদলের কথা হইতেছিল। মা বলিতেছিলেন, "ওর

তো সর্বজীবে সমান ব্যবহার হবেই, ওসব লক্ষণই আলাদা। স্থির হয়ে এক-একসময় যখন বসে থাকে, ঠিক পরমহংসদেবের মতো মুখের ভাবটি হয়, দেখিস নি! তিনিও নিশ্চয় ছেলেবেলায় নিশ্চয় ঠিক অমনটি ছিলেন। আর তা ছাড়া অমন একটা বড় তীর্থে জন্মেছে, ও একটা মহাপুরুষ না হয়ে যায় না, তোরা সব—"

এমন সময় বারান্দায় চটাস করিয়া একটি প্রচণ্ড চড়ের আওয়াজ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাদলের ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিবার আওয়াজ।

মা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন, "ও কি বউমা, ছেলের গায়ে হাত? আর ওই রকম হাত? দিন দিন যে কশাই হয়ে উঠছ।"

বউমার চাপা গলায় ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাইতে লাগিল, "আমি তো আর এই ডানপিটে চোরকে নিয়ে পারি না মা, দেখবেন আসুন, রান্নাঘরে কি কাণ্ডটা করেছে হতচ্ছাড়া ছেলে।"

দৃশ্যটা নিশ্চয়ই খুবই মনোজ্ঞ, সবাই উৎসুকভাবে উঠিয়া গেলাম। সরজমিনে বাদল মুখের মধ্যে চারিটি আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ঝোলে হলুদ হইয়া গিয়াছে, বাম হাতের মুঠোর মধ্যে একমুঠো মাছ। কান্না থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার মাকে অতিক্রম করিয়া এদিকে আসিয়া পড়িবার মতো সাহস যোগাইয়া উঠে নাই।

সেখানটায় হঠাৎ কাহারও দৃষ্টি যায় না, আর বাদল কিংবা লুসী ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতেও পারে না। সেই অন্ধকার কোণে ঝকঝকে একখানি রেকাবিতে আধ সের পরিমাণ মাছের মুড়া একটা, রেকাবির এধারে ওধারে কাঁটাকুটা দুই একটা পড়িয়া আছে। লুসী আরম্ভ করিয়াছিল, এখন সভয়ে গুটিসুটি মারিয়া দীন নয়নে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

দাদা হাসিতে হাসিতে রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আবার মাজা রেকাবিতে তোয়াজ করে। বাদল, ওটি আমাদের নাতবউ নাকি?"

দার্শনিক হিসাবে বাদল একজন সুবিধাবাদী। বুঝিল, আর দেরি করা নয়। যেন মস্ত একটা ইয়ার্কি চলিতেছে যাহার মর্ম শুধু দাদা আর সে বুঝে, এইভাবে দাদার পানে চাহিয়া "ন্যাতবউ!" বলিয়া খুব বড় করিয়া একগাল হাসিয়া পা বাড়াইল, কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মার চোখের দিকে নজর পড়ায় থমকিয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রেখা হাসিয়া বলিল, "ও সাধুপুরুষ। তোমার আবার চুরিবিদ্যে!" মার ধমক খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল।

আমরা সরিয়া গেলেই বউমাকে আর রোখা যাইবে না ; অন্তত রুখিবার পূর্বেই সুসম্পাদিত এই নূতন আবিষ্কারের ঝাল তিনি ঝাড়িয়া লইবেনই। মা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাদলকে বাহির করিয়া আনিলেন। পরমহংসদেব হইতে একেবারে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার—নাতি তাঁহাকে একটু অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়াছে বইকি।

কাহারও দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "ও আমার ননীচোরা। তাঁরও চুরি করে না খেলে পেট ভরত না। নে, আর জটলা করতে হবে না সব, হাতে-নাতে পাট সেরে নে।"

এই রকম কাণ্ডের পর খুব খানিকটা হল্লা হাসি হয়, যোগদান করি, তারপর বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। একটা গোটা ছেলের ভবিষ্যৎ, সোজা কথা নয় তো। এদিকে দেশের এই দুর্দিনে—মাকে বলিলাম, "দেখ মা, এ ঠিক হচ্ছে না। এতে করে নাতি তোমার পরমহংসদেবও যত হবে, ননীচোরাও তত হবে, আর বাবার ঘোষো-ডাকাতও খুব হবে। এঁর ধড়, তাঁর মুড়ো নিয়ে কিম্ভূতকিমাকার যা হয়ে উঠবে, তা দেখবার মতো হবে নিশ্চয়। তার চেয়ে দিন কতক আমার হাতে দাও। বেশ তো সাধুপুরুষ চাও, সেই রকম ভাবেই—"

মা বলিলেন, "তোর কাছে সব রকমের ছাঁচ আছে নাকি রে, ঢালাই করে যেমনটি চাইবি গড়ে টেনে তুলবি? তা রাখ্ না বাপু, তোর কাছেই। এতগুলো লোককে নাজেহাল করে তুলেছে, পারবি তো ওকে সামলাতে?"

দাদা বলিলেন, "কিছু না, ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে আপাতত; কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবে'খন।"

বলিলাম, "ঘোড়ার খেয়ালটাই মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ওই জিদ ভাঙা দিয়েই আরম্ভ করব।"

"আর ও-ও তোমার প্ল্যান ভাঙা দিয়ে শেষ করবে, এই বলে রাখলাম। কি বাদল, পারবি তো?"

দাদা হাসিতে লাগিলেন।

সেইদিন হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম। ঠিক হইল, এক খাওয়ার সময় ছাড়া বাদল সমস্তদিন আমার কাছে থাকিবে। সন্ধ্যা হইতে দাদার চাই-ই; অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাজী হইলাম, কিন্তু সমস্ত দিনের অপকীর্তির বিচারের ভারটা দাদার হাত হইতে তুলিয়া লইলাম। বলিলাম, "ও ব্যাপারটাকে অত হালকাভাবে নিলে চলবে না, বিচারটা বেশ সূক্ষ্মভাবে ওর সমস্ত দিনের কাণ্ডকারখানা আলোচনা

করে, করতে হবে। রোজকার রোজ ওর মনের কোনো বিশেষ বৃত্তিকে একটু একটু করে উসকে দিতে হবে, আবার কোনোটাকে বা অল্প অল্প করে নিবিয়ে আনতে হবে।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "মন্দ হয় না ; তাহলে শিপশির মনোবৃত্তির একটা টেম্পারেচার চার্ট তোয়ের করে ফেল্। তা রোগীটিকে বাইরের ধুলো বাতাস থেকে বাঁচিয়ে কোন ঘরে পুরে রাখবি ?"

রাগিয়া বলিলাম, "ঘরে পোরবার দরকার আছে বলেছি কি ? হাসবে খেলবে একটু মারামারিও করবে, এমন কি, চুরিও করতে পারে মাঝে মাঝে, তবে একটা সিস্টেমের মধ্যে। স্পার্টানরা তো তাদের ছেলেদের চুরি করতেও—"

দাদা আবার হাসিয়া উঠিলেন, "অর্থাৎ ছেলেটাকে তুই একটা সিস্টেমেটিক চোর করতে চাস ? হাঃ হাঃ হাঃ।"

দাদাকে পারিবার জো নাই।

পরের দিন অনেক টাকা দামের দুই ভলুম বই আনিতে দিলাম। অথর আমেরিকার একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক; সমস্ত জীবন অবিবাহিত থাকিয়া কেবল শিশুমনের আলোচনা করিয়াছেন।

মা শুনিয়া বলিলেন, "নে আর জ্বালাস নি বাপু, যে বিয়েই করলে না, ছেলে-পিলের মুখ দেখলে না, সে নাকি কচিদের মন নিয়ে বই লিখবে! ঢঙ একটা!"

দাদা বলিলেন, "কেন, এক সময় তিনি নিজেই তো শিশু ছিলেন!" এসব ঠাট্টায় কান দিলে চলে না। বই দুইখানি সযত্নে মলাট দিয়া আলমারিতে তুলিলাম। আমার অন্যান্য বইগুলোকেও ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সাজাইয়া রাখিলাম।

দুই-চারি দিন গেল। আমার কেতাবের ছত্রগুলি লাল নীল দাগের উর্দি পরিয়া আমার সাহায্যের জন্য মোতায়েন হইয়া উঠিল। প্রথমটা বাদলকে একচোট অগাধ মুক্তি দিয়া দিলাম। বাড়িতে অষ্টপ্রহর সামাল-সামাল রব পড়িয়া গেল।

মা বলিলেন, "এই কি তোর শাসন হচ্ছে ? এর চেয়ে সে যে ঢের ভালো ছিল।"

মাকে ছকটা বুঝাইয়া দিলাম, "হোমিওপ্যাথি ওষুধে প্রথমে রোগটা একচোট বাড়িয়ে তোলে। আমি ওর সমস্ত দোষগুলো ভালো করে ফুটিয়ে তুলে ওকে ভালো করে চিনে নিচ্ছি আগে, সপ্তাহখানেক লাগবে।"

মা বলিলেন, "তদ্দিনে বাড়ির অন্য ছেলেপিলেদের আর চিনতে পারবে না কিন্তু, এই বলে দিলাম। আজ ঘুমন্ত আভার মুখে পাউডারের সমস্ত কৌটো গেছে,

যে আটকে যার আর কি। ' ওই গো, আবার বুদ্ধি কি কাণ্ড বাধালে! ' ওরে, কে আছিস দেখ, দেখ।"

চার দিন গেল, ছয় দিন গেল, দশ দিন গেল, চিনিতে অত্যধিক দেরি হইতেছে, উত্তরোত্তর শক্তও হইয়া উঠিতেছে যেন—পূর্ণ মুক্তির মধ্যে দুষ্টুমিতে বাদলের নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য। ক্রমে দেখিতেছি—এ বেলা এক রকম, ও বেলা এক রকম। নালিশের চোটে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। দাদা বলেন, "শৈলেনের কাছে যা।" মা বলেন, "শৈলেনের কাছে যা। আমাদের ওপব চটবে।" বউদের মুখেও ওই কথা। আবার তাঁহাদেরও নিজের নিজের নালিশ আছে।

অথচ আমি চটিব না। একটুও চটিব না, সে কথা বলি কি করিয়া? ছেলেপিলেদের মধ্যে যে নালিশ করিতে আসিতেছে, সে-ই উল্টা মার খাইয়া গেল, এমন ব্যাপারও ঘটিতেছে দুই একটা। বলি, "মাথায় ধুলো দিয়ে দিয়েছে তো দিক দুদিন; আমায় বই পড়ে নেবার একটুও অবসর দিবি নি তোরা?" আসলে ঠিক বই পড়া নয়। বইয়ে দাগ দেওয়া হইতে এখন সমস্ত পাতাব উপর ঢেরা কাটায় দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় রাগের মাথায় দুই-একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও থাকিব। আমার মুখ দিয়া কি ইহারা 'না' না বলাইয়া ছাড়িবে না? এদিকে সপ্তাহখানেক ছুটি বাড়াইব বলিয়া যে ঠিক করিয়াছিলাম, সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছি, বোধহয় ছুটি ফুরাইবার সপ্তাহখানেক আগেই চলিয়া যাইতে পারি।

আজ পনেরো দিনের দিন। নবীনতম সংবাদ বাদল বাবার গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল, বাবার মতো ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া। আভা চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া আসিয়া খবর দিল, "একবার দেখবে এস আস্পদ্দাটা!"

একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম, "আর তুমি কোথায় ছিলে বাঁদরী? ছোট ভাইটিকে একটু চোখে চোখে রাখতে পার না?"

অর্থাৎ আভার হাতেও অভিভাবকত্বের ভারটা ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি। বলিলাম, "ধরে নিয়ে আয় হতভাগাকে।" কিন্তু সেটা আভার দৈহিক সম্ভাবনার বাহিরে জানিয়া নিজেই গেলাম। দেখি, একবর্ণও মিথ্যা নয়। অবশ্য কলিকাতে আগুন নাই; কিন্তু টানার ভঙ্গী নিখুঁত, মায় বাবার কাশিটি পর্যন্ত। বাবা প্রতিবেশী বন্ধু উপেনবাবু আসিলে নলটি বাড়াইয়া দেন; সেটুকুও বাদ গেলো না, আমি সামনে আসিতেই মুখ হইতে নল সরাইয়া "খুলো, এতো" বলিয়া নলটি বাড়াইতে যাইতেছিল, আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মাঝপথেই থামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া, আমি কামনা কি ওই রকম একটি ছোটখাটো

সাজা দিতে যাইতেছিলাম, একটা কথা ভাবিয়া থামিয়া গেলাম। হঠাৎ মনে হইল, বাদল নিশ্চয় এটা দোষ বলিয়া আগে জানিত না। কেননা জানিয়া শুনিয়া যে দোষ করা, তাহাতে ধরা পড়িলে বাদল নিজে হইতেই কান ধরিয়া পূর্বাহ্ণেই হাঙ্গামা মিটাইয়া রাখে। তাহা ছাড়া দোষ বুঝিলে আমাকে দেখামাত্রেই ভয় পাইত নিশ্চয়, "খুড়ো, এস" বলিয়া এভাবে সটকাটা বাড়াইয়া দিতে সাহস করিত না।

আমি এইটিকে নিছক একটি দৈব সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। অপরাধটি একেবারে নূতন। কেন না বাবা কখনও নল বাহিরে ছাড়িয়া যান না, আজ কেমন ভুল হইয়া গিয়াছে। দামী রবারের নল, এখানে পাওয়া যায় না, তাঁহার অত্যন্ত হেফাজতের জিনিস।

এই অপরাধটিকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক। এখন হইতেই অপরাধের গুরুত্বটি মাথার মধ্যে এমন করিয়া ঢুকাইয়া দিতে হইবে, যেন এই জাতীয় অপরাধ সমস্ত জীবনে আর না করে। নিজের ঘরে লইয়া আসিয়া বাদলকে এক-খানি মাদুরে বসাইলাম এবং সামনে একটি টুলের উপর নলসুদ্ধ গড়গড়াটি বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওই দেখ্, আর মুখ দিবি ওটাতে ?"

এ রকম নূতন ধরনের অভিজ্ঞতায় বাদল একেবারে হকচকিয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল।

"ঠিক ওইভাবে বসে থাক, বজ্জাত কোথাকার।"—বলিয়া আমি শেল্ফ্ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে লাগিলাম।

একটু পরে আবার ফিরিয়া তাকাইলাম, বাদল জড়ভরতের মতো ঠায় সেই ভাবে বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিবি আর মুখ ওটাতে ?" পেরেকের মাথায় একটি একটি করিয়া ঘা দেওয়া হইতেছে।

সে সেই রকম মাথা নাড়িল, না।

"বসে থাক ঠিক ওই ভাবে, ঐটের দিকে চেয়ে।"

বইয়ে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার কথা লিখিতেছে; সেইখানটা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। বলিতেছে সাজা কড়া হইবার কোনো দরকার নাই; একটি গাম্ভীর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া দোষের গুরুত্বটা মাথার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বার্লিনের পাঁচটি দুশ্চিকিৎস্য শিশুর কেস দেওয়া আছে; রীতিমত রেকর্ড দেখা গিয়াছে; সাত বৎসরের মধ্যে তাহারা সে দোষ আর করে নাই, অথচ সব জার্মান বাচ্চা—কালে হিণ্ডেনবার্গ, লুডেনডর্ফ হইবার কথা।

বিবৃতিটি এতই চিত্তাকর্ষক যে চোখ ফেরানো যায় না। পড়িতে পড়িতে থামিয়া থামিয়া চক্ষু না তুলিয়া তিন-চার বার প্রশ্ন করিলাম, "আর দিবি মুখ ওতে?"

উত্তর নাই, না দেখিলেও বুঝিতেছি, সেই রকম ভাবে মাথা নাড়িতেছে।

খানিক পরে সমস্ত অধ্যায়টি শেষ করিয়া বইটি মুড়িয়া রাখিলাম। নিজের পরীক্ষার এই আশু সফলতায় মনে মনে তৃপ্তিবোধ হইতেছিল। বেশ নিশ্চিন্তভাবে "ওটাতে দিবি না তো মুখ, অ্যাঁ?" বলিয়া ফিরিয়া উঠিয়া বসিলাম।

কোথায় বাদল? মাদুর শূন্য; টুলের উপর খালি গড়গড়াটা, সটকা নাই। হাঁকিলাম, "বাদল!"

ও বারান্দা হইতে উত্তর আসিল, "অ'গ্যেন (আজ্ঞে)"।

ওর বাবার শেখানো ভদ্রতা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাদল ব্যবহার করে। উঠিয়া গিয়া ব্যাপার যাহা দেখিলাম, তাহাতে তো চক্ষুস্থির।

রবারের নলের আধখানা লইয়া লুসীর বাচ্চারা খেলা করিতেছে, আধখানা ঘোড়ার লাগামের আকারে লুসীর মুখে, বাদলের হাতে তাহার খুঁট দুইটা, মুখে "হ্যাট হ্যাট" শব্দ চলিতেছে।

লুসী নলটা পরম পরিতোষ সহকারে চিবাইয়া যাইতেছে, এটারও দুইখানি হইয়া যাইতে আর দেরী নাই। বাবার শখের নল, সমস্ত বাজার উজাড় করিয়া বাছিয়া কেনা।

একটুখানির মধ্যেই বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বাবা আসিয়া সটকার খোঁজ করিতেই। বউমার নির্দয় প্রহারে বাদলের বাড়ি ফাটানো কান্না, মার বউমাকে বকুনি (এর সমস্তটাই এমন দ্ব্যর্থক যে, প্রত্যেকটি কথা আমার উপর একটু বক্রভাবে খাটে), লুসীর চীৎকার করিতে করিতে গৃহত্যাগ এবং তাহার বাচ্চাদের গৃহের মধ্যে থাকিয়া অসহায়ভাবে চীৎকার।

দাদা ক্রমাগতই বলিতেছেন, "বলছি, ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে, সেদিন পইপই করে বুঝিয়ে বললাম।"

বাবা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' তিরস্কার লাগাইয়াছেন, তাহার মধ্যে সেকাল-একালের তুলনামূলক ব্যাখ্যান আছে, এ সংসারে তামাক ধরার জন্য আত্মধিক্কার আছে, আধুনিক বিজ্ঞান মাত্রেরই, বিশেষ করিয়া মনস্তত্ত্বের শ্রাদ্ধকামনা আছে।

বলিতেছেন, "ভড়ঙের যেন যুগ পড়ে গেছে, ছেলে তো আমিও মানুষ করেছি; একটা আধটা নয়—"

যা শেষ করিতে দিলেন না; আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, মুখটা বিরক্তভাবে ঘুরাইয়া লইয়া ঝাঁজিয়া বাবাকে বলিলেন, "ছাই মানুষ করেছ, ওই নমুনা নিয়ে আর বড়াই করতে হবে না।"

শিশু-মনস্তত্ত্বমূলক সাতখানি নামজাদা পুস্তকের গ্রাহকের জন্য 'স্টেটসম্যানে' বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াছি।

স্বয়ংবরা

রাণুর বিবাহ। তিন দিন ধরিয়া রোশনচৌকির বাজনায় বাড়ি ঘর দুয়ার সুরে সুরে ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুর কিভাবে মনের মধ্যে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া যেন রুন রুন করিতেছে।

গায়ে হলুদের দিন মেয়েদের প্রীতিভোজ। সে ব্যাপারটি সুরের মধ্য দিয়া আহুত—সেটি যেন রাণুকে আরও পরিপাটি করিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সে যতই সঙ্কুচিত হইয়া ঘরের কোণ খুঁজিতেছে, বাড়ির যত প্রশ্ন যত আহ্বান যেন তাহারই অভিমুখী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"কোথায় গেল সে?"

"ওমা! তুই নিশ্চিন্দি হয়ে একঠায় বসে আছিস? কি বলে গেলাম এক্ষুনি?"

নিমন্ত্রিতদের ওই এক খোঁজ।

"রাণুকেই যে দেখছি না! এই যে! দেখেছ? ক'দিনেই কত বদলে যায়?"

"হুঁ, পুষলে পাবলে, এবার কাটল মায়া। কিছু না, কাকের কোকিল ছানা পোষা দিদি!"

শুধু রাণু, রাণু আর রাণু!

বিবাহের দিন সমস্ত ব্যাপারটি তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে ঘিরিয়া ফেলিল। বর আসা হইতে আরম্ভ করিয়া সবাইকে দেওয়া-থোওয়া বসানো-খাওয়ানোর মধ্যে যা কিছু উৎসব, ব্যস্ততা, চেঁচামিচি, হাসি, বচসা—সমস্তর মধ্যেই রাণু যেন একটা গূঢ় অলক্ষ্যে উপস্থিত আছে। তারপর আসল বিবাহের ব্যাপারটা, রাণু তো সেখানে সর্বেশ্বরী, সবাইকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে—ছোট বড়; গুরু লঘু সবাইকে।

অথচ এই রাণু সেদিন পর্যন্ত সংসারের আর সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র

অপর একজন ছিল। সংসারের কাজে অকাজে আধময়লা কাপড় পরা—খোঁজ পড়িয়াছে কয়মাশের জন্য—কাজের অবহেলা কিংবা ভ্রান্তিতে খাইয়াছে বকুনি—মুখভার করিয়া ফিরিয়াছে, তাও কাজের তাগিদে কি মুখটাই বেশীক্ষণ বিষণ্ণ থাকিবার অবসর পাইয়াছে? আদরের কথা? হ্যাঁ তা নেহাত যখন কাহারও অতিরিক্ত রকমের ফুরসত বোধ হয়, ডাকিয়া এদিক ওদিক দুইটি প্রশ্ন, দুইটা মিষ্ট কথা—

বিবাহ জিনিষটা তাহা হইলে মন্দ নয়। কেমন করিয়া যেন মনে হয় একটি প্রদীপ জ্বালার কথা,—গান, উৎসব, শঙ্খ, উলুধ্বনির সঙ্গে যেন একটি আরতির দীপ দেবতার সামনে আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল।

আলোর কিন্তু একটা ছায়ার দিক আছে, ঠিক যেমন আছে একটা দীপ্তির দিক। এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না, কেন না এই ছায়া দীপ্তি লইয়াই তো জীবন।

বিবাহ-বাড়ির দৃশ্যটা একবার ভাবুন, বিশেষ করিয়া চারিদিকে নানা বয়সের যে মেয়েগুলি চলাফেরা করিতেছে তাহাদের কথা। সবচেয়ে ব্যস্ত, সবচেয়ে কলোচ্ছ্বাসিত, কেহ না চাহিলেও শুধু নিজের নিজের আনন্দের অতি প্রাচুর্যে সর্বত্র সঞ্চারিত—মনে হয়, এরাই যেন উৎসবের প্রাণ। কিন্তু সাধারণভাবে একথাটা সত্য হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, উৎসবের আলোটি সকলের মুখে সমানভাবে ফুটে নাই। এমন কি একটু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে এদের মধ্যে অনেকগুলি গম্ভীর নিষ্প্রভ, এমন কি বিষণ্ণ মুখের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এইগুলির উপর আলোর ছায়া পড়িয়াছে—। এই ছায়াকে কি বলিবেন?—হিংসা? যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, সংজ্ঞায় কিছু যায় আসে না, আমি এই ম্লানিমাটুকুকে ছায়াই বলিলাম। রাণুর বিবাহ উপলক্ষ্যে এই রকম একটি ছায়াপাতের কথা বলিব, অল্প কথা, কিন্তু বড়ই করুণ।

এই হাস্যোজ্জ্বল উৎসব-রজনীতে একটি মেয়ের চিত্ত ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কেন বিবাহ হয় নাই? কবে হইবে? কবে তাহার চারিদিকে এই বাদ্য, এই কলোচ্ছ্বাস মুখর হইয়া উঠিবে? বিবাহ! চিন্তাতেও সমস্ত চিত্ত এক মুহূর্তে ভরিয়া উঠে যেন। রূপকথার এমন প্রত্যক্ষ রূপ আর দেখা যায় না, একটি রজনীর মোহন স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহার সব নগণ্যতা ঘুচিয়া যাইবে, রাণুর মতো সেও রাণী হইয়া জাগিয়া উঠিবে। সেদিন আসিবে নিশ্চয়ই, এই রকম একটি রজনীর সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া। কিন্তু কবে? বিলম্ব তো আর সহ্য করা যায় না।

কিন্তু কাহাকেই বা বলিবে, আর কেই বা বুঝিবে তাহার মনের কথা? বুঝিবে? আহারা আজ নিজেদের লইয়াই উন্মত্ত, পরের কথা শুনিবার কি আর

অবসর আছে? আর তা ছাড়া তাহাদের শুনাইয়া ফলই-বা কি? আহারা তো কোনো সুরাহা করিতে পারিবে না।

তবুও চেষ্টা করিয়াছিল। ওদের বাড়ির রতি খুব সাজিয়াছে,—মাথায় ঝকঝকে জরির ফিতা দিয়া রচিত খোপা, তাহাতে টকটকে একটা গোলাপ গোঁজা। ঘাঘরা করিয়া পরা কাপড়ের আঁচল গতির চঞ্চলতায় পিছনে ফরফর করিয়া উড়িতেছে, প্রজাপতির পাখনার মতো। সিল্কের রুমাল—কখনও ব্লাউজে গোঁজা, কখনও কোমরে, কখনও হাতে। চুলের, রুমালের ও ফেস-ক্রিমের মিশ্র গন্ধ যেন ঢেউ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

ইহাকেই বলিবার অনেক সুবিধা, তারপর যদি কথাটা ঘুরিতে ফিরিতে বড়দের কানে পৌঁছায়—রতিকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা বলিল, তাহা যদি নিজের অন্তরের দূতীর কাজ করে।

"ইস, ভাবনে গেলি রতি! কি ভেবেছিস বল দিকিনি।"

"ওমা, ভাবন আবার কি? বিয়েবাড়ি, সবাই তোর মতন গোমড়া মুখ করে বেড়াবে নাকি?"

কিছু ভাবন না। আমি ঠিক জানি মশাই। বলব কি ভাবছিস? রতি ভাবছে, যদি রাণুর মতো আমারও শ্বশুর এসে—"

ভিতর হইতে কে হাঁকিল, "মেয়েদের পাতা করে ফেল।" রতি সেই দিকেই ছুটিয়া গেল, তাহার নিজের মনের রহস্য আর তাহাকে শোনানো হইল না।

ভাজ অনেক সময় ঠাট্টা করে; এই সময় করিলে একটা উপকার হয়, লজ্জা-লজ্জা উত্তরের [illegible], তবুও মনের ভাবটা কতকটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যায়। আজ কিছুতেই বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়, তবুও মনের অভিরুচিটা যদি জানা থাকে সবার তো—তাহাকে পাওয়াই দুষ্কর। যদি পাওয়াই গেল তো, এত ব্যস্ত যে ঠাট্টা করিবে কি? মরিবার ফুরসত নাই। তবুও একবার মুখটা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁরে, ও রকম শুকনো মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে? আজ রাণুর বিয়ে হচ্ছে তাতেই এই রকম, দুদিন পরে যখন নিজের—"

"যাও, ঠাট্টা ভালো লাগে না বউদি।"

"ওমা ঠাট্টা কি লো? দুদিন পরে রাণু যখন নিজের ঘর করতে যাবে, মুখ শুকনো করা তো দূরে থাক, কেঁদেও কি কূলতে পারবি?"

ভাজ বুঝিয়াও বুঝিল না। আর তবে কাহার কাছেই বা আশা? বাপ মা—এদের কাছে তো আর বলা যায় না। বাকি থাকেন দাদু আর ঠাকুমা,

একটির বিদায়েই তাঁহাদের যা অবস্থা, ওখানে তো বেঁধাই যাইবে না। তাহা ছাড়া ঠাট্টা বিদ্রূপের মতো মনে স্ফূর্তি ফিরিয়া আসিতে তাঁহাদের ঢের দেরি এখনও, শ্বশুর জোড়ে ফিরিবার পূর্বে তো নয়ই।

তখন মনে পড়িল মেজকাকার কথা। ও লোকটা হাল্কা প্রকৃতির, কাজের যেমন উপযুক্তও নয়, তেমনিই কাজের ভিড়ে ডাকও পড়ে না ওর। প্রচুর অবসর লইয়া কোনো নিরিবিলি জায়গায় গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে নিশ্চয়ই। আর একটা মস্তবড় সুবিধা এই যে, বিবাহ সংক্রান্ত কোনো কথা ভালো করিয়া বোঝে না বলিয়া ওর কাছে কথাটা পাড়ায় কোনো সংকোচের বালাই থাকিবে না। কেন যে মেজকাকার কথাটা আগে মনে পড়ে নাই। বোধ হয় অমন অ দরকারী লোককে টপ করিয়া কাহারও মনে পড়ে না বলিয়াই।

অবশ্য অতটা বেকার নই আমি। তবুও লজ্জার কথা হইলেও বলিতে হইতেছে, অত কাজের ভিড়েও একটু নির্লিপ্ততা সৃজন করিয়া সেটুকু উপভোগ করিতেছিলাম —নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া, একটু চক্ষু মুদিয়াও।

"মেজকা!"—ডাকে তন্দ্রাবেগটা কাটিয়া গেল। আশ্চর্য। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই এখানে যে? মেয়েদের পাতা করা হয়েছে, খেয়ে নিলি না কেন? রাত হয়েছে যে।

"একেবারে ক্ষিদে নেই।"

"কেন? আচ্ছা, একটু মাথার চুলগুলো ধরে আস্তে আস্তে টেনে দে দিকিনি।"

একটু পরে—"মেজকা।"

আলস্যের স্বরে উত্তর করিলাম "হুঁ?"

"ঘুমুচ্ছ?"

উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "হুঁ। বেশ মিষ্টি হাতটা রে তোর, ঘুম আসছে।"

"না, সে কথা বলছি না।"

"তবে?"

আর একটু চুপচাপ গেল। আবার তন্দ্রাটা বেশ জমিয়া আসিতেছে।

"মেজকা, আমার বিয়ের যোগাড় করে দেবে?" তন্দ্রাটা ছুটিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম। এ যে চার-পো কলি।

কিন্তু কেন, তা বলিতে পারিনা, কোনো রূঢ় উত্তর দিতে কেমন যেন মন সরিল না। বোধ হয় মনে করিলাম, এটা নির্জলা নির্লজ্জতার নিদর্শন নাও হইতে পারে; আনন্দ উৎসবের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।

উৎসাহের স্ফূর্তি ভাঙিতে কেমন কেমন বোধ হইল। পরে একদিন না হয় সমস্ত বিষয়টির অনৌচিত্যটা বুঝাইয়া দিলেই হইবে। একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম, "তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে তো আমরা আরও নিশ্চিন্দি হতাম। আজ না হয় কাল তো দিতেই হবে, কিন্তু সে তো আর অল্প কথায় হয় না মা। দেখলেই তো রাণুর বিয়েতে খরচের হিড়িকটা? নিজেদের খরচ তো আছেই, তা ছাড়া তোমাদের শ্বশুরেরা তো হাঁ করেই আছেন, অল্প দিয়ে কি আর পেট ভরানো যাবে? চাই এক কাঁড়ি পয়সা।"

"তুমি উঠে বসলে কেন মেজকা? শোও না ওদিকে মুখ করে, আমি সুড়সুড়ি দিচ্ছি।"

বুঝিলাম মুখোমুখি হইয়া প্রসঙ্গটা চালাইতে পারিতেছে না। আহা, সত্যই কি এতটা বেহায়া হইতে পারে? হোক না এযুগ, হোক না সে মডার্ন।

একটু প্রসন্নভাবেই শুইয়া পাশ ফিরিলাম। বুঝিলাম, দুজনার মধ্যে একটি লঘু তন্দ্রার পর্দা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা এটা। ভালো। একটু পরে ডাক হইল, "মেজকা, ঘুমুচ্ছ?"

কৃত্রিম জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "না, বল।"

একটু থামিয়া উত্তর হইল, "পয়সা আমি যোগাড় করে রেখেছি মেজকা, তোমাদের ভাবতে হবে না।"

সর্বনাশ! আমার বিস্ময় আমায় যেন ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অর্ধশয়ানভাবে উঠিয়া পড়িলাম এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "পয়সা যোগাড় করে রেখেছিস? সেকি রে? কবে থেকে এ মতলব আঁটছিস? একটা বিয়ের খরচ যোগাড় করেছিস বলছিস, সেতো চাট্টিখানি পয়সা নয়।"

নিশ্চয় একটা মস্ত বড় বাহাদুরি ভাবিল, না হইলে এর পরে আর উত্তর দিত না। আজকালকার মেয়ে।

একটু তেরছা হইয়া বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল। তারপর ঘাড়টা ঈষৎ নীচু করিয়া বলিল, "অনে—ক আছে, অনেক দিন থেকে জমাচ্ছি।" প্রবল কৌতূহল, বলিলাম, "সত্যি নাকি? নিয়ে এসে দেখাতে পারিস? তোর কাছে, না তোর মার কাছে আছে?"

"না, আমার কাছেই আছে, আনছি।"

আহ্লাদের অবস্থাটা বুঝিতেছি, কিন্তু সাক্ষাৎদ্রষ্টা আমার তখনকার মনের

অবস্থাটা কল্পনা করিতে পারেন কি? বিশ্বাস করিতে আপনাদের বোধ হয় মনের উপর খুব একটা চাপ পড়িতেছে। কিন্তু যা হাওয়া বহিতেছে, সবই সম্ভব। আজ যাহা শুনিতেছেন, কাল যদি তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ করেন তো কিছুই আশ্চর্য হইবার নাই। গুরু-লঘু ভেদ আর ইহারা রাখিবে না, তা হা-হুতাশ করিলে আর উপায় কি?

একটু পরে মাখম রঙের একটি ছোট ক্যাশবাক্স হাজির হইল। এটা চিনি, ওর বাপের দেওয়া, মেয়েটিকে বড ভালবাসেন। অত ভালবাসা, অত আশকারারই বোধ হয় এই পরিণাম।

ডালা খুলিয়া বাকসটা সামনে ঘুরাইয়া ধরিয়া স্মিতহাস্যের সহিত আমার মুখের উপর চক্ষু তুলিয়া চাহিল, বিজয়ের আনন্দে সঙ্কোচের অবশেষটুকুও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

সত্যই। বাক্সের খোপে খোপে রুমাল, নেকডা আর কাগজের ছোট বড একরাশ মোড়ক, একটি জ্যালজ্যালে ফরসা নেকড়ার গ্রন্থির মধ্যে যেন সুস্পষ্ট গিনির থাক ঝিকমিক করিতেছে।

ভূমিকাটা এই পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, এটা আমার গল্প নয়, একটা বিজ্ঞাপন মাত্র। এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম সেটা তাহার ভূমিকা। বিজ্ঞাপনটি এই—

আমার একটি সাত বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্তমান, নাম ডলিরানী। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ, পিঠের অর্ধেক পর্যন্ত ঝাঁকডা ঝাঁকডা কেশ। এদিকে মেয়েটি খুব গোছালো, কেন না নিজের বিবাহের জন্য পাই, আধলা, পয়সায় অনে—ক-গুলি তাম্রখণ্ড সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে—একুনে সওয়া ছয় আনা। সুতরাং একেবারেই যে খালি হাতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এমন নয়। হৃদয়বান যদি কোনো বরের বাপ থাকেন তো সম্মতি জানাইলে সুখী হইব।

একটু গোল আছে আবার এর মধ্যে, সেটাও পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভালো। শুধু হৃদয় থাকিলেই চলিবে না। যত দূর বোঝা গেল, একটি সভা সাজানো শ্বশুরলাভই আপাতত ডলির বিবাহ করার প্রধান উদ্দেশ্য এবং আর সব এক রকম অবান্তর। ডলির ব্যক্তিগত ইচ্ছা, শ্বশুরের শরীরে প্রচুর মেদ এবং মাথায় খুব চকচকে একটি প্রশস্ত টাক থাকা চাই। কি করা যায়? ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তাই যদি এরূপ ত্রিগুণাত্মক—অর্থাৎ একাধারে হৃদয়, মেদ এবং টাক বান কেহ-থাকেন তো, আশা করি, অবিলম্বেই পত্রাচার আরম্ভ করিয়া বাধিত করিবেন।

বাঘ

যাহা শুনিতেছি, তাহার অর্ধেকও যদি সত্য হয় তো শুধু এখন কেন, আজ সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি বাড়ির বাহির হইতে পারিব না, সেজন্য আপনারা আমাকে কাপুরুষ, ভেতো বাঙালী—যা খুশি বলুন।

আমাদের বাড়িটা আপনারা দেখেন নাই। বাড়ির খিড়কির দিকটায় কাঠা পাঁচেক জমির উপরে একটা মাঝারি-গোছের বাগান আছে। তাহার শেষ দিকটা জাম আর জামরুল গাছের ডালপালায় বেশ একটু অন্ধকার। একটু যা খালি জায়গা ছিল, সেখানটায় আজকাল একটা বিচালির গাদা তৈয়ার করা হইয়াছে। মোটের উপর সব মিলিয়া জায়গাটা বেশ একটু ঘুপটি-গোছের হইয়া গিয়াছে, রাত্রিবেলায় গাঢ় অন্ধকারের আড্ডা। অবশ্য তার পরেই গয়লাপাড়ার ঘন বস্তি, তবু ছেলেবেলায় ওই কোণাটুকুর কথা রাত্রে ভাবিতে গেলে বরাবরই গা ছম-ছম করিত। আর, সত্য কথা বলিতে কি, এখনও না ভাবিলেই ভাল থাকি। সেইখানে খড়ের গাদার পাশে সন্ধ্যার পর হইতে একটা বাঘ আসিয়া বসিয়া আছে। গোবাঘা না, চিতাও নয়, একটা জাত বাঘ, কিছু নয় তো হাত ছয়েক লম্বা, কাঁচা সোনার মত হলদে রঙের উপর হাত খানেক করিয়া লম্বা এক-একটা কালো ডোরা, ইয়া ঘোরালো মুখ, এক-একটা গোঁফ যেন এক-একটা সজারুর কাঁটা। সামনের দুইটি থাবা ছড়াইয়া ঘাড় উঁচাইয়া বসিয়া আছে, পেটের ঢিলেঢালা মাংস হাত পাঁচ-ছয়ের একটা গোল জায়গার উপর ছড়াইয়া আছে। বেশ বোঝা যায়, আস্ত একটা মহিষ হইলে, ওই পেটের কতকটা ভরিতে পারে।

তবে বাঘ যে নিতান্ত উপোস করিয়া আছে এমন নয়, একটু জলখাবার সারিয়া লইয়াছে। জেওলগাছের বেড়া ডিঙাইয়া আমাদের বাগানে পড়িবার আগে, বুধনী গয়লানীর যে কচি মেয়েটা অষ্টপ্রহর ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া পাড়া মাথায় করিত, সেটাকে জিবে করিয়া তুলিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে—বুধনী মেয়েটাকে বাহিরের দাওয়ায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের পাট সারিতেছিল। মেয়েটার গায়ে দাঁত বসে নাই, সেই জন্য বোধ হয়, পেটে গিয়াও ট্যাঁ-ট্যাঁ করিতেছিল, বাঘটা জালাতন হইয়া সেইখান হইতে একটা লাফ দিয়া হরুনী ঝাহাতোর বাড়িতে পড়ে। হরুনীর বুড়ো বাপ বাহিরে বসিয়া ভজন করিতেছিল। শুধু মাংস খাইয়া বাঘের একটু হাড় চিবাইবার ইচ্ছা হয়। হরুনীর বাপের ঘাড়টা ধরিয়া দুইটা ঝাঁকানি দিয়া পিঠের

উপর ফেলিয়া এক লাফে আমাদের বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

টের পাওয়া যাইত না; ওদিকে গয়লা-পাড়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর সন্ধ্যার পর আমাদের বাগানের দিকেও বড় একটা যায় না কেহ। ধপাং করিয়া একটা শব্দ হয় বটে, কিন্তু সেটা যে বাঘ-পড়ারই শব্দ, লোকে কি করিয়া জানিবে? বাঘ তো আর রোজই দুই-দশটা করিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছে না। একটা কলাগাছ নুইয়া গিয়াছিল, সবাই ভাবিল, বোধ হয় সেইটিই ভূমিসাৎ হইয়াছে। নিশ্চিন্ত আছে, এমন সময় কড়-কড-কড় কড়াৎ! সে এক বিকট আওয়াজ—যেমন বিনা ঝড়ে গাছ পড়া, তেমনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

পরে টের পাওয়া গেল, বাজপড়া নয়—বাঘটা হরুনীর বুড়ো বাপকে দুই থাবা দিয়া মুড়িয়া-সুড়িয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দাঁতের একটা চাপ দিয়াছিল, সমস্ত হাড়-গুলো একসঙ্গে চুর হইয়া যাওয়ায় ওই রকম বিকট আওয়াজ হইয়াছে। আশি বছরের বুড়ো হরুনীর বাপ, সোজা কথা নয় তো, হাড়ের পরিপক্বতা দেখিতে গেলে একেবারে দধীচি হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু শব্দের রহস্য ভেদ করিতে যাইয়াই কাল হইল। বাগানের এদিকটায় আমাদের মালী মহিষটাকে জাবনা দিতেছিল, খড়ের গাদার কাছে হঠাৎ এ কি বিপরীত শব্দ! হাতের জাবনা মুছিতে মুছিতে দেখিতে যাইবে—দেখে, অন্ধকারের মধ্যে ঠিক খড়ের পাছটিতে দাউ দাউ করিয়া আগুনের ভাঁটা জ্বলিতেছে। বেচারা আর ভাবিতেও সময় পায় নাই, ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহিষের জন্য তোলা বালতিসুদ্ধ সমস্ত লইয়া গিয়া একেবারে বাঘের মাথায়। যখন হুঁশ হইল, আগুন নয়—বাঘের চোখ, তখন মালীর চোখ ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে—ব্যাঘ্ররাজের একটি থাবায়। বাঘের গলায় তখন হরুনীর বাপের উরুর হাডটা ফুটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সে বেচারী বোধ হয় সারসের সন্ধানে জলার দিকে পা বাড়াইয়াছিল,—চুকিয়া যাইত সব ল্যাঠা, এমন সময় ওই নূতন উপদ্রব! সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের উপর থাবাটি বসাইয়া একটি চাপ।

ব্যাপারটা আপাতত এইখানেই শেষ হইত। বাগানের এক পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যে এত বড় একটা কাণ্ড হইতেছে, কে কি করিয়া জানিবে? বড়রা নিজেদের গুলগুজব লইয়া আছে, ছেলেমেয়েরা নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আছে, কুচোরা নিজেদের হুল্লোড় লইয়া আছে। হয় সকালবেলায় ব্যাপারটা সবার জানাজানি হইত; কিংবা বাঘ যদি সব নিশ্চিহ্ন করিয়া রাতারাতি সরিয়া পড়িত তো তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। জানাজানি করাইয়া দিল মহিষটা। মালীর নিজের

ছিল, জাবনাটি ঠিক তৈয়ারী করিয়া মহিষটাকে এই খোঁটায় আনিয়া বাঁধিয়া দিত। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটাকে খুলিয়া দিত। বাছুরটাকে একটু পিয়াইয়া মালী দুধ দুহিতে আরম্ভ করিত। এদিকে মহিষ জাবনা খাইয়া যাইত।

তৈয়ারী জাবনার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বাহির হইয়াছে, অথচ খাইতে পাইতেছে না। মহিষটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু গুজরাটি মহিষ; এ দেশের দড়িকে মনে করে সূতা, খোঁটাকে মনে করে একটা কুটা, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে চুপ-চাপ করিয়া বাঁধা থাকে। যখন নিতান্ত আর সহ্য করিতে পারিল না, দিল মাথার একটা ঝাঁকানি। একটা ঘাসের শিকড় টানিলে যেমন নিরুপদ্রবে উঠিয়া আসে, খুঁটিটা সেই রকম ভাবে উঠিয়া আসিল। মহিষ হাঁস হাঁস করিয়া সমস্ত জাবনাটা সাবাড় করিল, তারপর বাছুরটার কাছে গিয়া তাহাকে সমস্ত দুধটা খাওয়াইয়া দিল; এখানকার মহিষ তো নয়,—এক দোহনে পাক্কা সাত সের দুধ দেয়।

বাচ্চাকে খাওয়াইয়া তখন তাহার মালীকে মনে পড়িল। মালীকেও মনে পড়িতে পারে কিংবা জলতৃষ্ণাও পাইতে পারে, মহিষের মনের কথা কে বলিবে? মালীটা জলের বালতি লইয়া যেদিকে গিয়াছিল, জাবনাভরা পেটটা দুলাইতে দুলাইতে, জাবর কাটিতে কাটিতে মন্থর গতিতে সেই দিকে অগ্রসর হইল। যেন ওপাড়ার খুলোপিসী নেমন্তন্ন খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে টহল দিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর দুই-পা গিয়াই ওই দৃশ্য।

গুজরাটি মহিষ, তায় নূতন বাচ্চা হইয়াছে, বাঘ দেখিয়া রাগে একেবারে কয়লার আগুনের মত গনগন করিয়া উঠিল। বাঘের চোখের আর কি জ্বলন! মহিষের চোখ জ্বলিতে লাগিল যেন মোটরগাড়ির দুটো হেডলাইট; তিনটা করিয়া পাক দেওয়া সিং একেবারে সোজা হইয়া উঠিল, যেন দুইটি বর্শা—লক্ষ্য বাঘের জ্বলন্ত চোখ দুইটি। মাথা গুঁজিয়া, ক্ষুর দিয়া এক আঁচড়ে এক এক কোদাল মাটি চাছিয়া পিছনে ফেলে আর গোঁ-গোঁ শব্দ। যেন সেদিনকার মত ঈশান কোণে কালবৈশাখী ঝড় উঠিয়াছে।

বাঘের চোখে পলক পড়ে না, ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, পেটের মধ্যে বুধনীর মেয়ের চিঁ-চিঁ শব্দটুকু পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হরুনীর বাপকে চিবাইতেছিল; —একে এমনই শুকনো হাড়ের গাদা, তায় যা একটু-আধটু রস ছিল, ভয়ে গলা শুকাইয়া সব একেবারে ছাতু হইয়া গিয়াছে। গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, তবুও মহিষের পানে চাহিয়া কোন রকমে ভয়ে কাঁপা গলায় বলিল, লম্বা লম্বা শিং তোমার—

বড় বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে।

শুইয়া শুইয়া পাশের ঘরের পানে চাহিয়া বলিলাম, "রাণু, বড্ড ভুল করছ মা। কচি ছেলে ওকে এখন অত উৎকট ভয়ের গল্প শুনিও না। তোমাকে আমি দেখিয়ে দোব বইয়ে যে, ওতে ওদের মনে কি ভীষণ চাপ পড়ে। বাঘটাকেই যথেষ্ট উগ্র করেছিলে, তার ওপর তুমি আবার মোষটাকে যেমন দাঁড় করাতে চাইছ, তাতে—"

রাণু ক্লান্তি ও বিরক্তিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, আমার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল, "ভয়! দেখে যাও মেজকা, এততেও ও দজ্জালের চোখে একটু ভয় আছে কিনা! আর এর বেশি আমার মাথায় আসেও না বাপু। তুমি বইয়ের কথা বলছ! ওই শোন, আবদার উঠেছে, বাঘ আর মোষের লড়াই দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। আমি পেরে উঠব না ও ছেলেকে মেজকা, সামলাও তোমার নাতি, আমার রাজ্যির পাট প'ড়ে আছে—"

দাসী

মস্ত বড় দোতলা বাড়ী। বাহিরের মহলটা আলাদা। ভিতরে দুইটি মহল, রান্নাবাড়িটা ধরিলে তিনটি। বাড়ির এক কোণ থেকে ডাক দিলে অন্য কোণে সব সময় আওয়াজ পহুঁছায় না।

এত বড় বাড়িটাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে দুইটি শিশুতে। কেমন ধারা একটু শোনায় বটে, প্রশ্ন ওঠে, তবে আর সবাই গেল কোথায়?

আর সবাই সংসারটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যস্ত—আজকের সংসার আবার ভবিষ্যতের সংসারও। ঠাকুরমা, দিদিমা, মাসি পিসীতে অনেকগুলি বৃদ্ধা,—তাঁহারা পুষ্পে নৈবেদ্যে ঠাকুরদের তুষ্ট করেন,—"তোমরাও খাও দাও ঠাকুর, এদেরও খাওয়াদাওয়ার দিকে একটু নজর রেখো।" যাঁরা গিন্নীর দলের তাঁহাদের তো উদয়াস্ত দম লইবার অবসর থাকে না; খাবার দিকে নজর রাখা, আফিস-ইস্কুলের ব্যবস্থায় যেন এত-টুকু না গাফিলতি হয়, আরও সব নানাখানা; এঁদের পরে যাঁরা, তাঁদের [illegible]

ফাই-ফরমাস খাটিতে খাটিতে দম বন্ধ হইয়া আসে, পূজার চন্দন ঘষা থেকে পান সাজা, স্কুলগামী ছোট দলের খোওয়ান মোছান জামাকাপড় পরান পর্যন্ত।—অর্থাৎ সংসারের বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। কর্তারা সংসার বাঁচাইয়া রাখার একেবারে গোড়ার ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত—একটু ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত থাকে না। বৈকালে হয়তো একটু ক্লাব, সেখানেও উদ্দেশ্য ঐ একই—অর্থাৎ সংসারটিকে জিয়াইয়া রাখা। তাহার জন্য নিজের প্রাণশক্তিকে অটুট রাখিতে হইবে তো?—তাই ক্লাব অথবা অন্যভাবে একটু চিত্তবিনোদন।

কিন্তু সংসার বাঁচাইয়া রাখা আর বাড়ি বাঁচাইয়া রাখা এক কথা নয়। বিধাতা-পুরুষ যে মন্ত্রে বাড়ি বাঁচাইয়া রাখেন সে মন্ত্রের সঙ্গীত একটু অন্য ধরণের। তাহার জন্য বাছিয়া লন শিশুর কণ্ঠ। এ বাড়িতে আছে মিটু আর তুলতুল, বয়স আড়াই থেকে তিনের মধ্যে, তুলতুলটি মেয়ে, সেই ছোট।

সত্যই তুলতুল, এত নরম যে চলা ফেরার মধ্যে কেন এলাইয়া পড়ে না, সেইটাই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। যেখানেই হাত দাও—কাঁধে, হাতে, পিঠে, গালদুটিতে, আঙুলগুলি যেন খানিকটা মাখনের তালে বসিয়া যায়। চোখ দুটি স্বপ্নালু, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া এক মাথা কালো কুচকুচে চুল—রেশমের মতো ·লিকা আর মসৃণ। পাতলা ঠোঁট দুটি যখন নড়ে, মনে হয় ঐটুকুতেই যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িবে। স্বভাবটিও বড্ড নরম, কিন্তু মিটুর সংসর্গে নরম থাকা দিন-দিনই নাকি কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

মিটুটি অতিরিক্ত দুষ্ট, চঞ্চল আর ধূর্ত। কথাগুলার একটুও জড়তা নাই; মনে হয় পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে কথা কহিতেছে। কথার বাঁধুনির বিষয় যদি ধরা হয় তো যে কোন বয়সের লোকের মুখেই বেশ মানায়। কিছু বলিলে বুড়োদের মতো ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করিয়া চোখে চোখ রাখিয়া শোনে, একটু ভাবে, তাহার পর উত্তর দেয়।

বারান্দায় ওদিককার ঘরে প্রবল উৎসাহে মাতামাতি করিতেছে। একটু কড়া গলাযই ডাকিলাম, "মিটু, একবার এদিকে আসতে হবে।"

এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে অপরিচিত না হইলেও অনেকটা নূতন আমি মিটুর পক্ষে। উহাদের লইয়া যাইবার জন্য উহাদের মামার বাড়ি আসিয়াছি। মিটু দাপাদাপি স্থগিত রাখিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া গেল। মা আর ভাইদের কাছে শুনিয়াছে আমি নাকি একটু কড়া প্রকৃতির মানুষ; ডান হাতের চারিটি আঙুল দাঁতে চাপিয়া আমার পানে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন মেজকাকা, একটা কথা বলবে?"

অর্থাৎ সামান্য কোন একটা কথাই তো?—মারধোর করিবার উদ্দেশ্যে নয়? তাহা হইলে সে দূর হইতে আপন পথ দেখে। দাদুরা আছেন, দিদিমারা আছেন, মামার বাড়িতে নিরাপদ স্থানের অভাব নাই।

ছেলেটি ইংরাজীতে যাহাকে বলে প্রডিজি, তাই; অবশ্য দুষ্টামির দিক দিয়া; ওর সাহচর্যে তুলতুল যদি কাঠিন্য লাভ করে তো তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

তুটির সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইল সকালে জলখাবারের সময়। কুটুম-বাড়ির আয়োজন—ডিসে প্লেটে সাজানো ফল, মিষ্টান্ন, টোস্ট, কেক্, ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। মিটুর দিদিমা সামনে একটি কোচে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়, এই যে কিছু ফেলিয়া না রাখিয়া গল্পের ফাঁকে ফাঁকে একটি করিয়া সমস্তগুলির সদ্‌ব্যবহার করি।

বেশ একটু অস্বস্তিজনক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। গল্পের মধ্যেই অনুরোধ উপরোধও আসিয়া পড়িতে লাগিল; একটি রাখিতে হইল, একটি কাটাইলাম, তৃতীয়টি লইয়া টানাটানি চলিতেছে এমন সময় ওঁর একটা জরুরী তলব আসিল। সমস্তগুলি শেষ করিবার একটা পাইকারি হুকুম রাখিয়া উনি উঠিয়া গেলেন।

একে লড়াইয়েব বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, সামান্য যা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ফেলিয়া রাখিলে তিনি শুনিবেন না। বলিযা গেলেন কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেছেন।

বলিলাম, "তাহলে এমন কাউকে পাঠিয়ে দেবেন মা, যিনি এই এতগুলো জিনিষকে কিছু পাওয়া গেল না বলে না ধরেন।"

"না বাবা, বাজে কথা শোনা হবে না" বলিয়া চলিয়া গেলেন। উনি যাইবার একটু পরে পিছনে শিশুকণ্ঠে অল্প একটু গলা খাঁখারি দেওয়ার শব্দ হইল, ফিরিয়া দেখি পিছনে চৌকাঠে দাঁড়াইয়া মিটু। একবার দেখাটা হইয়া যাইতে চক্ষুলজ্জাটা ভাঙিয়া গেল বোধ হয়, আসিয়া সোফার পিছনটিতে দাঁড়াইল।

আর এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে প্রশ্ন করিলাম, "কি মনে করে?" খাবার-গুলির দিকে চাহিয়া ছিল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বলিল, "এমনি"।

বড়দের মতো এই কথাটি খুব রপ্ত করিয়া রাখিয়াছে মিটু। সর্বদাই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য লইয়া থাকে বলিয়া ঐ কথাটি দিয়া অনাসক্তির ভাবটা ফুটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে; ওর সঙ্গে একটু বেপরোয়া ভাব মিশাইবার অভিপ্রায় হইলে বলে "এমনি, ইচ্ছে।"

একটি কেক্ ভাঙিয়া মুখে দিলাম, নিজের মনেই বলিলাম, "বাঃ চমৎকার কেকটি দিয়েছে তো, কী মিষ্টি।"

মিটু একবার আড়চোখে কেকটির পানে চাহিল, আর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। প্রথম গ্রাসটি শেষ করিয়া আবার তুলিয়াছি কেকটা—মিটু প্রশ্ন করিল, "মেজকাকা, বাড়িতে কে কে আছে? আছেন বলতে হয়, না?"

বলিলাম, "হ্যাঁ। তোমার দাদু আছেন, জেঠামশাইরা আছেন, জেঠাইমারা, কাকারা, খুড়িমারা, দাদারা, দিদিরা।"

মিটু বলিল, "জানো মেজকাকা? তুলতুল বড্ড হ্যাংলা, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।"

বাড়িতে পাঁচ-ছয়টি হ্যাংলা পরিবৃত হইয়া আহার করা অভ্যাস, মিটুর দিদিমা বর্তমানে সেই অভাবটাই এতক্ষণ সব চেয়ে অনুভব করিতেছিলাম। যাই হোক্ একটিকে পাওয়া গেছে। আপাততঃ তাহারই লোভটুকু ভালো করিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আহা, ও ছেলেমানুষ কিনা, ছেলেমানুষ একটু হ্যাংলা হয়। তুমি তো বড় হয়ে গেছ মিটু, না?"

কোন উত্তর পাইলাম না, মিটু চারিটি আঙুল মুখে পুরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

একখানি চায়ের রেকাবিতে একটু কেক, দুইখানা বিস্কুট, কিছু কমলা নেবুর কোয়া, একটি সন্দেশ, একটা রসগোল্লা আলাদা করিয়া রাখিলাম। মিটু স্থির লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বলিলাম, "যাও, ডেকে নিয়ে এস তুলতুলকে এবার। আহা, ছেলেমানুষ একটু হ্যাংলা হবে না? ও তো আর মিটুর মতন বড হয় নি, হবে না হ্যাংলা একটু? যাও ডেকে নিয়ে এস।"

মিটু ভ্রূ দুইটা চাপিয়াই পরম অভিনিবেশের সহিত আমার কথাগুলো শুনিতেছিল। বেশ দেখিতেছি, ওর মনের গভীরে একটি আলাদা চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। যাইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না,—সোফাটার পিঠ ধরিয়া বার দুয়েক একটু দোল খাইল, বার দুয়েক তুলতুলের রেকাবিটার পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "আমিও তো বড় হইনি।"

আমি কপালে ভ্রূ তুলিয়া বলিলাম, "সেকি কথা, তুমি বড হওনি? মস্ত বড় হয়েছ যে, তুলতুলের চেয়ে বড়, খোকার দাদা। খোকা যেই ভাত খেতে শিখবে, 'দাদা দাদা' বলে কোলে উঠবে তোমার।"

বেচারা একটু প্রবঞ্চিত হইল। বড হওয়ার গুমরে আরও বার দুয়েক দোল খাইয়া বলিল, "খোকা ঝিনুকে দুধ খায়, ন্যাংটো। আমি তো প্যাণ্ট পরি। খোকা

তো খোকা, আমি তো মিটুবাবু।"

বলিলাম, "তা বইকি। আর খোকা তো হ্যাংলা, মাটি খায়। যাও ডেকে আনো তুলতুলকে।"

মিটু পিছনের দুয়ারের দিকে চাহিল, ঘুরিয়া দেখি তাহার দিদিমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে তুলতুল কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাকিলাম, "এই যে এস তুলতুল, কখন থেকে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছি।" তুলতুল একবার পিছন দিকে চাহিল, ঘুরিয়া খাবারের পানে চাহিল, তাহাব পর ঠোঁট ফুলাইয়া ট, ঠ, ড—এই রকম গোছের কতকগুলো অক্ষর সংযোগে এক অদ্ভুত উচ্চারণে কি একটা বলিল। মিটুর যেমন পরিষ্কার, এর গুলা তেমনি অস্পষ্ট, একেবারেই জিবের আড় ভাঙ্গে নাই। লোকে যে টপ্ করিয়া ধরিতে পারে না এটা নিশ্চয় মিটুর জানা; বুঝাইয়া দিল, "বলছে, ও হ্যাংলামি করবে না।"

তুলতুলের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "না তুমি এস, হ্যাংলামি হবে না। তোমার জন্যে তো খাবার রয়েছে; আলাদা থাকলে হ্যাংলামি হয় না, এস তো।" তুলতুল একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া প্রবেশ করিল, তবে আমার কাছে না আসিয়া পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল। দুয়ারের দিকে আবও একবার চাহিয়া লইয়া খাবারের উপর ঢুলঢুলে লুব্ধ চোখ দুইটি রাখিয়া স্বকীয় উচ্চাবণে আবার কি বলিল, এবার একটু বেশী।

মিটু বুঝাইয়া দিল। খাবারের দিকে একবাব চাহিয়া লইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "বলছে শুধু বড জেটুর কাছে হ্যাংলামি করব। বড় জেটু বকেন না।"

হ্যাংলামি কথাটা তাহা হইলে তত আপত্তিজনক নয় তুলতুলের কাছে, যদিও মিটু অর্থটা অনেকখানি বোঝে। জিনিসটা যে দোষের সেদিকে না গিয়া বলিলাম, "আমিও বকব না, বড় জেটুর চেয়ে আমি বেশী ভালোবাসি হ্যাংলাদের। বড্ড ভালবাসি, এই দেখ না আলাদা করে খাবার রেখে দিয়েছি। কেউ যদি বকে তোমায়, তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করব, মিটু যদি তাড়িয়ে দিতে যায় ওকে মারব।"

তুলতুল একবার আড়চোখে মিটুর পানে চাহিয়া লইয়া পায়রার মতো গলা নাচাইয়া কি বলিল, মিটু একটু টানিয়া উত্তর দিল, "হোস নে, আমি তো বলিও না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি?"

মিটু বলিল, "বলচে, মিটুর মাসী হব না! আমি তো ডাকিও না মাসী বলে।"

বলিলাম, "আচ্ছা, মাসী বোনপোর বোঝাপড়া পরে হবে। তুমি এস তো খেতে।"

নিজেই উঠিলাম, সঙ্গে করিয়া আনিয়া বেকাবির সামনে বসাইয়া বলিলাম, "খাও। তুলতুল বড্ড লক্ষ্মী। ও তো কারুর কাছে হ্যাংলামি করে না, শুধু বড় জেটুর কাছে আর আমার কাছে করে। ওবেলা আবার খাবার খাব, তুলতুল এসে খাবে। কমলা নেবুটা কী চমৎকার মিষ্টি, না তুলতুল?"

তুলতুল মাথাটা দোলাইয়া কি বলিল; আমি টীকার জন্য মিটুর পানে চাহিতে মিটু ঠোঁট-তুইটা জড়ো করিয়া বলিল, "আর বলব না, যাও।"

আহার্যের প্রশংসায় আরও একটু রং চড়াইলাম, সাক্ষী পাইয়া স্থবিধাও হইয়াছে। মিটু পিছন থেকে সামনে আসিয়া সোফাটায় হাত পা ছড়াইয়া বসিল। একবার শুইয়া পড়িল, একবার শোফার উপর ডিগবাজি খাইবার চেষ্টা করিয়া নির্লিপ্ত ভাবটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর হঠাৎ একবার সোজা হইয়া বসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন কবিল, "মেজ কাকা, তুমি হ্যাংলা মেয়েদের ভালোবাস?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, খুব।"

"ছেলেদেব?" ভ্রূ নামাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

ভাইপোর ওকালতি বুদ্ধিতে পেটে হাসি সুড-সুড করিয়া উঠিতেছে। গম্ভীরভাবে অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হুঁ, বাসি। তবে বড ছেলেদের নয়!"

মিটু তাহার পরাভবের ভাবটা শোফায় মাখাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, আর পারিতেছে না বেচাবা।

নিষ্ঠুর খেলায় আমারও মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, ভাবিতেছি ডাকিয়া লইব, এমন সময় মিটু ডিগবাজি দেওয়ার জন্য মাথাটা গুঁজিয়া উল্টা চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "মেজকাকা, কানে কানে একটা কথা শুনবে?"

উল্টা দৃষ্টিতে লজ্জাটা বোধ হয় একটু আড়ালে পড়িয়া যাইতেছে। বলিলাম, "শুনব, কথাটা কি?"

"কাউকে বলবে না? —কারুকে—কারুকে নয়? তুলতুলকেও না?"

তুলতুল বিস্কুট চিবাইতেছিল, বোধহয় শুনিবার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য মুখটা ভার করিয়া বলিল, "আমি টো টোর মাটি ওই।"

"ইস্ মাসী!" বলিয়া মিটু সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া আসিয়া আমার কানে মুখ দিয়া বলিল, "আমি তো কচি ছেলে মেজকাকা, বড় নয়তো।"

'হ্যাংলা' কথাটা উহ্য রাখিল। ঐটুকু মেজকাকা কি বুঝিয়া লইতে পারিবে না? এতটা বড হইয়াছে কি করিতে? অর্থাৎ, মিটু হার মানিতেছে, তবে যতটা

সম্ভব মর্যাদা বজায় রাখিয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ে একটু গোল বাধিল।

মিটুকে একটা রেকাবিতে করিয়া খাবারগুলা সাজাইয়া ডাকিতেই তুলতুল হাত গুটাইয়া মুখটি তোলা হাঁড়ি করিয়া বসিল।

একটু ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি হল ?—তোমার আবার কি হল, তুলতুল ?"

সামান্য একটু মাথা নাড়ার সঙ্গে উত্তর হইল—"আমি ঠাবুই না, ডেকোটো !"

ওর আবার 'দেখোতো' কথাটা প্রয়োজনের গুরুত্বে ব্যবহার করা অভ্যাস।

প্রশ্ন করিলাম, "কেন খাবে না ? বেশ তো দুজনে হলে···" আবদারের কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি টো মাটী ওই।"

বলিলাম, "তা হও বই কি, তাই তো বলছি—দিব্যি মাসী বোনপোতে······" তুলতুল অভিমানের স্বরে গর গর করিয়া খানিকটা কি বলিয়া গেল, একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

অনেক তপস্যায় পাওয়া খাবার, অনেক পিছাইয়াও আছে, আবার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেও দেরী না হইতে পাবে, মিটু খুব তাড়াতাড়ি হাতমুখ চালাইতে শুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘুরিয়া একবার তুলতুলের পানে চাহিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "ই—স্ !" তাহার পর আমার প্লেটের রাজভোগ দুইটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "দিদিমণি আবার আসবেন, মেজকাকা ?"

ভবিষ্যতের দিকেও নজর আছে। বলিলাম, "না। তুলতুল কি বললে রে মিটু ?"

মিটু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কখনও মাসী বলব না, বলবই না।

তুলতুল মুখটা আরও অন্ধকার করিয়া বলিল, "আমি ঠাবুই না, ডেকোটো।"

মিটু ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া বলিল, "বয়ে গেল।" একবার তুলতুলের রেকাবির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "আমি খাব'খন, অ্যাঁ মেজকাকা ?"

বলিলাম, "তা খাস্, মা মাসীর পাতের পেসাদ খেতে হয়।" মিটু ভ্রূ দুইটি খুব চাপিয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া লইল একটু, তাহার পরে নিঃশব্দে নিজের রেকাবিতে মনঃসংযোগ করিল। কথার মধ্যে কিছু মারপ্যাঁচের গন্ধ পাইলে ও এইরকম করে, পরে ঐ যে নিঃশব্দে আহার বা দোলা বা ডিগবাজী খাওয়া, ঐ সময়টা ভাবিয়া লয় ও একটা কাটান ঠিক করিয়া ফেলে। একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "মাসীরা তো কাপড় পরে মেজকাকা, তা জান না বুঝি ?" আবার ইঙ্গিতে বোকা বানায়। বলিলাম, "এখন ছোট তাই ইজের আর পেনি

পরে আছে। বড় হলে পরবে কাপড়।"

আবার একটু নিঃশব্দে আহার; তাহার পর একটা কমলা নেবুর কোয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "বড় হ'লে বলব মাসী।"

রাগিয়া বলিলাম, "বড় বেয়াড়া তো তুই! আচ্ছা, ও মাসী না বললে আমি গিন্নী বলে ডাকব তোমায় তুলতুল, তুমি খাও।"

তুলতুল গলাটা দুলাইয়া বলিল, "আমি টো ডিন্নী নয়, আমি টো মাটী ওই।"

আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! এমনি তো দুটি প্রজাপতির মতো বেশ উড়িয়া ফিরিয়া সমস্ত বাড়িটা এক করিয়া বেড়াইতেছে দুজনে, একরত্তি আলাদা নয়। আমার এখানে আসিয়াই একি এক আদাড়ে জিদ ধরিয়া বসিল!

বলিলাম, "মাটিরা ডিন্নীও হয়, সে বরং আরও ভালো, খুব আদর করব, ক—ত্তো জিনিষ দোব।"

নড়চড় নাই, মানময়ী গৃহিণীর মতোই মুখ ভার করিয়া, অল্প একটু ঘুরাইয়া, বসিয়া আছে। বলিলাম, "শুনচ তুলতুল? খাও। অনেক খাবার দোব, অনেক!"

আদায়েব স্বরেই ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "টাপোড্ডেবে?"

বুঝিতে না পারিয়া মিটুর পানে চাহিতে মিটু প্রশ্নটারই দ্বিরুক্তি করিল, "কাপড় দেবে?"

এতক্ষণ কোনরকমে চাপিয়া ছিলাম, একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ আবার মিটুর চেয়েও সেয়ানা। এক সঙ্গেই গৃহিণীত্ব আর মাসীত্বের ব্যবস্থা করিয়া লইতে চায় সে। গৃহিণী-রূপে কাপড় আদায়, তাহার পর সেটা পরিয়া মাসী হইয়া বসা। বলিলাম, "যা সম্বন্ধ দাঁড়ালো, কাপড় তো দেওয়ারই কথা তুলতুল। কিন্তু বাজারে তো পাওয়া যাবে না, আর একটু বড় হও। নাও, এবার খাও দিকিন।"

মুখটা শুধু আর একটু ঘুরিয়া গেল।

বোধ হয়, আমার হঠাৎ হাসিয়া ওঠাতেই মিটুর দিদিমা দুয়ারের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাগের ভান করিয়া বলিলেন, "ওমা একি কাণ্ড! একটু সরেছি আর দুটোতে এসে ভাগ বসাতে আরম্ভ করেছে? একে কিচ্ছু পাওয়া যায় না।"

মিটু হাত গুটাইয়া লইল, হঠাৎ এরকম হাতে নাতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় বুদ্ধি খুলিতেছে না। এদিকে একে অভিমান ছিলই, তাহার উপর এই গঞ্জনার সূচনা, তুলতুলের ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনাকে একটু সরে যেতে হবে, মা। যা সমস্যা

নিয়ে পড়েছি তাতে যদি দুটো খাবারের ওপর দিয়েই রেহাই পাই তো বুঝব......"

আগাইয়া আসিলেন, একটু হাসিয়াই বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি ? পাত থেকে খাবার তুলে দিতে হবে, আবার সমস্যাও ? এসে জুটল কোন দিক দিয়ে ? নাও খেয়ে নাও দখল যখন করেই বসেছ..."। বলিলাম, "ওকে মিটু মাসী না বললে খাবে না।"

"সেই মাসী বোনপোর ব্যাপার ? ও সমস্যা আজ পর্যন্ত কেউ মেটাতে পারলে না তো তুমি একদিনের জন্যে এসে কোথা থেকে পারবে বাপু ? কম শয়তান তোমাদের ঐ বাঁটকুলটি ? এতটুকু দেখালে কি হয় ? কাপড় না পরলে কোনমতে মাসী বলবে না। সমস্ত বাড়ি একদিকে ও একদিকে। এখন অতটুকু মেয়ের কাপড় কোথায় পায় বল দিকিন লোকে ?"

মিটুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "বল্ না মাসী একবারটি না হয়, মেজকাকা বলছেন। না বললে তুমি ওকে নিয়ে যেও না, এইখানে ফেলে রেখে যেয়ো, জব্দ হবে।"

বলিলাম, "হ্যাঁ তাই যাব। ওর বদলে বরং তুলতুলকে নিয়ে যাব। তুমি খাও তুলতুল, লক্ষীটি। সেখানে মাসী বলবার কত লোক আছে—গোপাল, মণ্টু, ছবি, গৌরী, মৈয়া, কোঁদন, আরও কত্তো সব—তুমি উত্তর দিয়ে উঠতেই পারবে না। নাও, থাকবে মিটে এখানে একলা পড়ে।"

রসগোল্লাটি তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলাম। তুলতুল মুখটি ঘুরাইয়া বিড়বিড় করিয়া কি একটু বলিল। মিটুর দিদিমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "শোন, শুনলে তো ?"

বলিলাম, "ধরতে পারলাম না তো।"

"বলছে, মিটুও সেখানে যাবে, মাসী বলবে। ওকে যদি একশোটা ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে মাসী বলে ডাকতে থাকে, তবু মিটু না ডাকলে সে সব কিছু নয় ওর কাছে। কাকে রেখে কাকে বুঝবে বল ? ও-ও কি কম দজ্জাল মেয়ে ? মিটুকে ঘাড় ধরে মাসী বলাবে তবে ওর সোয়াস্তি।"

আর একটু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল, কন্যার আজই যাত্রার দিন, তাঁহার দম লইবার অবসর নাই। আমার এমন কিছু তাড়া নাই, ওদের সমস্যা লইয়াই আরও কাটাইলাম খানিকটা, এবং অবশেষে আধাআধি একটা সমাধানও হইল; বলিলাম, "বেশ, আজ বাজার থেকে তোমার কাপড় এনে দোব তুলতুল, তুমি খাও। আজই এনে দোব ঝকমকে শাড়ি। এইবার বল্ মাসী মিটু।"

মিটু সন্তর্পণে একটা কামড় দিয়া একটু গলা দোলাইয়া ওর বুড়ুটে ভাষায় বলিল,

"কাপড় পরব না, তাড়াতাড়ি কিসের ?"

আধাআধি সমাধান এইজন্য বলিতেছি যে তুলতুল শেষ পর্যন্ত খাবার খাইল। অবশ্য শুধু ঝকমকে শাড়ির লোভ দেখাইয়া ফল হইল না, তাহার সঙ্গে একটু ঝাল মসলা মিশাইতে হইল, মিটু ভয়ঙ্কর বদমাইস, মিটুকে সেখানে লইয়া গিয়া বেত মারিয়া মাসী বলাইতে হইবে—সেখানে তো দাদুও নাই যে বাঁচাইবে। মিটু সবটা খাইয়া ফেলিল, তুলতুল তাড়াতাড়ি না খাইয়া ফেলিলে ওর ভাগটাও কাড়িয়া খাইবে—এখানে কিছু বলা যাইবে না কিনা, দাদু দিদিমা দুজনেই রহিয়াছেন যে—

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে একটি অতি সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা থাকে—শিশুদের লইয়া জীবনের যে অংশটি, তাহাতে। এত সূক্ষ্ম যে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না ; ওদের ভুলাইয়া-ভালাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ভাঙ্গিয়া আমাদের যাত্রার পথ মসৃণ করিয়া লই। বোধ হয় ভাবি এত ছোট সমাচারগুলো ভগবানের কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছায়ই, কেননা এক এক সময় এক একটি এমন ধাক্কা আসিয়া বুকে লাগে যে সে আর ভোলা যায়না।

শিশু যে ভগবানের একেবারে বুকের কাছে থাকে, এ কথা আমরা ভুলিয়া বসিয়া থাকি।

তুলতুলের শাড়ির কথা এমন কিছু বড় কথা নয় যে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। আহার শেষ করিয়া দুটিতে মাসী বোনপোর আড়াআড়ি ভুলিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া আবার সমস্ত বাড়িটা পূর্ণ করিয়া তুলিল। কোথাও ভাঙ্গা, কোথাও গড়া—ওদের নিজ প্রথায়—কোথাও বকুনি, কোথাও আদর ; যদি একটু নীরবতা তো কণ্ঠ-কাকলী পরমুহূর্তে দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে বিরাট দেউড়ির দেয়ালে দেয়ালে আঘাত হানিয়া ওঠে।

আমি একটু ঘোরাঘুরি করিলাম, খানিকটা গল্পে মাতিলাম, দরকারী আলোচনাও করিলাম। আজই বৈকালে যাইতে হইবে এতগুলি লোককে লইয়া। গাড়িতে যাওয়া, যা অবস্থা আজকাল।

ওরই মধ্যে তুলতুল আসিয়া একবার হাঁটুটা জড়াইয়া গলা তুলিয়া আবদারের সুরে বলিল, "আমাট্টাপোর আনটে অবে, আমি মাটি অবো।"

বলিলাম, "নিশ্চয় আনব বৈকি।"

আবার ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি ডিন্নী ওই।"

আমাদের নূতন-পাতা সম্বন্ধটা লইয়া বোধহয় বাড়িতে একটা আলোচনা হইয়াছে, মিটুর মারফত খবরটা প্রচারিত হইয়াছে ; তুলতুল টের পাইয়াছে গিন্নীর দর অনেক।

গিন্নীরা শাড়ি পায়, গয়না পায়, আরও কত কি পায়; মনে করাইয়া দিল।

ঠিক করিয়াছিলাম বাজারে গিয়া গজ দুয়েক রঙিন রেশম বা মলমল জাতীয় কাপড় কিনিয়া জরির পাড় বসাইয়া শাড়ি-সমস্যা মিটাইব। উঠিতেও যাইতেছিলাম, বলিয়াছি ছেলেমানুষকে—ওটুকু সারিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। গল্পটা একটু দিক পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে জমিয়া উঠিল। গল্পের মজলিসে লোক বাড়িল, শাখা-প্রশাখায় গল্প নূতন নূতন পথে ছুটিল। একটি মেয়ের শিশু-আবদার দুইটি চঞ্চল ঠোঁটের স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগাইতে জাগাইতে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কখন মিলাইয়া গেল।

মনে পড়িল যখন মধ্যাহ্নে আহারের ডাক পড়িল। অবশ্য, বড় প্রয়োজনের কাছে ও সামান্য কথাটা আমলই পাইল না। আগে এটা তো সারিয়া লই তাহার পর না হয় বাজারে চাকর-বাকর কাহাকেও পাঠাইয়া আনাইয়া লওয়া যাইবে।

ভাত খাওয়ার সময়ে কাছে আসিয়া দাঁড়ানোটা হ্যাংলামির পর্যায়ে পড়ে না, তুলতুল বেশ সপ্রতিভ এবং খোলাখুলি ভাবেই আসিয়া দাঁড়াইল, আমি একটু পুরাতনও তো হইয়াছি; হ্যাংলামির ধার মরিয়া যায় ওতে। একবার মিটুও আসিল, খানিকক্ষণ থাকিয়া কি যেন একটা খুব জরুরী কাজে বন্ বন্ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। টকার ডকারের বাঁধ খুলিয়া দিয়া অনর্গল গল্প করিয়া চলিয়াছে তুলতুল, মাঝে মাঝে শুনিতেছি, আবার মাঝে মাঝে নিজেদের গল্পে ডুবিয়া যাইতেছি। মিটুর দিদিমা রহিয়াছেন, দাদুরা আহার করিতেছেন। শেষ পাতে দই মিষ্টির সময় তুলতুলকে পাশে আসিয়া বসিতে বলিলাম। তুলতুল একবার জেঠাইমার পানে চাহিল, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "ঐ উদ্দেশ্যেই তো এসে দাঁড়ানো গুটি গুটি করে।"

তুলতুল দুই পা অগ্রসর হইয়া বসিতে গিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর ঘুরিয়া উপরের সিঁড়ির দিকে ছুটিল। প্রশ্ন করিলাম, "কি হল তুলতুল?"

সকলেই তাহার এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে একটু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া আছেন। তুলতুল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটু গিন্নীপনার ভাবে তর্কের স্বরে বলিল, "ডাঁড়াও, মিটু ঠাবেনা? ডেকোটো!"

তাহার বলিবার ধরনে সকলকেই একটু হাসিয়া উঠিতে হইল, মিটুর দিদিমা কতকটা তাহারই ভঙ্গী নকল করিয়া বলিলেন, "ডেকোটো! বোনপো শুকোচ্ছে, আমার মুখে কখনও অন্নজল উঠতে পারে? কি রকম বেয়াক্কেলে কথা আবার।"

মিটু আসিয়া অবশ্য মাসী বলিল না, তবে এবার আর উল্লেখযোগ্য কোন

হাঙ্গামা হইল না। মিটুর দাদু একবার প্রশ্ন করিলেন, "মিটু তাহলে বলছ মাসী ?"

মিটু উত্তর করিল, "কাপড পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের ?"

তুলতুল বলিল, "টাপোপ্লোব্বো , ডেকোটো।"

এইতেই আপাতত কাজ চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত গাড়ীতে অকথ্য কষ্ট গিয়াছে, তাহার উপর মিটু তুলতুল সত্ত্বেও কুটুম-বাড়িবই আহার। একটু শয্যা আশ্রয় করিতে হইল, ওরা দুজন সঙ্গে রহিল। বলিলাম, "একটু গড়িয়ে নিই মিটু, তারপর আমি ওপরে গিয়ে বাক্স খুলে পয়সা দিচ্ছি, তুই পঞ্চুকে ডেকে দিবি, তুলতুলের কাপড এনে দেবে।"

তুলতুল মুখটা ভার করিয়া গডগড করিয়া খানিকটা বলিয়া গেল, দু'চারটে কথা ধরিতে পারিতেছি, অতগুলা আয়ত্ত হয না। মিটু বলিল, "বলছে পঞ্চু আনলে আমি পরব না, পঞ্চু কালো বিচ্ছিরি।"

হাসিয়া তুলতুলকে বলিলাম, 'তা বেশ আমি হাতে করে আনলেই যদি তোমার কাপড মাড টুকটুকে থাকে, আমিই যাবো। সে তো ভাগ্যির কথা। একটু গাড়িয়ে নিই, কি বল ?"

কাপড়ের আলোচনা চলিল। "রাঙা টুকটুকে সাড়ি আসবে তুলতুলের—ফিন্‌ফিনে জাম, মাঝে মাঝে চুমকি বসান, এতখানি চওড়া জরির পাড, এই আঁচলা—এই রকম করে পরে, পিঠে এইরকম করে আঁচলা ঝুলিয়ে যেই দাঁড়াবে তুলতুল, অমনি মিটু এসে বলবে, 'ও তুলতুল মাসী। ও তুলতুল মাসী। ও তুলতুল মাসী'।"

আনন্দে একবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই তুলতুল সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ভার করিয়া কি বলিল। মিটু বুঝাইয়া দিল, "বলছে শুধু মাসী বলব।"

মর্যাদা-জ্ঞান দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইতে হইল, অর্থাৎ সঙ্গে নাম জুড়িয়া দিলে তো ওরই মধ্যে একটু ছোট করা হইল। তুলতুল ও-খাদটুকু চায়না। বলিলাম, 'হাঁ নাম ধরে আবার নাকি মাসী বলে? মিটুর যেমন কাণ্ড ? তাহলে তো নাম ধরে দাদু বলবে, নাম ধরে দিদিমা বলবে, আমারও নাম ধরে মেজকাকা বলবে। মিটু ছুটে এসে বলবে, 'ও মাসী! ও মাসী! তুমি যে কাপড পরেছ গো! ও মাসী! ও মাসী! ও মাসী'।"

কী সাধ লইয়া যে ওরা জন্মায় কে জানে, কথাগুলো তুলতুলকে যেন সুড়সুড়ি দিয়া উঠিল। হঠাৎ আমার দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল এবং চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি থামিলে বলিল, "আবাল বল না, আবাল বল। টি বোব্বে মিটু ?"

শাড়ি আনা হয় নাই। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, কখন গল্পের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি টের পাই নাই। উঠিলাম একেবারে যাওয়ার আয়োজনের ব্যস্ততার মধ্যে। পাশে তুলতুল শুইয়া আছে একটি পুষ্পস্তবকের মতো। ওর মুখের উপর যখন নজর পড়িল, ঠোঁটের এককোণে একটি হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে, বোধহয় রঙিন শাড়ি আর মাসী ডাকের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

মিটুর দাদু বলিলেন, "আমিই তোমাকে উঠোতে বারণ করে দিয়েছিলাম, কাল ঐ অবস্থা গেছে, আজ রাত্তিরেও ঘুম হবে না। নাও, মুখ হাত ধুয়ে একটু চা-টা খেয়ে নাও, স্টীমারের আর মোটে আধ ঘণ্টাটাক আছে।"

নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার মিনিট দশেক যা সময় পাওয়া গেল তাহাতে ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত পাওয়া গেল না; শিশু ভোলানো হালকা আলাপের মধ্যে একটা রাঙা শাড়িরও প্রলোভন ছিল, এ কথা আর কি করিয়া মনে থাকিবে? ক্ষতিই বা কি যদি না রহিল মনে? বড় বাড়িতে কন্যাবিদায়ের ব্যাপার, ওদিকেও বেশ একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেছে, কে কাহার খোঁজ রাখে? উপর থেকে নামিয়া আসিয়া যখন বিদায় লওয়ার পালা, ছোটদের স্তরে নামিতে তুলতুলের কথা মনে পড়িল। তুলতুল ছিল না।

কেহ সন্ধান দিতে পারিল না। মনে ধক্ করিয়া একটা বড় আঘাত লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণিক; তখনই অদূরে স্টীমার ঘাটে স্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল, ওপার হইতে উপস্থিতির সূচনা। যাত্রার তাড়ায় মোটরে গিয়া উঠিতে হইল।

গেটের দিকে মুখ করিয়া মোটর দাঁড়াইয়া আছে। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বিদায়ের শেষ লগ্নটুকু মেয়েরা একটু লয়ই টানিয়া বাড়াইয়া; মিটুর মায়ের ওঠা তখনও হয় নাই। হঠাৎ আমার দৃষ্টি সামনে একজায়গায় নিবদ্ধ হইয়া গেল।

সম্মুখেই যে দোতলার ঘরটি, তাহার সামনে রেলিঙঘেরা ছোট্ট একটি বারান্দা বা ব্যালকনিতে দাঁড়াইয়া একা তুলতুল। একটি বোধহয় বারো হাতের শাড়ির বেষ্টনীতে ক্ষুদ্র শরীরটির বুক পর্যন্ত একেবারে অবলুপ্ত, তাহারই আঁচলের একটি কোণ মাথার উপর তোলা। ছোট্ট বুকের যত আশা, যত উৎকণ্ঠা তুলতুলের সেই স্বপ্নময় চোখ দুইটিকে যেন অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মিটু আমার পাশে বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া বিদায়দৃশ্য দেখিতেছে। তুলতুলের দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত, কখন একবার ফিরিবে সেই প্রতীক্ষায়।

বোধহয় হঠাৎ চোখ পড়ার জন্য মনটা আমার প্রথমে হাসিতেই উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মিটুর মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলাম, "ঐ দেখ,

এককাপড় মাসী তোর। ডাক্ একবার মাসী বলে।"

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটুকুর মর্মান্তিকতা আমার বুকে যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিল। ততক্ষণে আমার কথার সূত্র ধরিয়া সবার দৃষ্টি ব্যালকনির উপর গিয়া পড়ায় বিদায়ের অশ্রুর মধ্যেও একটু হাসি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। তুলতুলের মুখটা যেন কি রকম হইয়া গেল, কচি ঠোঁট দুইটি নাড়িয়া কি একটা বলিতে গিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াই দুইহাতে মুখটা ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

একবার ইচ্ছা হইল ডাকিয়া লই। তখনই কিন্তু স্টীমারের বাঁশি আর একবার বাজিয়া উঠিল, মিটুর মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন, মোটর ছাড়িয়া দিল। ব্যালকনির নীচে দিয়া যাইবার সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, অপর্যাপ্ত বস্ত্রের নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে তুলতুলের শরীরটুকু যেন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

হাতেখড়ি

মিটুর হাতেখড়ি হইল।

অনুষ্ঠানটি তেমন বড় কিছু না হোক, মিটুর কাছে মস্ত বড় একটা মুক্তির আকারে আসিয়াছে। কারণটা বলি।

ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক, আরও বেশী বাড়িয়াছে এই বৎসর খানেক হইতে। লেখাপড়াটা হয়তো এমনই খুব লোভনীয় জিনিষ নয় একটা—বেত আছে, কাণমলা আছে, যেদিন মামার বাড়ী থেকে সঙ্গীরা আসে, খেলা বেশ জমিয়া ওঠে, সেদিনও স্কুলে যাওয়া আছে—দেখে তো ছোড়দার অবস্থা; তবুও একটা গুণ আছে, বেশ যেন বড় করিয়া দেয় বই শ্লেটে। দাদাকে দেখে তো, যখন-তখন যাহা ইচ্ছা বানান করিতেছে, যাহা খুশি লিখিতেছে। খাইয়া-দাইয়া হাফ-শার্ট'টা গায়ে দিল, ব্যাগে বই শ্লেট পুরিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইল, গট গট করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। অতটা না হোক; তবু প্রায় বাবার কোট-প্যাণ্ট পরিয়া মুখে পান গুঁজিতে গুঁজিতে অফিসে যাওয়ার মতো একটা কাণ্ড, যতক্ষণ না মোড় ঘুরিয়া স্কুলের পথে চলিয়া যায়, মিটু চারিটি আঙুল মুখে দিয়া দোরের কাছটিতে দাঁড়াইয়া দেখে।......কী ভয়ানক যে ছোট বোধ হয় নিজেকে!......

আর তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যে দরকারও হইয়া পড়িয়াছে এদিকে। খোকা

ছিল না, এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। এখন খোকা আসিয়াছে, হামাগুড়ি পর্যন্ত দিতে শিখিয়া গেল, মা বলিতেছে এইবার কথা শিখিয়াই সব্বার আগে তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিবে।······তখন?

মিটু যে একেবারে বসিয়া আছে এমন নয়। আরম্ভ করিয়াই দিয়াছিল। দাদার কাছে শিখিয়া শিখিয়া অ আ ক খর সমস্তটা জানে। ই পর্যন্ত লিখিতে পারে, একে চন্দ্রর সমস্তটা পারে গুনিতে। এতদিন দাদার সমান হইয়া যাইতই, মা-ই তো বারণ করিয়া সব মাটি করিয়া দিল। সেদিনকার কথাটা বেশ মনে আছে মিটুর। দাদার লেখার উপর দাগ বুলাইয়া বুলাইয়া শুঁড়ওলা চিংড়ি মাছের মত ই-টাকে শিখিয়া ফেলিয়াছে। দাদা দেখিয়া বলিল, "উস্! তুই দেখছি আমার চেয়েও ভালো লিখবি, মিটু।"

এতো ভাল লাগিল মিটুর। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার চেয়ে?"

"বাবা কি আমার চেয়ে ভালো লেখেন নাকি?"

দাদা বড়দের মত একটা চোখ একটু ছোট করিয়া মাথাটা একটু দুলাইয়া দিল, তাহার পর কথাটা কাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। মা খুব ব্যস্ত; একবার মনে হইল বলি, আবার ভাবিল না, এখন না। নিচে নামিয়া আসিয়া পেন্সিল দিয়া পড়ার ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো ই লিখিল, তাহার পর বাবা যখন খাইয়া অফিসে চলিয়া গেছে, হাতের মুঠোয় একটা ছোট কয়লা লইয়া আবার উপরে রান্নাঘরে উঠিয়া গেল। মা খাইতে বসিয়াছে বাবার পাতে, মিটু গিয়া বলিল, "একটা কি ভয়ানক জিনিষ জানি দেখবে মা?"

মা বলিল, "কি?"

মিটু বলিল, "তা হলে চোখ বোজ কিন্তু। যতক্ষণ না ওয়ান-টু-থ্রি বলব ততক্ষণ খুলতে পারবে না। খুলবে না তো?"

মা বলিল, "না।"

মিটু বলিল, "না, তুমি খুলবে।"

তাহার পর মিটুর মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরমা একদিন যা বলিয়াছিলেন। বলিল, "হ্যাঁ, তুমি তো মিথ্যে কথা বলবে না, না মা?—খেতে বসেছ যে।"

মা যে এত সোজা কথাটায় কেন একটু চোখ রাঙাইয়া হাসিল, মিটু বুঝিতে পারে না।

তারপর মা চোখ বুজিলে মিটু খুব আস্তে আস্তে দেয়ালে ই-টা লিখিল। তাহার পর বলিল, "ওয়ান-টু-থ্রি, চোখ খোল।"

মা দেখিয়াই কিন্তু রাগিয়া উঠিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "মোছ., মোছ., শীগগির মোছ., কে শেখালে তোকে? মা সরস্বতীর সামনে এখনও হাতেখড়ি হয়নি…"

মা ঠাকুরদের বড্ড ভয় করে। নিজে উঠিয়া মা সরস্বতী টের পাইবার আগেই ই-টা মুছিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু শিখেছিস? আরও কোথাও লিখেছিস?"

বেশ মনে পড়ে মিটুর কান্না পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে বলিল, "না।"

"আর কুল এখনও খাসনি তো?"

মিটু আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল খায় নাই।

মা আবার পাতে বসিয়া বলিল, "খবরদার, খবরদার, আর অ-আ ও মুখে এনো না। লিখতে যাওনি তো? হাতেখড়ি না দিয়ে মা সরস্বতীকে প্রণাম না করে পড়লে, কি লিখলে, কি কুল খেলে, মা ভয়ানক চটে যান, একেবারে বিদ্যে দেন না। খবরদার।"

সেই থেকে কি করিয়া কাটিতেছিল মিটুর! যাহাতে মা সরস্বতী টের না পান সেই জন্য অ-আ-ক-খ গুলোকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পেটের একেবারে খুব ভিতরে করিয়া দিয়াছিল। একবারও লেখে নাই। মিটু টের পাইত সেগুলো ঠিক গলার নীচে পর্যন্ত আসিয়া ঠেলাঠেলি করিত, শুড়শুড়ি দিত, কিন্তু মিটু একবারও তাহাদের বাহির হইয়া মুখে আসিতে দেয় নাই।

তাহার পর আজ যেই হাতেখড়ি হইয়া গেল, সবগুলো যেন হুড়হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল; একদিন দাদাকে স্কুল থেকে আনিবার জন্য চাকরের সঙ্গে গিয়া মিটু যেমন দেখিয়াছিল, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে ছেলেরা হুড়হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল, সেই রকম।

আজ সকাল থেকে বেশ ভালো লাগিতেছে মিটুর। যখন ইচ্ছা অ-আ বলিতেছে। শুধু শুধু প্রথম ভাগ খুলিয়াও, এই এত দিনের অ-আ-ক-খ বাহির হইয়া আসিয়া পেটটাকে হালকা করিয়া দিতেছে। লিখিতেছেও, ই শেখার পরে দুটো রাঁধা চিংড়ির মতো ঈটার উপর বড় লোভ ছিল। খুব দাগিয়াছে। আর একটু, তাহার পরই শিখিয়া যাইবে। এইবার শিখুক না খোকা দাদা বলিতে—যত পারে।

আজ সকাল থেকে মিটুর মনে দুটি চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে—এক এই, আর এক মা সরস্বতীকে লইয়া। কাল যখন ঠাকুরকে আনিয়া ঘরে রাখা হইল তখন থেকেই মিটুর মনটা যেন কেমন হইয়া ছিল—কতকটা ভয়ও আছে, আবার

খানিকটা আহ্লাদও—মিটু ঠিক বুঝিতে পারে না। আহ্লাদ এই জন্য যে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলে একেবারেই ভয় হয় না,—বেশ কেমন মা-মা ভাবটা, কোলে শুইয়া খোকা খেলা করিলে মায়ের মুখে যেমন হাসি থাকে, বেশ সেই রকম হাসি—চাহিয়া দেখিতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু সেই যে হাতে-খড়িব আগে অ-আ শিখিয়াছিল, মিটু ই পর্যন্ত লিখিত সে কথাটা জানেন নাকি ঠাকুর? মিটু চাহিয়া দেখে—হাসি একটুও বদলাইয়া রাগ আসিল কিনা···বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকিতে সাহস হয় না।

আজ সকাল থেকে কিন্তু ভয় একেবারেই গিয়া ভালোই লাগিতেছে মিটুর। কেহ নৈবিদ্যি সাজাইতেছে, কেহ ফুল চন্দনের ব্যবস্থা কবিতেছে, কেহ দোয়াত-কলম, বই সাজাইতেছে। আসা যাওয়া, কাজের ফরমাইস—সকাল থেকে যেন ঠাকুরের চারিদিকে ভিড পডিয়া গেছে। মিটু আড়ে চাহিয়া যতবারই মা সরস্বতীর মুখের পানে চাহিতেছে, ততই যেন মনে হইতেছে তিনি হাতে-খডির আগেকার কথাটা ভুলিয়াই গেছেন।

সেদিন মামার বাডী থেকে সবাই আসিয়া পডিতে, তাঁদের চা খাবাব দিতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প-গুজব করিতে করিতে মা যেমন মিটুব বাস্তায় যাওয়ার কথাটা বাবাকে বলিতে ভুলিয়া গেল না?—অনেকটা সেইরকম। তাহার পর পূজা হইল—আরও গোলমাল, তাহার পরই মেজকাকাব কোলে বসিয়া হাতে খড়ি···মিটু একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, কৈ একটুও তো ঠাকুরের সেই আগের কথা মনে নাই···খালিই তো হাসি—আরও বেশী করিয়া যেন···এমন চমৎকার লাগিতেছিল মিটুর ঠাকুরকে! যখন মেজকাকা বলিতে ঠাকুরকে মিটু বলিল, "খুব বিদ্যা দাও মা,"—তখন তো আরও হাসি ঠাকুরের মুখে—সে সব কবেকার কথা ভুলিয়া গেছেন বলিয়াই তো? হাতেখডির পর লেখাপডার প্রচুর মুক্তির মধ্যে মিটুর মনে সম্পূর্ণ একটা অন্য ধরণের ভাব ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ভয় তো একেবারেই নাই, সকালের দিকের সেই যে নির্মল আনন্দটি, তাহারই পাশে পাশে একটা অদ্ভুত ধরণের কৌতূহল জাগিয়াছে মনে।

—ঠাকুরটি কে?—কোথায় বাডি? কি করেন?······পৃথিবীর যতো সবাইকে উনিই হাতে খড়ির পর অ-আ-ক-খ দিয়া বেড়ান? উঃ! কতো আছে!—আরও কত বিদ্যে—দাদাদের বইয়ে, মামা কাকাদের বইয়ে যতো সব আছে।···পৃথিবীর যতো সব টাকা যেমন মিটুর দেশের মহারাজের, পৃথিবীর যতো সব বিদ্যে তেমনই শুধু মা সরস্বতীর নাকি? বাবা!······কে তাহা হইলে ওঁর হাতে খড়ি দিয়াছিল?

প্রশ্নের বোঝা ক্রমেই দুর্বহ হইয়া পড়ে মিটুর, মায়ের কাছে উপস্থিত হয়। প্রথমভাগ আর শ্লেট আজ একরকম নিত্যসঙ্গী, হাতেই থাকে।

মা ঝিনুকে করিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছে, মিটু গিয়া পাশে বসে, প্রথমভাগ খুলিয়া অ-আর অর্ধেকটা পড়িয়া যায়, তাহার পর প্রশ্ন করে, "মা, খোকার কবে কথা ফুটবে মনে হচ্চে?"

ওর কথাগুলো এইরকমই একটু পাকা গোছের, মা হাসিয়া প্রশ্ন করে, "কেন বল্ তো? তাড়াতাড়িটা কিসের?"

"হাতে খড়ি হয়ে গেল, এবার 'দাদা' বলুক না কত বলবে।"

ঐটুকু ভূমিকা করিয়া যে যে প্রশ্নের জন্য বিশেষ করিয়া আসা সেগুলো আনিয়া ফেলে, "মা সরস্বতী কোন্ ঠাকুরের কে হন মা? আচ্ছা মা, মা সরস্বতীর কাছে অনেক বিদ্যে আছে?"

"হ্যাঁ, আছে বৈকি। তুমি খুব মন দিয়ে পড়ো, ভক্তি করো, তোমাকেও......"

"কত বিদ্যে আছে—আকাশের মত?"

"আকাশেও আঁটে না।"

"উরে বাপ!"—বলিয়া পরিমাণটার একটা স্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য একটু চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর প্রশ্ন করে, "কে হাতেখড়ি দিয়েছিল মা, মা সরস্বতীকে?"

"ওঁর আর কে হাতেখড়ি দেবে বাবা? ওঁর হাতেখড়ি দেবার মত কি কেউ আছে সংসারে?"

মিটুর মাথায় ঢোকে না কথাটা, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করে, "কেন?......তাহলে কি করে বিদ্যে হল?"

খোকা শেষের দুধটুকু খাইতে প্রবল আপত্তি করিতেছে, তাহার উপর এ ছেলের এমন প্যাঁচাল প্রশ্নে মা একটু বিব্রত হইয়াই বলে, "হবে না? তুই একটু চুপ কর্ দিকিন। এটা আবার কোনমতে দুধ খেতে চায় না।"

মিটু একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া থাকিয়া প্রথমভাগে মনোনিবেশ করে। কিন্তু মন একেবারেই সরস্বতীর সমস্যা লইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। গোটাচারেক অক্ষর পড়িয়া বইটা দুহাতে একটু একটু লুকিতে লুকিতে খোকার দিকে চাহিয়া লইয়া বলে, "কি দুষ্টু খোকাটা। দুধ না খেলে হব না ওর দাদা, অ্যাঁ মা?......"

শেষ হইয়াছে দুধ খাওয়া খোকার, মায়ের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে। মা খোকার

পানে চাহিয়া হাসিয়া বলে, "আহা, হোয়ো, এবার খোকা লক্ষ্মী হয়েছে।... বই লুকতে নেই।"

"বই তো ঠাকুর, না মা?"—কপালে দুই হাত চাপিয়া খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে মিটু। তাহার পর বলে, "সরস্বতী ঠাকুর বই-ঠাকুর পড়েন, মা?"

ভাষার বাঁধুনি দেখিয়া মায়ের হাসি পায়, বলে, "পড়েন না।"

"কেন মা?"

খোকার কাছ থেকে ফুরসৎ পাইয়া এবার আর মার ধমক দেওয়ার দরকার হয় না, ছেলের বুদ্ধি লইয়া একটু খেলা করিবারও ইচ্ছা করে। প্রশ্ন করে, "তুই-ই বল্ না। হাতেখড়ি হয়েছে, পড়তে শিখেছিস, বুদ্ধি তো হয়েছে।"

মিটু একটু ভাবে, তাহার পব হঠাৎ মায়ের উত্তরের মধ্যে থেকেই তাহার উত্তরটা জোগাইয়া যায়। বলে, "বলব?— বলব? হাতেখড়ি হয়নি যে সরস্বতী ঠাকুরের।"

মা একটু হাসিয়া প্রশংসার দৃষ্টিতে চায়, বলে, "ঐ দেখ্, বুঝেছিস তো এবার?"

মিটু মাথা দুলাইয়া স্বীকার কবে বুঝিয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্যা মিটাইতে শেষ পর্যন্ত কোন হদিস না পাইয়া কবিতেই হয় আবার প্রশ্ন, "কেন হয়নি হাতেখড়ি, মা?"

মা ছেলেকে আর দুর্ভাবনায় ফেলিয়া রাখিতে চায় না, ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে সে সব বড় দুঃখেব কথা, কে দিবে হাতে খড়ি? বাবা মহাদেব ভোলানাথ, অষ্টপ্রহর ভূত প্রেত লইযাই ব্যস্ত, তা থেকেও যে সময়টা বাঁচে ভিক্ষা করিতেই কাটিয়া যায়, ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে খাইল না খাইল, সে খোঁজই রাখেন না হাতেখড়ি দেওয়া তো দূরের কথা। ছেলেমেয়েরাও সব তেমনি, নিজের খেয়াল খুশী লইয়াই থাকেন। কষ্ট শুধু মায়ের, একলা মানুষ, হেঁসেল দেখেন কি ভাঁড়ার দেখেন......

মহাদেবকে মিটু চেনে কিছু কিছু তবে তাঁহার সংসারটি যে এমন সে খবরটি রাখে না, এমন গৃহস্থালীর কর্ত্রীর প্রতি মনটা বেদনায় ভরিয়া আসে, মার হাঁটুতে হাত দিয়া মিটু প্রশ্ন করে, "কে মা ওঁদের মা?"

"অন্নপূর্ণা।"

মিটু একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। বেশ নামটি! এত নরম যে, শুনিয়া কেমন একটা মায়া হয়। আহা, মহাদেব ঐ রকম, ছেলেমেয়েরা ঐ রকম—একলা মানুষ......

মিটু চুপ করিয়া ভাবে। ছেলে দেব-তত্ত্ব লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে ; মা আড়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি লাগিয়া থাকে। এর তুলনায় দুর্গাঠাকুর বেশ জমজমে, সেই জন্যই বোধ হয় মনে পড়িয়া যায় মিটুর। প্রশ্ন করে, "অন্নপূর্ণা মা দুগ্‌গার কে হন, মা ?"

বোধ হয় ভাবে, অমন একজন জমকাল ঠাকুরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিলে অন্নপূর্ণার কপালটা কোন সময় ফিরিলেও ফিরিতে পারে।

মা বলে, "কে আর হবেন রে বোকা ছেলে ? —অন্নপূর্ণাই তো মা দুর্গা। তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসেন রাঁধতে হয় না, বাড়তে হয় না, কিছুর জন্যে ভাবতে হয় না। তুই দেখিস নি এবারে মা দুর্গার মূর্তি ? দু'পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুই মেয়ে, তারপর কার্তিক আর গণেশ…"

চিন্তা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বাধা দিয়া মিটু বলে, "কোন্ সরস্বতী ?"

"ক'জন আবার সরস্বতী আছে ?…আমার কটা মিটু আছে ?—একটাই তো ?… নে, এবার হাঁটু ছেড়ে ওঠ্…খোকাটা ঘুমিয়েছে শুইয়ে দিইগে।"

মিটুর অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হইতেছে। শুধু আশ্চর্যই নয়, কেমন মনমরা করিয়া দিয়াছে আজকের ব্যাপারগুলা। সব চেয়ে মুস্কিল হইয়াছে—মা দুর্গাই যে অন্নপূর্ণা, মনকে এটাও কোনমতেই স্বীকার করাইতে পারিতেছে না। মা দুর্গাকে বেশ মনে পড়িতেছে মিটুর—এবারে পাশের বাড়িতেই দেখিয়াছিল, সিংহের উপর দাঁড়াইয়া—সিংহ একটা সবুজ রাক্ষসকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে—অনেক হাত মা দুর্গার—তার বেশ মনে পড়ে ; মুখটা এমন যে তাঁহাকে যে কখন রাঁধিবার ভাবনা ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতেই পারে না মিটু।……আর পাশে বুঝি ওই সরস্বতীই ?—মিটুর এখন মনে পড়িতেছে বটে ঠিক এই রকম শাদা একজন ঠাকুর, ছবিদিদির মতো হাতে এই রকম বাজনা—তবে, এইরকম বসিয়া নয় তো, দাঁড়াইয়া আছেন। দাঁড়ানো ঠাকুরকে বসার সঙ্গে এক করিয়া লইতে তত বাধে না মিটুর, আর সরস্বতী ঠাকুর যে আসলে নিজেই একজন মেয়ে—এই যেমন ছবিদিদি, এটাও মিটুর মন অল্প আয়াসে মানিয়া লয়—অতবড় যখন মা, তখন মেয়েই বৈকি… …কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে অন্নপূর্ণা লইয়া ; মা দুর্গার সঙ্গে এক করিয়া কোনমতেই দেখিতে পারিতেছে না। মনটা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

মা দুর্গা অন্নপূর্ণা না হোন, সরস্বতীশুদ্ধ ছেলেমেয়েগুলি যে সব অন্নপূর্ণারই এটা খুব সহজেই মিটুর মন মানিয়া লইয়াছে এবং মানিয়া লইয়া একটি করুণ সংসারচিত্র রঙে রেখায় পূর্ণ করিয়া লইয়াছে।

বড়ই কষ্টে আছে মিটু। সকালে সরস্বতী লইয়া যে ভাবনাগুলা জড়ো হইয়াছিল, এখন আর সেগুলা মোটেই নাই, এখন মিটুর মনটা অন্নপূর্ণাকে লইয়া পড়িয়াছে। আহা একলা মানুষ—মহাদেব ঐ রকম, ছেলেমেয়েরা এইরকম, বিশেষ করিয়া এই মেয়েটি,—একে অবাধ্য, তায় কানের কাছে ঐ বাজনা বাজানো—সে যে কি জ্বালাতন! দেখিয়াছে তো ছবিদিদি যখন তাহার সেতার লইয়া বসে।

মিটু প্রথমভাগে মন বসাইতে পারে না, লেখার তো কথাই নাই। ধীরে ধীরে গিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে। কেমন একটা সংকোচ হয়, প্রথমে আড়চোখে চাহিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ সোজা হইয়াই ঠাকুরের দিকে চায়। মা যা বলিয়াছে ঠিকই তো মিলিয়া যাইতেছে—মেয়েই তো সরস্বতী ঠাকুর—ছোট একটি মেয়ে। মা অন্নপূর্ণা যতই ডাকুন, কাজের জন্য যতই বকুন, হাতে বাজনা লইয়া খালি মিটি মিটি দুষ্টামির হাসি, মিটু যতই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ততই আর তার সন্দেহ থাকে না যে হাতেখড়ির সময় সকালে যে হাসিটা অন্যরকম মনে হইয়াছিল, আসলে সে হাসিটা দুষ্টামিতে ভরা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কোনই পরিবর্তন দেখে না মিটু বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া যায়।

বাহিরে দোরগোড়ায় বসিয়া মিটু হাঁটু দুটি দুই হাতে বেড়িয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া থাকে—কোলের মধ্যে বই-শ্লেট। অনেকক্ষণই থাকে বসিয়া, বাবা অফিস হইতে ফেরে, বলে "ব্যাপার কি মিটুবাবু?—বিদ্যের চাপে একদিনেই যে নুইয়ে দিলেন মা সরস্বতী!"

উপরে উঠিয়া যায়। মিটু বসিয়াই থাকে। তাহার পর মিটুর মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে। উঠিয়া সোজা চলিয়া যায় রান্নাঘরে। মা চায়ের জোগাড় করিতেছে, একটু বেশি ব্যস্ত আর গম্ভীর। মিটু ঘরের মাঝখানটায় একটু চুপ করিয়া দাঁড়ায়। কি করিয়া পাড়া যায় কথাটা?…এক সময় একটু তুলিয়া লইয়া বলে, "মা, হাতেখড়ি হয়ে আমি খুব পড়েছি—দেখো কালকে সেই…" কেটলি নামাইতে নামাইতে মা বলে, "হ্যাঁ খুব পোড়ো, তাহ'লেই তো……"

কথা একবার আরম্ভ হইয়া গেলে আর আটকায় না, মিটু বাধা দিয়া বলে, "বই তো ঠাকুর, না মা?"

"হ্যাঁ, খুব যত্ন করে……"

"অ্যাঁ মা, সরস্বতী ঠাকুরের হাতেখড়ি হলে বই-ঠাকুরকে পড়বেন—খুব ভালোও হয়ে যাবেন?"

"উনি আর মন্দ কবে যে……"

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল আজ সকাল বেলায় গল্প করা ছেলের কাছে। চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে ছেলের মুখের পানে চাহিয়া বলে, "ও হরি! তুমি বুঝি সেই সব কথা ধরে···তা হবেন না ভালো? হাতেখড়ি হ'লে মতিগতি বদলায় না? এই তুই-ই তো খেলা দুষ্টুমি ছেড়ে খালি বই নিয়ে রয়েছিস যেমন। কত বাধ্য হয়েছিস। কিন্তু সব্ বাবা একটু এখন···আগুন, গরম জল, ওদিকে তাড়াতাড়ি··· তোকে বলব'খন আরও মা সরস্বতীর গল্প···" মিটু ধীরে ধীরে নামিয়া যায়। ঠাকুর-ঘরেও যায় একবার—সেই একই ভাব, হাতে বাজনা, মুখে দুষ্টামি করিয়া না শোনার হাসি।···মিটু যেন স্পষ্টই দেখে মা অন্নপূর্ণা ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইয়া যাইতে-ছেন, একলা মানুষ আহা···

মিটু নামিয়া আবার সদরের দিকে চলিয়া যায়। মায়ের কথায় একটা সমস্যার কিছু মিটিল, কিন্তু আর একটি আসিয়া জুটিয়াছে। আকাশের চেয়েও তো বেশী বিদ্যে সরস্বতী ঠাকুরের, তবে আবার হাতেখড়ির কি দরকার?···মিটু আবার দরজায় হাঁটু মুড়িয়া বসে। বাবা ক্লাবে যাইবার জন্য জামা জুতা পরিয়া নামিয়া আসে। বলে, "তোমার হাতেখড়ি ফিরিয়ে দাও গে মিটু, নিজের যত ভাবনার বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন মা সরস্বতী।"

বাহির হইয়া যায় ······ ভাবিয়া ভাবিয়া একসময় মিটু ভাবনার যেন কিনারা পায়। ঠিক তো, হাতেখড়ি না হইলে বিদ্যা থাকিয়াও যে নাই। এই তো তাহার নিজের কথাই ধরা যাক না—পেটে সমস্ত অ-আ-ক-খ, একে চন্দ্র দুই-এ পক্ষ কিছুই বাদ ছিল না কিন্তু কোন কি সম্বন্ধ ছিল মিটুর সে সবের সঙ্গে?···তাহার পর যেই না হাতেখড়ি হওয়া ব্যাস্···

মিটুর মনটা কল্পনায় যেন নাচিয়া ওঠে। সরস্বতী ঠাকুর বিসর্জনের পর বাড়ী ফিরিয়া গেছেন। হাতে এই ঘ্যানঘেনে বাজনাও নাই, মুখে এ দুষ্টুমির হাসিও নাই, তাহার জায়গায় এক হাতে শ্লেট, এক হাতে খড়ি আর কী বাধ্য আর লক্ষ্মীটি হইয়া গেছেন। ঠিক মিটু যেমন আজ হইয়া গেছে, রাস্তায় যায় নাই, খোকাকে কাঁদায় নাই। আর কত কাজের হইয়া গেছেন সরস্বতী ঠাকুর। মিটু কল্পনায় দেখে মা অন্নপূর্ণার আর সে রকম ব্যাকুল ভাবটা একটুও নাই মুখে। ভাঁড়ার ঘর, হেঁসেল যেখান থেকেই ডাক দিতেছেন, সরস্বতী গিয়া মুখটি বুজিয়া লক্ষ্মীটি হইয়া দাঁড়াইতেছেন, হাতেখড়ির পর যে মতিগতি ফিরিয়া একেবারে···

তাহা হইলে কে দিয়া দেয় হাতেখড়িটা সরস্বতী ঠাকুরের? মেজকাকার কাছেই যাইবে?

একটু অন্তধরণের লোক, বাবা আর মা'র মত সব কাজে চট্‌ করিয়া রাজি করানো যায় না। তবুও একবার দেখা যাক না।

মেজকাকার দুয়ারের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়া মিটু আবার ফিরিল। মা'র কাছে গিয়া বলিল, "একটা পান দাও, মেজকাকা চাইছেন।"

মেজকাকা একটা চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িতেছে, মিটু চেয়ারের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এই নাও, পান খাও মেজকাকা।"

"আজ হঠাৎ এত দয়া যে মিটুবাবুর ?"

মেজকাকা একটু বোঝে কম, আজ মিটুর যে হাতেখড়ি হইয়াছে সেটা মনে নাই ? কত লক্ষ্মী হইয়া গেছে মিটু ! অবশ্য সেটা আর বলিল না, বলিল, "এমনি। মা বললে মিটু একটা পান খাবি ? আমি বললাম দুৎ, পান খেলে জিভ মোটা হয়ে যায়, বিদ্যে হয় না। মেজকাকাকে দিগে।"

"মেজকাকার বুঝি বিদ্যের দরকার নেই ?"

"তোমার তো অনেক আছে, সবার হাতেখড়ি দাও···"

বই থেকে মুখ তুলিবার আগেই তাড়াতাড়ি আরও জুড়িয়া দেয়, "মেজকাকা, সরস্বতী ঠাকুরের হাতেখড়িটা দিয়ে দেবে ?"

মেজকাকা বই থেকে মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া চায়, বলে, "তুমি সরো দিকিন একটু, আমার অত ছোট কাজের ফুরসুৎ নেই। ডেঁপো কোথাকার !"

মেজকাকা ঐ রকম। এর পরেই মিটুর ইচ্ছা ছিল অন্নপূর্ণার সংসারের কথাটা তোলা। অবশ্য জানা কথা, কোন ফল হইত না। বাবা, মা, জেঠা, কাকা,—সবার মুখেই তো এক কথা—সংসারের কিছু বোঝে না মেজকাকা !

রাগ আর বিরক্তির মাথায় এই কথাটুকু লইয়া আক্রোশ মিটাইতে মিটাইতে মিটু আবার গিয়া দোর-গোড়ায় হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। আগে শুধু মা অন্নপূর্ণার দুঃখে দয়া ছিল, এখন আবার মেজকাকার উপর রাগে জিদটা আরও বাড়িয়া গেছে, কেবলই মনে হইতেছে সে নিজে যদি লিখিতে জানিত তো মেজকাকার ওই রকম ঠাট্টা করিয়া উত্তর দেওয়ার মজাটা টের পাওয়াইত—।

···অনেকক্ষণ একমনে ভাবিল মিটু, মার মতন মনে মনে মা দুর্গাকেও খুব ডাকিল, তাঁহার পর এই নিদারুণ সমস্যাটার একটা পাকারকম সমাধান হইল ; মিটু উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়া বেশ একটু অন্ধকার হইয়াছে। মিটুর মা ঠাকুরের শীতলের

জন্য উপরের ঘরে বসিয়া ফল কাটিতেছে, এমন সময় মিটুর ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, চক্ষু দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "কার জন্যে আর ফল কাটছ? দেখবে চলো—শীগগির…"

"কেনরে?"—বলিয়া মা উদ্বিগ্নভাবে চাহিতে বলিল, "এসো না, দেখবে; শেতলের জন্যে ধূপদানি করে আগুন নিয়ে যাচ্ছি—দোরের ফাঁক দিয়ে দেখি—চলো না এতক্ষণে বোধ হয়…"

যখন বারান্দায় আসিয়াছে—কানে গেল, "মাথায় পাগড়ি ও লে-খ—"মিটুর গলা। ভেজানো দুয়ার খুলিয়া দুইজনে ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। মায়ের চক্ষু স্থির!—

সরস্বতীর বীণাটা মেঝের মাঝখানে অবহেলা ভরে ফেলিয়া রাখা—। ডান হাতটি মিটুর হাতের মধ্যে, তাহাতে একটি পেন্সিল খড়ি, মিটু বাঁ হাতে তাহার ছোট শ্লেটটা সেই খড়িতে লাগাইয়া ঠিক কোলে করার মতো করিয়া মূর্তির পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে।

দাদা ছুটিয়া বাড়ীর আর সবাইকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

ভয়ে মার গলায় কান্না ঠেলিয়া আসিয়াছে, "পোড়ারবাঁদর, মার হাতেখড়ি দেওয়া হচ্ছে? লেখাচ্ছি তোমার মাথায় পাগড়ি ও…"

হাত তুলিয়া অগ্রসর হইয়াছে, মিটুর মেজকাকা আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিরস্ত করিল। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, "এদিকে আয়।…আমায় রাজী করাতে না পেরে আমার লেখা অক্ষর দিয়েই লেঠা চুকিয়ে নিচ্ছে!…এলি, না, যাব?"

মিটু ঠাকুরের চৌকি হইতে নামিতেই বোধ হয় ঠাকুরের মুকুটের পিছন দিকে আটকান একটা ক্যালেণ্ডার নিচে পড়িয়া গেল। মিটুর দাদা গিয়া সেটা তুলিয়া আনিল। বলিল, "আমার ঘর থেকে খুলে এনেছে, হতভাগা!"

নিচে ইংরাজী মাসের তারিখ। উপরে বেশ বড় একটি যোগাসীন মহাদেবের ছবি, মাথার অনেক উপর পর্যন্ত গঙ্গা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। বছরের হিসাব সমেত তাঁহার হঠাৎ এখানে আবির্ভাবের তাৎপর্যটা কেহ ধরিতে পারিল না।

মিটু বেশ আটঘাট বাঁধিয়াই সুরু করিয়াছিল। সকালে সকলে উঠিয়া যখন দেখিবে ঠাকুরের হাতে বাজনার বদলে শ্লেট চক-পেন্সিল, তখন নিশ্চয় ভাবিবে মহাদেব নিজেই আসিয়া মেয়ের প্রতি এই কর্তব্যটুকু সারিয়া লইয়াছেন। ব্যবস্থাটুকু কিন্তু টিকিল না,—সন্ধ্যার সময় শীতল বলিয়া যে আবার পূজার একটু জের বাকি আছে বেচারির সেটুকু জানা ছিল না।………বকুনি, কানমলা—ওটুকু মিটু গ্রাহ্য করে

না। শুধু দুঃখ রহিল সুদূর কৈলাসে সেই কে মা অন্নপূর্ণার জন্ত,—মাত্র মাথায় পাগড়ি 'ঙ' পর্যন্ত হাতেখড়ি হইল—এতে অবুঝ কন্তার মতিগতি ভালো রকম ফিরিবে কি ?

পীতু

ভগবানের সম্বন্ধে আপনাদের কোন রকম স্পষ্ট ধারণা আছে ? বোধ হয় নাই। না থাকিবারই কথা, কেন না সম্ভবত আপনারা সকলেই সেই পন্থাই ধরিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমায় হার মানিতে হইয়াছে। ওসব আগম-নিগম বেদ-পুরাণে কোনই ফল হয় না। অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো, শুধু সংশয়ের ঘন অন্ধকার! যেটাকে একটু পথ বলিয়া মনে হয় দেখা যায় সেটা আরও নিবিড়তর অরণ্যে লইয়া আসিয়াছে মাত্র।

তাই বলিতেছিলাম বেশ একটা বিশদ ধারণা না থাকিবারই কথা। আমারও ছিল না, তবে সম্প্রতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদের মত যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহাদের কাছে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জানেনই তো থাকিতে পারা যায় না, জিনিষটা এই রকমই।

অতএব আমি যাহা জানিয়াছি শুনুন্—ভগবান আকাশের চেয়ে বড, ইচ্ছা করিলে হাতীর চেয়েও বেশী খাইতে পারেন, আর প্রয়োজন হইলে রেলগাড়ির চেয়েও জোরে দৌড়াইতে পারেন।

এ ঈশতত্ত্ব অপৌরুষেয় কি না বলিতে পারিলাম না। আমার পাওয়া আমার ভাইঝি ছবির কাছে। তত্ত্বটি অপূর্ণ হইতে পারে; কেন-না ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে তিনটি মাত্র পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এই তিনটিতেই ধারণা এত স্পষ্ট করিয়া দিতেছে যে অপর তিনটির জন্য মাথা ঘামাইবার দরকার হয় না। নয় কি ?

আমার দীক্ষা ছবির কাছে। ছবির গুরু পীতু। ধানবাদের পীতু। আপনারা নিশ্চয় জানিতে পারেন। জানেন না ?—আপনারা যে অবাক করিলেন। অবশ্য আমিও জানিতাম না। কিন্তু ছবির কাছে যে রকম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে ধানবাদের দিকের পৃথিবীটা সে একাই যে রকম জরাট করিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে তাহাতে তাহার সম্বন্ধে লোকে অজ্ঞ থাকিতে পারে বিশ্বাসই

করিতে পারা যায় না; আমি নিজেও কি করিয়া অজ্ঞ ছিলাম—আশ্চর্য্য হইতেছি।

যতটা আন্দাজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে। আমাকে ছবির বয়সের তুলনায় আন্দাজটা কষিতে হইতেছে। ছবির নিজের যাইতেছে পাঁচ বৎসর। নূতন কোন সঙ্গীর নিকট পরিচয় দেওয়ার সময় বলে, "আমার নাম ছবি—ছ, বয়ে হ্রস্বই, ছবি"—অর্থাৎ প্রথমভাগ ধরিয়াছে। অনেকটা, যেমন সঙ্গতি থাকিলে আপনারা নাম লিখিয়া "এম এ, ডি-লিট্" অথবা "বিদ্যাবিনোদ" প্রভৃতি জুড়িয়া দেন আর কি।

পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে ধরার কারণ এই যে, সে ছবির চেয়ে ছোট কি বড় ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

যখন পীতু-কথিত কোন তথ্যে সংশয় প্রকাশ করি, ছবি তাহাকে যতটা সম্ভব বাড়াইয়া তোলে। ধরুন, যেন বৃষ্টির কথা উঠিল। আপনারা যে মনে করেন বাষ্পে শৈত্যস্পর্শ হইয়া বৃষ্টি সংঘটিত হয়, আসলে তাহা নহে। ওটা কতকগুলি হাতীর কীর্ত্তি। তাহারা ভগবানের আকাশের মত বড় পুকুর থেকে কলসী কলসী জল আনিয়া স্বর্গের রাস্তায় ছিটায়, তাহাতেই বর্ষা হয়। স্বর্গের পথ যে পিচ্ছিল একথা আপনারাও স্বীকার করিবেন। জল পড়িবার পূর্ব্বে হাতীরা নিজে যে পড়িয়া যায় না তাহার কারণ তাহাদের পাখা আছে। যদি বলি, "হাতীর তো পাখা হয় না ছবি?" ছবি উত্তর দেয়, "পীতু বলেছে সগ্‌গের হাতীদের হয়, তুমি পীতুর চেয়ে বেশী জান? পীতু আমার চেয়েও বড় মশাই, অনে—ক জানে।"

এক এক সময় পীতু ছোট হইয়া যায়।—

আমি বলি, "পড়াশুনা করছ না ছবি, খালি রোদে টুর্ টুর্ করে বেড়াচ্ছ। এবার যখন ধানবাদে যাবে, দেখবে পীতু আকাশের মত পড়ে ফেলেছে। তোমার সঙ্গে কথাও কইবে না।" ছবি তাচ্ছিল্যের সহিত বলে, "ইস, পীতুর সাধ্যি! পীতু তো আমার চেয়ে ছোট।"

নিজে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, বলে—"আমি তো এত্তো বড।" তাহার পর ডান হাতটা নামাইয়া বুকের কাছাকাছি আনিয়া মাথাটা নীচু করিয়া বলে, "আর পীতু তো এত্তোটুকু।" যখন ঈর্ষা প্রবলতর হয়, হাতটা আরও নামাইয়া একেবারে হাঁটুর কাছে লইয়া আসিতেও বাধে না। পীতুর বিদ্যার্জনের দিক দিয়া সে যে অজ্ঞ হিসাবেও নিশ্চিন্ত, তাহাও এক এক সময় জানাইয়া দেয়; বলে, "ওর মা বলে 'তোর কিচ্ছু বিদ্যে হবে না পীতু'···মার কথা মিথ্যে হয় না মশাই, পীতু নিজে বলেছে।"

মোট কথা, পীতুর ছোট হওয়া কি বড় হওয়া একেবারেই ছবির তৎকালীন মেজাজের উপর নির্ভর করে। তবে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, বয়সটা চার থেকে সাত পর্যন্ত যাহাই হোক, পীতু যে অসামান্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, পীতুর সব বিষয়ে নিজস্ব একটি মত আছে এবং সাধ্যমত সে সেটা দেশ-বিদেশে ছড়াইতে কসুর করে নাই। কোথায় ধানবাদ আর কোথায় সুদূর উত্তর বেহারে আমাদের এই নগণ্য নগরী! এখানে ইতিমধ্যে তাহার থিয়োরীগুলি আসিয়া পড়িয়াছে এবং বেশ চারাইয়া গিয়াছে। যে কোন পাড়ার যে কোন শিশুমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলে পীতুর নাম এবং এক আধটা অভিমত কানে আসিবে।

বৃষ্টির কথা বলাই হইয়াছে। আরও আছে। যেমন এঞ্জিনের মধ্যে যে রাক্ষস বসিয়া থাকিয়া অত হাঁকডাক করিতে করিতে গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, তাহারই একটি ছোট্ট মেয়ে গ্রামোফোনের মধ্যে বসিয়া মিষ্ট মিষ্ট গান করে। মেয়েটি পলাতক—দুর্দান্ত নিষ্ঠুর পিতার ভয়ে রেল-জগৎ ছাড়িয়া সে মানব পরিবারে আসিয়া লুকাইয়া আছে। ধানবাদ কিংবা যে কোন স্টেশনে গেলেই দেখা যাইবে কতকগুলি ছোট বড় নানা আকারের এঞ্জিন অবিশ্রান্তভাবে গর্জন করিতে করিতে এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই মেয়েটিকে খুঁজিয়া বেড়ানো। তাই, কাছে অনেক লোক না জুটিলে মেয়েটি কোন শব্দই করে না, গান গাওয়া ত দূরের কথা। আহা রাক্ষস বাপের লক্ষ্মী মেয়ে বেচারী। পীতু ওকে উদ্ধার করিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিত, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এঞ্জিনের দল বড় বড় আলোয় চোখ মেলিয়া খোঁজাখুজি করে, অনেক দূরের পাহাড়ের মাথা থেকে গাছের ডগায় ডগায়, বাড়ির জানালায় জানালায় তাহাদের দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। বড় হইয়া পীতু একটা ব্যবস্থা করিবে। ইতিমধ্যে ঝাল মাংস খাইয়া গায়ে খুব জোর করিয়া লইতেছে। ছবি চোখ বড বড করিয়া বলে, "খু—ব ঝাল মাংস খেয়ে পীতু একটুও উস্-আস্ করে না, পার তুমি মেজকা?"

কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া সকলেই কথা কয়, এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে;—মনে করেন বুঝি মাছেরা কথা কহিতে পারে না?—পারে। করে না পেটে জল ঢুকিয়া যাইবার ভয়ে। পুকুরে ডুবিয়া একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না—পীতুর কথা সত্য কি না। পুকুরে যদি জল না থাকিত তো মাছেরা খুব কথা কহিত। অবশ্য যে পুকুরে মাছও নাই, জলও নাই, সে-সব মাছ আর সে-সব পুকুরের কথা হইতেছে না।

গোটাকতক নমুনা দেওয়া গেল, মোটের উপর সব জিনিষ সম্বন্ধেই পীতুর এই

রকম নিজের একটি স্বাধীন মতামত আছে। আপনাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়াই যে সেগুল্যা অবহেলার যোগ্য, এমন মনে করি না।

একই সৃষ্টি—আপনারা দেখেন এক রকম চোখে, পীতু এবং পীতু-পন্থীরা দেখে অন্য-রকম চোখে। কে ঠিক দেখে, কি করিয়া বলিব? এই যে মায়াবাদীরা বলে আপনারাই ভুল দেখিতেছেন। পীতু-ও এক ধরণের মায়াবাদী।

আমার দৃষ্টিতে আসুক সেই মায়া যাহা পীতুর চক্ষে বুলান আছে। আপনারা বলিবেন, ছবির শিষ্য বলিয়াই আমার এ-ধরণের অভিরুচি; ছবি দিন দিন ওদের কল্পলোকের কাহিনী শুনাইয়া, দৃশ্য জগতের নিত্যনূতন ব্যাখ্যা দিয়া আমাকে, আপনাদের চক্ষে যাহা সত্য, তাহা হইতে স্খলিত করিতেছে। সম্ভব।

কিন্তু এই সত্যচ্যুতিতে আমার কোন দুঃখ নাই। এ আমার পরম বিলাস; তাই প্রতিদিনের আপনাদের এই গতানুগতিক জীবনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বার বার পড়া একই কাহিনীর মত জীবন যখন ঠেকে নিতান্ত বিস্বাদ, অনুচ্চাবচ সমতলের মত বৈচিত্র্যহীন, ছবিকে কাছে ডাকিয়া লই,. ধানবাদের পীতুর কথা পাড়ি। দেখিতে দেখিতে নীল পাহাড়ের স্তবকে স্তবকে, অসমতল ভূমির তরঙ্গলীলায়, শিশু-শালের বনে আর শরৎকালের স্বচ্ছ-জলে ভরা সাহেব-বাঁধের দীঘিতে ধানবাদ জাগিয়া উঠে। ওসবের মধ্যে যদি থাকেই কিছু কঠোরতা—তো এই তিন শত মাইলের দূরত্বে তাহা যায় গলিয়া মিলাইয়া। অনির্দ্দেশ-সঞ্চরমাণ দুইটি শিশু পাহাড়ে ঘেরা এবং পাহাড়কেও অতিক্রান্ত করা সমস্ত জায়গাটিকে করিয়া তোলে একটি স্বপ্নপুরী।

ছবি প্রশ্ন করিয়া শুরু করে, "ভারি তো জান—ভগবানের বাড়ি কোথায় বল তো মেজকাকা?"

সরল প্রশ্ন, উত্তর দিই—"স্বর্গে।"

উত্তরটা নিশ্চয় নির্ভুল, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ছবি যাহা চায় তাহা নয়। মনের ভাবটা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ছবি একটু ভাবে, তাহার পর বলে, "সে তো ভগবানের কলকাতার বাড়ি.—দেশের বাড়ি কোথায়?

প্রশ্নটা আর ততটা সরল থাকে না। আমি উত্তর খুঁজিতেছি, ছবি বলে, "পীতুদের বাড়ির জানলা থেকে ধানবাদে যে পাহাড়টা দেখা যায় না? অনে—ক দূরে—দেখেছ তুমি?"

পীতুদের বাড়ি সম্বন্ধেই কোন ধারণা নাই, তাহার জানালা দিয়া কোন্ পাহাড় দেখা যায় কি করিয়া বলিব? বলি, "না, দেখি নি তো।"

ছবি গম্ভীর হইয়া বলে, "কিছু দেখনি তুমি, ধানবাদে গিয়ে তবে কি করতে? পীতুদের জানলা দিয়ে আকাশে—র মত মস্ত একটা পাহাড় দেখা যায়। ভগবানের বাড়ি তার পেছনে, মশাই।...হ্যাঁ। হাসছ তুমি, ভারি তো জান; ভগবানের বাড়ি ঠিক তার পেছনে। সেখান থেকে রোজ সকালবেলা কোথাও যখন কেউ ওঠে না ভগবান্ সূয্যি ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেন। আহা, অত ভোরে উঠতে কষ্ট হয় না মেজকাকা সূয্যিঠাকুরের? কি করবেন বল? ভগবানের গায়ে হাতীর মত জোর। ভয় করে তো? বাবা দাদাকে ভোরবেলায় যখন পড়তে তুলে দেয়, দেখনি? সেই রকম চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওঠেন সূয্যিঠাকুর। রাঙা হয়ে যায় চোখ।"

ছবি হাতটা সঞ্চারিত করিয়া বলে, "তখন কোথাও কেউ ওঠে না, খালি পীতু ওঠে। পীতুর মাও ঘুমিয়ে থাকে। পীতুর মা খু—ব সুন্দর মেজকাকা, জান? যখন সূয্যিঠাকুর ওঠেন, পীতুর মার মুখ রাঙা হয়ে যায়, দুগ্‌গা ঠাকুরের যেমন ঝকঝকে মুখ নয়? সেই রকম। এমন চমৎকার দেখায় মেজকা। পীতু বলেছে আমায় একদিন দেখাবে। পীতু অনেকক্ষণ ধরে দেখে চাঁদের মত মুখ পীতুর মার। এক এক দিন জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'কি দেখছিস রে পীতু অমন ক'রে?'... মেজকাকা, চাঁদ কে বল তো?"

বলি—"সূয্যিঠাকুরের ছোট ভাই!"

ছবি এমন হাততালি দিয়া হাসিয়া ওঠে যে সত্যই নিজের মূঢ়তার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। ও বলে—"কিচ্ছু জান না মেজকাকা তুমি, শুধু দোরের মত উঁচু হয়েছ—চাঁদ সূর্য্যিঠাকুরই মশাই, রাত্তিরে চাঁদের মতন দেখায়, পীতু বলেছে।"

আমি ওকে একরকম হারাইবার জন্যই বলি, "চাঁদ যে সূয্যিঠাকুর বলছ, তবে অত চক্‌চক্ করে না কেন?"

দুর্ব্বল প্রতিপক্ষকে হারাইবার উপযোগী অবজ্ঞার সহিত ছবি বলে, "রাত্তিরে যে রোদ্দুর থাকে না মশাই, কি ক'রে করবে চকচক?...উনি পীতুর চেয়ে বেশী জানেন।... এবারে ধানবাদে গিয়ে পীতুকে বলব তোমার বুদ্ধির কথা, হেসে গড়িয়ে যাবে'খন।"

হঠাৎ হাঁ-টি ছোট এবং গোল করিয়া লইয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া ছবি প্রশ্ন করে, "মেজকাকা, তুমি ভগবানকে দেখেছ?"

বলি—"না, ওঁকে কি দেখা যায় ছবি?"

—"নাঃ, দেখা যায় না। তবে পীতু কি ক'রে দেখলে মশাই?"

—"পীতু দেখেছিল নাকি?"

ছবি খুব টানিয়া জোরের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ! পীতুর পাঠশালের গুরুমশাই মরে

গিছলো কিনা, তার শ্রাদ্ধতে পীতুকে দই দিতে বলেছিল।

"আহা, কোথায় পাবে দই পীতু, মেজকাকা? গরীব মানুষ, গেরো দেওয়া কাপড় পরে। চালের পিটুলিকে দুধ ব'লে ওর মা ওকে খাওয়ায়; কোথায় দই পাবে মেজকাকা? পীতুর মা বললে, 'তোর মধুসূদন দাদাকে ডাকিস, তিনি দেবেন দই। যেদিন শ্রাদ্ধ না মেজকাকা? পীতু ওদের বাড়ীর ওদিকটায়, একলা পলাশ বনের ধারে গিয়ে—কোথায় মধুসূদন দাদা, কোথায় মধুসূদন দাদা, এস, দই দিয়ে যাও' ব'লে কাঁদতে লাগল। আহা কাঁদবে না মেজকা? দই না নিয়ে গেলে ওকে মারবে যে। কেঁদে কেঁদে ওর চোখের জলে একটা নদী বয়ে, পলাশবনের মধ্যে দিয়ে ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে, ভগবানের বাড়ির দিকে যেদিকে সূয্যি ওঠে, কত দূর চলে গেল। অমনি এক জন থুড়থুড়ে বুড়ো লাঠি ধরে ঠুক-ঠুক ক'রতে ক'রতে হাতে ক'রে এক ভাঁড় দই নিয়ে এসে বললে 'এই নাও দই, এর জন্যে কি এত কাঁদে?... এ বুড়ো কে বল তো মেজকাকা?"

বুঝিতেই পারিতেছেন গল্পটি একটি পৌরাণিক উপাখ্যান। কল্পনাপ্রবণ পীতু ওটিকে নিজের জীবনে আত্মসাৎ করিয়াছে, গেরো দেওয়া কাপড় আর অশ্বত্থামার চালের পিটুলির দুধ সমেত। যোগ দেওয়া ছাড়াও আবশ্যক মত একটু পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। মূল উপাখ্যানে বোধ হয় গুরুমহাশয়ের মায়ের শ্রাদ্ধ ছিল, নিজের গল্পে পীতু খোদ গুরুমহাশয়ের অন্ত্যেষ্টি ঘটাইয়াছে। এটা পীতুর মরজী বলুন, সাধই বলুন, বা সুবিধাই বলুন।

আমি বলি—"বুড়ো, ভগবান বুঝি?"

ছবি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলে, "ঠিক বলছে রে! তুমি বুঝতে পার মেজকাকা, খুব বোকা নয় তো!"

আমি বলি, "কিন্তু এই তুমি বল ভগবান্ আকাশের মত বড, আর রেল-গাড়ির চেয়েও দৌড়তে পারেন?" —"সে তো যখন রাক্ষসের সঙ্গে কুস্তি করেন মশাই! দই আনবার সময় অত জোর নিয়ে কি হবে? যদি দই না আনলে ওরা পীতুকে মারত তো দেখতে ভগবানের জোর।" খপ করিয়া আমার হাতের কড়ে আঙুলটা ধরিয়া বলিল, "ভগবান এই আঙুল দিয়ে ওদের সব্বার গায়ে একটা পাহাড় ঠেলে দিতেন। হুঁ, চালাকি নয় মশাই!"

ভীত হইয়া বলি, "ভাগ্যিস তাহলে দই এনে দিয়েছিল বুড়ো, নইলে..."

ছবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরে, শঙ্কিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে কহে, "জিব কামড়াও মেজকাকা শীগ্‌গির, ভগবানকে বুড়ো বললে! এক্ষুণি এরকম শাপ দেবেন!...

চাপা ঠোঁটে বলি, "হাতটা সরাও, বের করি জিবটা কামড়াবার জন্যে। বুড়ো রাগ করেন বুঝি 'বুড়ো' বললে ?"

"—হ্যাঁ! পীতু কক্‌খনও বুড়ো বলে না। তাই কত ভালবাসেন। বাড়ি গেলে কত আদর করেন, কত্তো খাবার দেন—"

বলি, "খেতে দেন ? তাহ'লে তো একবার গেলে হ'ত ছবু। পীতু জানে পথটা ?"

—"ওমা, জানে না ?" বলিয়া ছবি গুছাইয়া বসে। র‍্যাফেলের আঁকা শিশু পরীর মত করতলে চিবুক রাখিয়া, আমার দিকে চোখ তুলিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দেয়। চোখে কোন্ এক অজানা লোকের আলোক ঝলমল করিতে থাকে।

পীতু জানে বইকি, ছবিও জানে। পীতুতে ছবিতে মিলিয়া কতবার গিয়াছে। পীতু একবার একলা গিয়াছিল। ওর মার কাছে যেদিন ধ্রুবের গল্প শুনিয়াছিল না ? সেই দিন, রাত্রিবেলা। সেদিন সকালবেলা ঠিক যেখান দিয়া সূয্যি ওঠে, রাত্রে ঠিক সেইখান দিয়া সূর্যটা চাঁদ হইয়া বাহির হইল। শোবার সময় পীতুর মার মুখ অন্ধকার ছিল, গল্প বলিতে বলিতে খোলা জানালা দিয়া আলো ফুটিয়া উঠিল। কপালে কাঁচপোকার টিপ 'আকাশে-র' মত নীল হইয়া উঠিল। চাঁদের চেয়েও পীতুর মার মুখ সুন্দর, মশাই। চাঁদের কপালে মায়ের মত রাঙ্গা পাড আর সিঁদুর নাই, পান খাইয়া চাঁদের ঠোঁট মায়ের মত রাঙা হয় না। পীতু মাকে বড্ড ভালবাসে, ভগবানের চেয়েও। গল্প শুনিতে শুনিতে সেদিন পীতু কাঁদিয়াছিল। আহা, ধ্রুবের মায়ের মত পীতুর মায়ের যদি একখানি কাপড হয়, আর ওর বাবা যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে বনে বনে ঘুরিয়া হঠাৎ রাত্রে আসিয়া পড়ে! তাহা হইলে তো মাকে তাই থেকে আধখানা ছিঁড়িয়া দিতে হইবে ? তাই গল্প শুনিতে শুনিতে পীতু খুব কাঁদিয়াছিল। ওর মাকে জানিতে দেয় নাই, আস্তে আস্তে চোখের জল গডাইয়া বালিস ভিজিয়া গিয়াছিল। পীতু খুব সেয়ানা ছেলে মশাই! পীতুর বাবা বকিলে ওর মা যেমন চুপ করিয়া কাঁদিতে পারে না ? পীতুও সেই রকম ভাবে কাঁদিতে পারে। ছবি বলিল, "খুব আস্তে আস্তে, খালি ভগবান্ সে রকম কান্না শুনতে পারেন, মেজকা, পার তুমি কাঁদতে সে রকম ক'রে ?"

পীতু গল্প শুনিতে শুনিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক করিল, মা ঘুমাইলে সে ধ্রুবের মত ঘুমন্ত মায়ের পাশ হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া যাইবে এবং গিয়া বলিবে মায়ের যেন কখন মোটে একখানি কাপড় না হয়, আর বাবা বনে বনে ঘুরিয়া যদি রাত্রে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, ভগবান্ যেন

দুয়ারের পাশটিতে চুপি চুপি খাবার রাখিয়া যান। কাহারও কাছে চাহিতে গেলে মার বড় লজ্জা বড় কষ্ট হয়। ভগবান্ তো পীতুর মাকে জানেন না, পীতু গিয়া সব বলিবে।

সেদিন রাত্রে মা যখন গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল, ভগবান আসিয়া পীতুর চোখে তাঁহার ঠাণ্ডা আর নরম হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার পর পীতু উঠিল। ধ্রুবর মায়ের মত পীতুর মা পীতুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই গেরোটা বাঁতি দিয়া কাটিল, তাহার পর ভগবানের বাড়ির দিকে চলিল। তাহার আগের দিন মধুসূদন দাদাকে ডাকিয়া ডাকিয়া চোখের জলের নদী হইয়া গিয়াছিল কি না, পীতু তাহার ধারে দাঁড়াইয়া খুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া মধুসূদন দাদাকে আবার ডাকিতে লাগিল। তাহার চোখের জলের নদী বাড়িতে বাড়িতে 'আকাশের' মত বড হইয়া গেল এবং একটা সোনার নৌকা আসিয়া ধারে দাঁড়াইল। ছবি মামার বাড়িতে যে নৌকা চড়িয়া গিয়াছিল তাহার চেয়ে অনে-ক ভাল নৌকা, অনে-ক বড় নদী, অনে-ক বেশী হাওয়া, নৌকার সোনার পাল হাওয়ায় ফুলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে কত দূর চলিয়া গেল পীতু। বাবার সঙ্গে কিংবা একলা চুরি করিয়া যতদূর বেড়াইতে যায় তাহার চেয়ে আরও অনেক দূর। অত আলো ছিল তো? ভগবানের বাড়ির যত কাছে যাইতে লাগিল, আলো ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ধানবাদ ইষ্টিশানের চেয়ে ঢের বেশী আলো। পীতুর এক একবার ভয় করিতেছিল। পীতুর একটুও ভয় করে না, মশাই। ঝাল মাংস খাইয়া ওর গায়ে খুব জোর হইয়াছে। ওর মা যদি কাছে থাকে আর রাক্ষস যদি 'দুখিনী সীতার মতন' ওর মাকে ধরিতে আসে তো এ-ক চাপড়ে রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু ওর মা তো কাছে ছিল না, তাই পীতুর———ভয় করিতেছিল। না———পীতুর একটুও ভয় করে না———মায়ের জন্য শুধু মন কেমন করিতেছিল। তখন ভগবান ওর নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া ওকে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল কিনা? পীতু দেখিল পাহাড়ের ওদিকে, ভগবানের আরও আলোর দেশে পীতু পৌঁছিয়া গিয়াছে। কত বড দেশ! কত বড সোনার বাড়ি। 'আকাশে-র' মত উঁচু। ঝরিয়ার রাজার বাড়িতে যেমন ঝাড লালটেম টাঙানো আছে না? ছবি দেখে নাই, কিন্তু পীতু একবার পূজোর সময় দেখিয়াছিল — তাহার চেয়েও অনেক ভাল ভাল অনেক লালটেম টাঙান।

পীতুর অভিজ্ঞতায় গরবিণী ছবি আমায় 'পরীক্ষার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, "কিসের

আলো বল তো মেজকাকা?"

বোধ হয় আমা হেন অনভিজ্ঞের পক্ষে উত্তরটা নিতান্তই অসম্ভব ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, "তারার ঝাড় লালটেম। —হ্যাঁ মশাই, তুমি তো ভারি জান; পীতুর মা বলেছে ভগবানের বাড়িতে খালি তারার ঝাড় লালটেম টাঙান আছে। তারার লালটেম না হলে পীতুর নৌকোয় অত আলো করেছিল কি করে? —বল না এবার মশাই।"

এমন অকাট্য প্রমাণের সামনে আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

ছবির বর্ণনা চলিল—ভগবান জানিতেন পীতু আসিবে। তাহা না হইলে নৌকা কে পাঠাইয়া দিয়াছিল? নৌকা ঘাটে লাগিলে ভগবান নামিয়া আসিয়া পীতুকে কোলে করিয়া লইলেন। চুমা খাইলেন। কী সুন্দর যে দেখাইতেছিল, ভগবানকে। ভগবান যখন ভালবাসেন তখন আর প্রকাণ্ড থাকেন না, তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয় না। তখন তিনি খুব সুন্দর হইয়া যান। তখন মা পূজার সময় যে মালা পরান, ভগবানের গলায় সেই মালা দুলিতে থাকে। মায়ের দেওয়া মালা সুদ্ধ তাঁকে খুব আপনার লোক বলিয়া মনে হয়। একটুও ভয় করে না। পীতুর কিন্তু লজ্জা করিতেছিল। বিকালের গাড়িতে পীতুর বাবা এক একদিন আসিয়া পীতুকে কোলে লইয়া যখন চুমা খায় তখন যেমন লজ্জা করে, সেই রকম লজ্জা।

পীতু তো বড় হইয়াছে? ওদের ছোটখুকীর মত তো ছোট নয়, লজ্জা করিবে না?

ছবি আবার প্রশ্ন করিল, "ভগবান পীতুকে কেন কোলে ক'রে নিলেন বল দেখি মেজকাকা?"

বলিলাম— "ভালবাসতেন ব'লে।"

নির্ব্বুদ্ধির ক্রমাগত ভুল উত্তরে লোকে যেমন জ্বালাতন হইয়া যায়, সেই ভাবে ছবি ঈষৎ ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "আর কাদা লেগে যাবে না বুঝি পীতুর পায়ে? কিছু যদি জান তুমি!"

আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "আর ভগবানের পা'য়ে কাদা লেগে গেল না? তিনি বুঝি বুটজুতো প'রে ছিলেন?"

ছবির হিউমারের দৃষ্টিটা বেশ প্রখর, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া, বিচক্ষণের মত মাথা দোলাইয়া একটু ব্যঙ্গ-হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবানের পায়ে বুঝি কাদা লাগে? কি বুদ্ধি তোমার মেজ-কাকা!"

বলিলাম, "ভগবান জানে না বুঝি?" ছবি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, না, একটুও না।"

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ভগবানের পায়ে কাদা লাগে না, হাতে কালি লাগে না, সাবান মাখলে চোখ জ্বালা করে না, বিষ্টিতে ভিজলে সর্দি করে না, ওরা সব যে ভগবানের চাকর, মশাই; পীতুর মা বলেছে; আর জান মেজকাকা?" প্রশ্ন করিলাম, "কি?" "ওল খেলে ভগবানের মুখ কুটকুট করে না, একটুও তেঁতুল খেতে হয় না।"

ভগবানের এই গূঢ় শক্তির আবিষ্ক্রিয়াটা নিশ্চয় ছবির নিজের, কেন না আজ সকালেই ওল খাইয়া তাহার নিজের নির্যাতন গিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "তাই নাকি? খুব সুবিধে তো ভগবানের! আচ্ছা, তারপর ভগবান কি করলেন বল।

ভগবানের বাড়িতে অনেক চাকরাণী আছে। বুঝি মনে করিয়াছেন তাহারা আমাদের বাড়ির 'বিদেশীয়া-কে-মা'-এর মত লম্বা, কালো, এবং ময়লা কাপড় পরা? না, তাহারা সব খুব সুন্দর, পীতুর মায়ের মুখে চাঁদের আলো পড়িলে যেমন সুন্দর দেখায়, সেই রকম। তাহাদের শাদা পায়রার মত বড় বড় ডানা আছে; পীতুদের ঘরে টাঙানো মেমসাহেবদের ছবিতে যেমন আছে না, সেই রকম। এক এক দিন সকালবেলায় পাহাড়ের ওদিকে ভগবানের বাড়ির উপর যখন ছোট ছোট রাঙা রাঙা মেঘ করে, এরা মেঘের সিঁড়ি দিয়া, আলোর রাস্তা ধরিয়া, গান করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া যায়। পীতু ভোর বেলায় উঠিয়া যখন জানালা দিয়া মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে, ঘুমন্ত মায়ের আর খুকীর মুখে আর ডানাওয়ালা মেমসাহেবদের ছবিতে আলো আসিয়া পড়ে, তখন অনেক বার ইহাদের দেখিয়াছে। পীতুর মা বলেন এদের পরী বলা হয়, পীতুদের খুকী মায়ের কোলে আসিবার আগে পরী ছিল। পরীরা নরম ডানার মধ্যে করিয়া পীতুকে লইয়া গেল।

বেশ লাগে, মনে হয় ঠিক যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে আর মা আঁচলে করিয়া পীতুকে ঘিরিয়া আছে। পীতুর মাও নিশ্চয় আগে পরী ছিল, পীতুকে এমনি করিয়া ডানায় ঢাকিত; এখন যেমন রাঙা পাড়ের আঁচলে করিয়া ঢাকে।

তাহার পর সোনার জলের ঝরণায় নাওয়া। পীতুর মা যে বলে সেখানকার জলে স্নান করিলে সমস্ত পাপ ধুইয়া গিয়া আলোর শরীর হয় তাহা একটুও মিথ্যা নয়। দেখিতে দেখিতে পীতুও পরীদের মত হইয়া গেল। মেমদের ছবিতে ডানা লাগানো খোকা সব হাতজোড় করিয়া আছে না? সেই রকম। তখন কিন্তু তাহার মায়ের জন্য বড় মন কেমন করিয়া উঠিল,—মা যদি চিনিতে না পারে! যদি

মনে করে পীতু আসলে সত্যই তাহাদের ঘরের মেমসাহেবদের ছবির পাখা পাখা-ওয়ালা ছোট ছেলে, মিছামিছি পীতু হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। তাহা হইলে কি হইবে?

না, পীতুর এসব ভাল লাগে না; ছেঁড়া কাপড় পরা ধ্রুবের মত সে মায়ের কাছেই থাকিবে। ভগবানের চেয়ে মা অনেক ভাল! আর পীতু না থাকিলে ভগবান তো বাঁচিয়া থাকেন, মা কিন্তু কোন মতেই বাঁচিবে না যে।

ভগবান সবার মনের কথা বুঝিতে পারেন, মশাই! পীতুকে লইয়া চুম খাইয়া তাহার মনের ভয় সরাইয়া দিলেন। পীতু মার কথা ভুলিয়া গেল। কত খাবার দিলেন। গোবিন্দ হালুয়াইয়ের দোকানের চেয়ে আরও অনেক মিষ্টি খাবার। তাহার পর আরও কত কি দিলেন,—পীতুর বাবা, পূজার সময় টাকা ছিল না বলিয়া যে বড় জাপানি ডলটা কিনিয়া দিতে পারেন নাই, সেইটা। নেমন্তন্নর দিন ওদের বাড়ির অজু যেমন জরি বসানো জামা পরিয়াছিল, সেই রকম জামা, ইস্টিশানের সাহেবদের বাগানের পোষা হাঁস, পীতুর মনের কথা নিজে নিজেই জানিয়া সমস্ত দিলেন পীতুকে। আরও কত কি দিলেন, কত জায়গায় লইয়া গেলেন, কত রাঙা রাস্তার উপর দিয়া লতায় ফুলে ঢাকা কত বাড়ির কাছ দিয়া কত পাহাড়ের গা বাহিয়া, সাঁওতালরা যেমন করিয়া যায়—কত রাঙা, হলদে, বেগুনে মেঘে পা ফেলিয়া সাতরঙা রামধনুর নিচে দিয়া কত জায়গায় লইয়া গেলেন। ভগবানের গায়ের আলোয় পরীদের গায়ের রং কত সুন্দর হইয়া উঠিল।

বর্ণনায় হারিয়া ছবি বলিল, "সে তুমি বুঝবে না মেজকাকা, কখনও দেখনি কিনা। পীতুর মা বলে বড়রা সে দেখতে পায় না। পীতুদের বাড়ির জানলা দিয়ে যে পাহাড় দেখা যায় তার ওধারে আছে সব। সেখানে যখন পাহাড়ের মাথায় রামধনু ওঠে, কি মেঘের মধ্যে মধ্যে চাঁদের রূপোর নৌকো ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে, সে সময় পীতু দেখতে পায় ভগবানকে, পরীদের কত বাজনা বাদ্যি করে আগে পিছে ভগবানের লোকেরা যাচ্ছে, পীতু সব দেখে, আমায়ও কতবার দেখিয়েছে মশাই, ওর মাকেও দেখিয়েছে। কিন্তু পীতুর মা বলে বড়রা কেউ দেখতে পায় না, ভগবান বড়দের ওপর রাগ করেন।"

ঐসব রাস্তা দিয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়িতে যাওয়া যায়। যাইতে-যাইতে পীতুরা কতদূর গেল,—মেঘের রাজ্য অতিক্রম করিয়া, রামধনুর ফটক পার হইয়া, কত-উচুতে —রাত্রে যেখানে তারার জানালা খুলিয়া দিয়া আকাশের ওদিক থেকে দেব-বধূরা দলে দলে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে—সেখানে। সে জায়গাটায়

একটু ভয় ভয় করে, কেন না সেটা রাত্রির অন্ধকারের দেশ। এদিককার আলো কমিয়া কমিয়া সেইখানটায় শেষ হইয়াছে, আর উপর থেকে স্বর্গের আলোও পৌঁছায় নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পৃথিবীর হাজার হাজার দুষ্টু ছেলে যখন খেলাধূলা শেষ করিয়া আসিয়া মায়েদের, দিদিদের ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া দুরন্তপনা করে, সেই দেশ থেকে তখন অন্ধকার আস্তে আস্তে ভগবানের দেহের উপরও কালো ডানার ছায়া ফেলিয়া নামিয়া আসে। সেখানে পৌঁছিয়া পীতুর মায়ের জন্য বড্ড মন কেমন করিয়া উঠিল। চোখ নামাইয়া পীতু দেখিতে পাইল নীচে, অনেক—অনেক—অনেক দূরে, তাহাদের ধানবাদের ছোট্ট ঘরটিতে পীতুর মা খুকীকে সঙ্গে লইয়া ঘুমাইয়া আছে ; ঘুমাইয়া থাকিলে মায়ের মুখে যে হাসিটি লাগিয়া থাকে সেই হাসিটি এখান থেকে দেখা যায়। মায়ের শাড়ীর রাঙ্গা পাড, মায়ের পায়ের রাঙা আলতার উপর দিয়া, গায়ের উপর দিয়া মায়ের চুড়ি-পরা হাতের সঙ্গে খুকীকে জড়াইয়া, বুকের উপর দিয়া, কালো চুলের সঙ্গে মিশিয়া গেছে, ভোরের মেঘে যেমন সোনার পাড় বসানো থাকে না?—ঠিক সেই রকম। ঘরের এদিকটায় চাঁদের আলো নাই। পীতু সমস্ত রাত মায়ের হাতটি বুকে লইয়া শোয়, যেখানে তাহার বুক ছিল হাতটি এখনও সেইখানে পড়িয়া আছে। পীতুর মা না জানিয়া মনে করিতেছে তাহার হাত এখনও পীতুর গায়েই আছে, মনে করিতেছে ওটা বালিস নয়, পীতুর নরম বুক। তাই তাহার মুখে হাসি। পীতুকে বড্ড ভালবাসিত কি না?—ভগবানের চেয়েও।

পীতুর ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল। অন্ধকারের দেশ পার হইয়া আবার যদি ফিরিয়া আসিতে না পারে! যদি ভগবানের স্বর্গের বাড়ি এত সুন্দর হয় যে মায়ের কথা একেবারেই মনে না পড়ে।—কলকাতায় একবার রতন দিদির বাড়িতে গিয়া যেমন একেবারেই মনে পড়ে নাই।

মায়ের ঘুমন্ত মুখে এখনও হাসি দেখা যাইতেছে, মা মনে করিতেছে পীতুর বুকে হাতটি রহিয়াছে, তাই। ঘুম ভাঙিলেই মা যখন দেখিবে পীতু নাই, যখন বুঝিবে পীতু তাহার অত করিয়া বাঁধা আঁচলের গেরো কাটিয়া তাহার চোখের জলের নদী দিয়া, ভগবানের পাহাড়-ঘেরা বাড়ি পার হইয়া অন্ধকারের দেশ পার হইয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে—তখন?

ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল পীতুর। ভগবান তো মনের কথা টের পান? টের পাইয়া আগেকার মত ভুলাইয়া দেওয়ার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পীতু আর কিছুতেই ভুলিল না—পীতুর বাবা একবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় পীতুকে যেমন কোনও মতেই ভুলাইতে পারে নাই, সেই রকম।......পরীরা কত বুঝাইল, আদর

করিল, বলিল—অন্ধকারের ওপারে গিয়া তাহাকে বাবিয়ার রাজার মত বাড়ি দিবে, গাড়ি দিবে, অজুর চেয়েও ভাল ভাল জামা দিবে, পীতুর কিন্তু সব জিনিষের চেয়ে মাকে ভাল লাগিতেছিল। তখন ভগবান আরও চেষ্টা করিলেন, আরও লোভ দেখাইলেন, বলিলেন—ধ্রুবকে যেমন ধ্রুবলোক করিয়া দিয়াছিলেন—আকাশের অনেক দূরে, এখনও দেখা যায়—পীতুকেও সেই রকম আকাশের চেয়েও আরও উঁচুতে ধ্রুবলোক করিয়া দিবেন ; আরও কত কথা সব······

পীতুর একবার মনে হইল যাই ? মার যদি কষ্ট হয় ? খুকুকে কোলে লইয়া ভুলিবে। ভগবান এমন করিলেন যে পীতু একটুখানি ভুলিয়া গেল মাকে, এ—কটুখানি—ঘুমাইবার সময় একটুখানি ভুলিয়া যায় না লোকে ? সেই রকম। সেই সময় হঠাৎ সে রাস্তার পাতলা অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে পাইল—অনেক নিচে, ধানবাদের ঘরটিতে তাহার মা পাশ ফিরিতেই কাটা আঁচলটা কাপড়ের মধ্যে থেকে বাহির হইয়া পীতু যেখানটায় শুইয়াছিল সেইখানটায় লুটাইয়া পড়িল। বঁটি দিয়া কাটার দরুন পাড হইতে সুতা বাহির হইয়া যেন রক্তের মত দেখাইতেছে। মা যদি এখনই উঠিয়া পড়ে !······মুখের হাসি এখনও মুখে লাগিয়া আছে।

পীতু ভগবানের বুকে ছটফট করিয়া উঠিল। না, সে যাইবে না।

তাহার চাই-না কিছু, চাই-না ধ্রুবলোক। সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে। ভগবান বড় দুষ্টু, ভগবানের চেয়ে মা ঢের ভাল। মা তো রোজ ভগবানকে পূজা করে, সন্ধ্যায় সময় তুলসী-তলায় প্রদীপ দেয়, সকাল বেলায় স্নান করিয়া মাটির ভগবান গড়িয়া ফুলচন্দন চড়ায়। মায়েরই দেওয়া মালা তো এখনও ভগবানের গলায় ; তবুও কেন পীতুকে মায়ের কাছে যাইতে দিতেছেন না ? পীতু যাইবেই যাইবে। ভগবান যদি না ছাড়েন, ধ্রুব যেমন আগুনের মধ্য থেকে বাঘেদের মধ্য থেকে ভগবানের তপস্যা করিয়াছিল, পীতুও ধ্রুবলোকে গিয়া মার জন্য সেই রকম তপস্যা করিয়া আবার সেখান থেকে মায়ের কাছে নামিয়া আসিবে। না ! পীতুকে ভগবান জানেন না—পীতু মাকে বড্ড ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও—পরীদের চেয়েও—স্বর্গের চেয়েও—ধ্রুবলোকের চেয়েও······

বলিলাম, "ভগবান চ'টে গেলেন না ছবি ?"

ছবি একটি স্বপ্নের মধ্যে ছিল, মুখে একটু শান্ত করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু ভাবুকতার সঙ্গে, একটু ক্ষমার সঙ্গে; একটু আর একটা কি অনির্বচনীয়তার সঙ্গে স্মিতহাস্যের সহিত ধীর কণ্ঠে বলিল, "না মেজকাকা, ভগবান যে বড্ড ভাল। পীতুকেও যেমন ভালবাসেন, ওর মাকেও সেই-রকম ভালবাসেন কিনা। আর ওপরে

গেলেন না। আর অন্ধকারও রইল না। পীতুকে কত চুমু খেলেন, কত আদর ক'রে কত সব কথা বললেন, পরীরাও কত চুমু খেলে, কত গালে হাত বুলিয়ে বললে—'তোমার মায়ের কাছেই এবার থেকে তোমার জন্তে ভগবান থাকবেন পীতু, সেইখানেই তোমার জন্তে ধ্রুবলোক গড়ে দেবেন। তার পর আবার কত আলোর মধ্যে দিয়ে, কত বাজনাবাদ্যির মধ্যে দিয়ে, চাঁদের নৌকো করে নদী বেয়ে পীতুকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। হ্যাঁ মশাই, নিয়ে এলেন নামিয়ে, না হলে পীতু যখন উঠল, কি করে দেখলে ঠিক যেমন ক'রে মায়ের হাত বুকে নিয়ে শুয়েছিল, সেই-রকম করেই রয়েছে—?………আর মেজকাকা, কি আশ্চর্য্য জান?"

প্রশ্ন করিলাম—"কি?"

"আঁচল যে কেটে পীতু চলে গিয়েছিল কিনা?—উঠে দেখলে একটুও কাটা নেই। ভগবার যদি আসেন নি তো-কে জুড়ে দিয়ে গেল মেজকাকা? তুমি পার? আর পীতু দেখলেও যে নিজে। যখন চোখ খুললে না? দেখলে ভগবানের পাহাড়ের বাড়ির ওপরে নতুন সূয্যির আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে—কত গান হচ্ছে—মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে; আর রাঙা মেঘ দিয়ে গড়া সোনার সিঁড়ি বেয়ে ভগবান তার পরীরা আর সোনার পোষাক পরে বাজনা বাজিয়ে যারা সঙ্গে এসেছিল—সব ফিরে যাচ্ছে………হ্যাঁ দেখলে পীতু মেজকাকা; তখন তার একটু মনও কেমন করেছিল—মনে হচ্ছিল; ভগবান্ এত ভাল, এত লক্ষ্মী; কিন্তু পরীরা যে বললে পীতুর মায়ের কাছে থাকবেন সর্বদা—যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন কোন দিন?………"

পাউডার বনাম ধুলা

এ এক অসহ্য কাণ্ড হইয়াছে, ভুলু আর পারে না; বিছানা থেকে নামিয়া মানুষে কোথায় একটু চলা ফিরা করিবে তা নয়, একেবারে গা মোছা, পাট করা জামা পরা, পাউডার মাখা, চুল আঁচড়ানোর ঘটা; তাহার পরই সোনা ছেলে হইয়া একবাটি দুধ খাও, তাহার পরই ঝিয়ের কোল আর পেরাম্বুলেটর ঠেলাগাড়ি। এদিকে তো সমস্ত বাড়িটাতে একটু ধুলো বা একটু কাদার খোঁজ নাই, যদি কোনরকমে ঝিকে ফাঁকি দিয়া কি মায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া বাগানের দিকে গিয়া একটু

সংগ্রহ হইল তো বাড়িতে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে; আবার খোয়া আবার মোছা আবার জামা বদলানো, যেন কতই না অন্যায় করিয়াছে খোকা! অথচ চারিদিকেই তো আরও সবাই রহিয়াছে—কাহারই বা এত দুর্দশা? সামনের বাড়িতে কাতু-দিদির মার খোকা, কখনও জামা ইজের পরা, কখনও শুধু জামা, কখনও শুধু ইজের, কখনও আবার-কিছু নাই। কি যে হয় মনে ভুলুর ওকে দেখিলে! আর ভুলুর কুকুর তো মিছিমিছি, কালো কাপড়ের; কাতুদিদির মার খোকা একেবারে সত্যিকারের কুকুর লইয়া খেলা করে, লাঠি লইয়া পড়ায়, ঘাড়ে বালিস করিয়া শোয়, ঘোড়া করিয়া পিঠে চড়ে! সেদিন যখন ঘোড়াটা ওকে ঢুম করিয়া ফেলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল! ভুলু একেবারে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া গিয়া আপনা-আপনিই হাততালি দিয়া উঠিয়াছিল, জ্যান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে সত্যি সত্যি পড়া খুব মজার নয়? বেশ মনে পড়ে ভুলুর—ওর একবার মনে হইয়াছিল ও যদি কাতুদিদির মার খোকা হইত আর কাতুদিদির মার খোকা যদি ওর মার খোকা হইত তো কি মজাটাই যে হইত!

বেশ, চুল যদি আঁচড়াইতেই হইবে; পাউডার যদি মাখিতেই হইবে তো তাও তো ভুলু নিজেই পারে। পাশের বাড়িতে ওদের খুকু পারে আর ভুলু পারিবে না কেন? খুকু তো ভুলুর চেয়ে অনেক ছোট, দিদিকে এখনও ডি ডি বলে। সেদিন মা যখন ভুলুকে লইয়া পালঙে শুইল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল—ভুলু একটু মাথা তুলিয়া জানালা দিয়া দেখিল—খুকু ওর মার এতবড় চিরুনি লইয়া নিজের চুল নিজে আঁচড়াইতেছে, তাহার পর কাজল পরিল, কত পাউডার মাখিল, এক মুখ পাউডার; মা ভুলুকে যা মাখাইয়া দেয় তাহার চেয়ে ঢের বেশি। সব মায়েই দুষ্টু, খুকুর মা আসিয়া কাড়িয়া লইয়া খুকুকে মারিল। তা বেশ তো, ভুলুর মাও না হয় মারুক না ভুলুকে; কিন্তু চিরুনি-পাউডারের বাক্স অত উঁচুতে না রাখিয়া খুকুর মায়ের মত আরশির নিচে টানা বাক্সয় রাখিয়া দিক না।···ভুলুর মা যেন আরও দুষ্টু! খুকুর মা মারে বড্ড খুকুকে, তবু কিন্তু ভুলু যদি খুকুর মায়ের খোকা হইত আর খুকু যদি ভুলুর মায়ের খুকু হইত তো কী ভাল যে হইত ভুলু ভাবিয়াই কূল পায় না।

যতক্ষণ দুপুর বেলা থাকে, ও বাড়িতে খুকুর মাও ঘুমায়। ওবাড়িতে খুকু রোজ কত নূতন নূতন খেলা করে, আর ভুলু বালিশ থেকে একটু মাথা তুলিয়া জানলার মধ্য দিয়া দেখে, মনে হয় কাতুদিদির মার খোকা না হইতে পারুক, পাশের বাড়ির খুকু হইলেও দুঃখ ক্লেশ থাকিত না।

বিকাল বেলা আবার সেই গা মোছা, চুল আঁচড়ান, পাউডার মাখা ; আবার ঝি, আবার একবাটি দুধ খাইয়া সেই পেরাম্বুলেটার।··· সেদিন ঝিয়ের মেয়ে কোঁচড়ে করিয়া মকাই ভাজা খাইতেছিল, কি সুন্দর জিনিস! কি সুন্দর গন্ধ! মুঠোর সবগুলাও শেষ করে নাই ভুলু, বাড়িতে একেবারে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ঝিয়ের কাছে তার মেয়েটা মার খাইল, মায়ের কাছে ভুলুর শুধু মার খাইতে বাকি রহিল। হাতের মকাই কাড়িয়া ছড়াইয়া ভুলুকে ধমকাইয়া সে কী কাণ্ড! সন্ধ্যা পর্যন্ত ভুলুর কান্না থামে নাই।

এক এক সময় মনে হয়, মা খুব ভালো ; চুমা খাইয়া বুকে চাপিয়া কত আদর করে, সত্যই মনে হয় মা তাহাকে খুব ভালোবাসে। তবুও এমন কেন? কী ভালো লাগে ভুলুর, একেবারেই কেন বুঝিতে পারে না মা? ঝি তো বেশ বোঝে, সে তো বেশ দুধের বাটির বদলে তার মেয়েকে কোঁচড় ভরিয়া মকাই ভাজা দেয়!

মুখ বুজিয়া সব সহিয়া যায় ভুলু, কি আর করিবে? বাবা, মা, ঝি সবাই যে তাহার চেয়ে অনেক বড়। ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যখন ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবে তখন সব করিবে, খালি গায়ের উপর শুধু একটা গামছা ফেলিয়া গাছে উঠিবে, জলে নামিবে, আর কোথায় কোথায় চলিয়া গিয়া কত কি যে করিবে, তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারে না ভুলু। অনেক দূরের আরও পরে যে 'কত কি'র দেশ আছে—দিনে মার কাছে যার গল্প শোনে ভুলু, রাত্তিরে ঘুম-বুড়ি যেখানে লইয়া যায়, একেবারে সেইখানে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি যে বড়ই হইয়া উঠিতেছে না। রোজ সকালে আরশির সামনে গিয়া দাঁড়ায় ভুলু, আশা করে এক আরশি না হোক, অন্তত আধ আরশি বড় হইয়া গেছে, দেখে ঠিক তেমনটিই আছে। মনটা যে কি হইয়া যায় ভুলুর!

ভুলুর স্বপ্নের দেশ শুধু মায়ের গল্পে বা ঘুম-বুড়ির কাছেই নাই। আরও একটা আছে তাহাদের বাগানটার পিছনেই। বাগানের উঁচু দেওয়ালের জন্ম দেখিতে পায় না ভুলু, কিন্তু মাঝে মাঝে সেখান থেকে কত রকম গলায় কত রকম হাসি, চেঁচামেচি, কত রকম নূতন নূতন কথা যখন ভাসিয়া আসে, ভুলু বেশ বোঝে ওখানে যা খুশি লইয়া যা খুশি খেলা করিবার একটা দেশ আছে, ওখানে ছেলেরা মেয়েরা জামা পরে না, পাউডার মাখে না, পেরাম্বুলেটারে চড়ে না, তাদের কাতুদিদির মায়ের খোকার চেয়েও মুক্তি, পাশের বাড়ির খুকুর চেয়েও নিজের হাতে যা খুশি

রাখিবার সুযোগ।······একেবারে বাগানের পাশেই বলিয়া ভুলুর মনটা এক একবার বড্ড কেমন করিয়া উঠে। দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, খল খল, খিল খিল, সেই অনেক রকম গলায় অনেক রকম হাসি উঠিল; চুমুক দেওয়া বন্ধ করিয়া দাঁতে বাটি কামড়াইয়া ভুলু দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে। এক একদিন দুপুরে সামনের সাদা রোদ্দুর তখন যেন চুপ করিয়া কি ভাবিতে থাকে, ভুলু ঘুমন্ত মায়ের পাশে বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া—পায়ের বাড়ির খুকুর নিজের হাতে কাজল পরা দেখে, দেওয়ালের ওদিকে হঠাৎ সেই রকম কত গলায় কত রকমের শব্দ ওঠে—হাসি, চেঁচামেচি, যাখুশি-তাই শব্দ বাড়িয়া উঠে—ওদের মায়ের বকুনিতে আরও উঠে—শুধু বাড়া নয়, শব্দ-গুলা চারিদিকে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে! বেশ বোঝে ভুলু—শুধুই যা খুশি 'তাই চেঁচামিচি হয়, কতরকম ছেলে কতরকম করিয়া খেলা করে এই চমৎকার দুপুর-রোদ্দুরে, যত খুশি ছুটিয়া যেখানে খুশি শুইয়া বসিয়া যা খুশি মাখিয়া।······খুকুর অত চমৎকার-কাজল-পরা দেখা ছাড়িয়া দেওয়ালের দিকে চায়, কী যে মনে হয় ভুলুর, পায়ে যেন সুড়সুড়ি লাগে—ইচ্ছা হয় যাই ছুটিয়া—ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবার আর দেরি সয় না।···ভুলু জানে, তবু দোরের দিকে চায়—একেবারে উঁচুতে লোহার ছিটকিনি দেয়া যেখানে দোরটা বন্ধ করা সেইখানটিতে গিয়া চোখ পড়ে······

ভুলু যে বাহিরে না যায় এমন নয়। রোজ সকালে বিকালে ঝি পেরাম্বুলেটারে করিয়া তাহাকে মা-গঙ্গার ধারের কালো রাস্তা দিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। একটু ভালো লাগে ভুলুর—শুধু বাড়ির চেয়ে ভালো, তার বেশি আর ভালো লাগে না। একই রকম গাছ দেখে ভুলু, একই রকম মা-গঙ্গা, একই রকম রাস্তা, সকালে যখন যায় দাড়িওয়ালা বুড়ো সেপাই নাহিয়া, লোহার খাঁচায় রাঙা ঠোঁটের পাখি —"সীতারাম কহো, সীতারাম কহো" বলিতে বলিতে ভুলুর পেরাম্বুলেটারের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। ভুলুর খানিকটা ভালো লাগে আর-খানিকটা কেমন কেমন লাগে ঠিক বুঝিতে পারে না, শুধু ফিরিয়া দেখে পিছনের পাখিটা কোন মতেই সীতারাম বলিতেছে না। ভুলুর আশ্চর্য বোধ হয়—খাঁচা কি পাখিদের পেরাম্বুলেটার?

এরপর থেকেই ভুলুর দেওয়ালের বাহিরের সেই জায়গাটার কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে। এক একদিন ঝিকে বলে, এদিনে রোজ যেখানে যায় সেখানে না গিয়া মাটির রাস্তা দিয়া ওদিক্ পানে চলুক না, বেশ হইবে; কাহারা সব অত খেলা করে ভুলু দেখিবে, পেরাম্বুলেটার থেকে নামিবে না, কিছু না। ঝি গালে হাত দিয়া হাঁ করিয়া চায়, বলে—"ছি, ছি, ওদিকে কেউ যায়? যত ছোট লোকদের

বাড়ি, মাঁ শুনলে কি বলবে ?"

ভুলু বলে সে মাকে কখনও বলিবে না। শুধু কাহারা খেলা করিতেছে দেখিবে।

ঝি আরও হাঁ করিয়া পেরাম্বুলেটার দাঁড় করায়, বলে—"ছি ছি খোকা, নোংরা ছেলেরা খেলা করে, ধুলোমাখা ন্যাংটো, তাদের কাছে যেতে আছে নাকি? দুষ্টু তারা সব।"

আবার পেরাম্বুলেটার চালাইয়া যায়। প্রথমে ভুলুর কষ্ট হয়, দুষ্টু ছেলেরাই যে ভালো এটা কেউ বোঝে না কেন? তাহার পর রাগ হয়, ঠিক করে এবার ঝি যখন কিছু বলিবে, সে কোন মতেই কথা কহিবে না। সেপাইয়ের পাখির মত ঠোঁট দুইটা বন্ধ করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে।

তাহার পর একদিন ভুলু তাহার খেলার রাজ্যের পথ আপনিই আবিষ্কার করিল।

সেদিন মা ভুলুর বাবাকে বলিল—"ডাক্তারবাবুর বৌ এসেছে, ভাবছি বিকেলে গিয়ে দেখা করে আসব।" বাবা বলিল—"যাও।" পেরাম্বুলেটারে না গিয়া ভুলু মায়ের সঙ্গে নতুন কাকিমার বাড়ি গেল।

ওদিকে আর কখনও যায় নাই ভুলু। বেড়াইতে যেমন সামনের ফটক দিয়া যায় এ তেমন নয়। বাগানের পাশের দিকের দরজা দিয়া উহারা বাহির হইয়া অন্য রাস্তায় পড়িল, তাহার পর বাগানের অন্যদিকের দেওয়ালের পাশ দিয়া চলিল। দেওয়ালটা শেষ হইয়া যেখানে আবার ওদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে—সেখানে আসিতেই একপাল কালো কালো ছেলেমেয়ে সামনের একটি সরু রাস্তা দিয়া হাসিতে হাসিতে চেঁচামেচি করিতে করিতে এ ওর গায়ে পড়িতে পড়িতে একটু আসিয়াই আবার সেইভাবেই ছুটিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল আর তাহাদের দেখা গেল না। কাহারও হাতে হলদে ফুল শুদ্ধ গাছের ডাল, কাহারও হাতে ছড়ি, কাহারও হাতে আরও কি, ঐটুকু সময়ে ভালো করিয়া দেখা গেল না। ভুলুর যে কি মনে হইল, ইচ্ছা হইল ঝিয়ের কোল থেকে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই তো হয় না, তাহার উপর আবার মা রহিয়াছে। বাড়ি থেকে যেমন শোনে সেই রকম হাসি হল্লা শুনিতে শুনিতে ওরা নতুন কাকিমাদের বাড়ি চলিয়া গেল।

ভুলুর মনে আছে সে রাত্রে ঘুমের বুড়ি ওকে সেই বাগানের পিছনের খেলার রাজ্যেই লইয়া গিয়াছিল। কত যে খেলা, কত যে হাসি-হল্লা! ভুলু এমনটা আর কখনও দেখে নাই, সে নিজেও কি কম খেলিল—কম ধুলাটা মাখিল!

পরদিন দেওয়ালের ওধারে আবার যখন সেই শব্দ উঠিল, ভুলুর মনটা অন্য দিনের চেয়েও ছটফট করিতে লাগিল, মনে হইল রাত্তিরের যত চেনা শোনা ছেলেমেয়ে

সবাই তাহার জন্যও যেন ওদিকে হাকাহাকি লাগাইয়া দিয়াছে।……জামা জুতো পরিয়া পাউডার মাখিয়া যখন ভুলু পেরাম্বুলেটারে উঠিল, কান্নায় তাহার গলাটা বুজিয়া আসিয়াছে।

সে রাত্তিরেও আবার ঘুমের বুড়ি আসিয়া নূতন চেনা পথে তাহাকে বাগানের ওদিকে খেলার রাজ্যে লইয়া গেল।

তাহার পরদিন মা না ঘুমাইয়া কাকিমাদের বাড়ি গেল দুপুরবেলা। ভুলু রহিল ঝিয়ের কাছে। ঝি যখন ঘুমাইয়া পড়িল, ভুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া বাগানের ওপাশের দরজা দিয়া ওদিককার রাস্তায় পড়িল। ওদিকে সেই দুপুরে খেলার চেঁচামেচি করিতেছে, রাস্তাটাকেই ভয়—মনে হইতেছে রাস্তাটা যদি না থাকিত, একেবারেই ওখানে গিয়া পড়া যাইত তো বেশ হইত, তবুও একটু অগ্রসর হইল ভুলু, আর খানিকটা গেলেই ঐ খেলার রাজ্যের সরু রাস্তাটা……কিন্তু ভুলুর আর সাহসে কুলাইল না। আস্তে আস্তে ফিরিয়া লক্ষ্মী ছেলের মতন ঝিয়ের পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

পরের দিনের কথা ভুলু জীবনে কখনও ভুলিবেনা।

সন্ধ্যার একটু পরে অনেক দূরে কোথায় এক সঙ্গে অনেক বাজনা বাজিয়া ওঠার শব্দ হইল। ঝি বলিল—বাজারের মাড়োয়ারীর বাড়িতে বিয়ে আছে, স্টেশন থেকে আলো বাস্তি করিয়া বর আসিতেছে। তাড়াতাড়ি ভুলুকে কোলে লইয়া, ভুলুর দাদার হাত ধরিয়া ঝি গঙ্গার-দিকের রাস্তার ধারে ফটকটায় গিয়া দাঁড়াইল। বাদ্যির আওয়াজ ক্রমেই চড়িয়া গেল, আর একটু পরেই কালো রাস্তার চারিদিকে আলোর আলোয় ছড়াছড়ি। তাহার পরই বরের দল আসিয়া পড়িল—পা পর্যন্ত রাঙা জামা-পরা, হাতে সাদা সাদা চকচকে লাঠি লইয়া কত লোক; রাঙা জামা পরা ঘোড়া, রাঙা জামা পরা হাতি। তারপর দুটি শাদা ঘোড়ায় টানা প্রকাণ্ড একটা পেরাম্বুলেটার, তার উপর জমজমে ঝকঝকে পোষাকপরা বর, চোখে কাজল, মুখে সিঁদুর, চন্দন—কত কি মাখান, মাথায় টকটকে ঝকমকে পাগড়ি; তার সঙ্গে আরও সবাই, অতটা নয়, তবু খুব সাজগোজ। বরের মাথার উপর সোনার ছাতা, পিছনে একটি লোক ধরিয়া আছে। ……ভুলুর একবার মনে হইল—বৌ কোথায়? কিন্তু তখনই বরের পেরাম্বুলেটার আগাইয়া দিয়া আবার আসিল সাজগোজ পরা ঘোড়া হাতি, পতাকা হাতে রাঙা জামাপরা ছেলের দল, আর সঙ্গে সঙ্গে মটোর, ঘোড়ার গাড়ি, টমটম, কতরকম জামা কাপড় পরা কতরকম লোক যে সকলের মধ্যে।……এর সঙ্গে সুন্দর কতরকম যে আলো, কি সব বাদ্যি, একরকম

হইয়াছে ভুলু—কিন্তু কখনও বদি দেখিয়াছে! কনের কথা আর মনেই রহিল না।

এর উপর আবার মাঝে মাঝে কতরকম বাজি পোড়ানো! শুধু তাই নয়, বোধহয় এসবের চেয়েও যা ভালো লাগিল, অন্তত যা ভুলুর পা দু'টাতে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল, তা আগে পাশে পিছনে সমস্ত বরের দল ঘিরিয়া ছেলেদের নাচ, খেলা, চেঁচামেচি, যা খুশি তাই করা, কাহারও হাতে একটা ফুলের ডাল, কাহারও হাতে আর কিছু; আমোদের চোটে এক একজন রাস্তার উপরই লুটাইয়া পড়িয়া আবার ছুটিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

এতবড় আশ্চর্য কাণ্ড ভুলুর জীবনে আর কখনও হয় নাই। ওর মনে হইল যেন মায়ের মুখে শোনা সাতমহলের রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে যাওয়া রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্পের সঙ্গে ভুলুদের বাগানের ওদিকের খেলার রাজ্যটা কি করিয়া মিশিয়া গেছে।——এতবড় অসম্ভব ব্যাপার ভুলু যেন ঠিক বুঝিতে পারেনা। ঠিক মনে হয় বাজনা বাদ্যি লইয়া বরের দল যতদূরে যায়, খেলার রাজ্যের কালো ছেলেদের চেঁচামেচি যত আরও কম শোনা যায়, ভুলু ভাবে এইবার বুঝি তাহার ঘুমটা যাইবে ভাঙিয়া, দেখিবে বিছানায় মায়ের কাছে শুইয়া আছে, এইবার বুঝি মা ডাকিবে—"ঝি, খোকার ইজের জামা নিয়ে আয়তো।" তাহার পর চিরুনি পাউডারের কৌটা লইয়া বসিবে।······ভুলু বেশ স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে রাতে ঘুমের বুড়ির দেশেও কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল; এত অদ্ভুত যে ঘুম ভাঙ্গার পর আর স্পষ্ট কিছুই মনে পড়িল না ভুলুর। শুধু যেন কোথায় যাওয়ার, কি করিবার জন্য মনটা সমস্তদিন কেমন করিতে লাগিল। সে রাতেও ওই সব কাণ্ড, পরের দিন সমস্ত সকালটাও সেই মন কেমন-কেমন করা।

নতুন কাকিমাকে ভুলুর মায়ের বড় ভালো লাগিয়াছে, সেদিন দুপুরে আবার ভুলুকে ঝিয়ের কাছে রাখিয়া গল্প করিতে গেল।

ভুলুদের বাগানের পিছনে, দেওয়ালের ঠিক পরেই একটা বস্তি। মাঝখানে দু'টা আম আর একটা হলদে ফুলে ভরা সোঁদালগাছের নিচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাশে একটা ডোবা। এই জায়গাটাকে তিন দিকে ঘিরিয়া কতকগুলা বাড়ি। এই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই আমসোঁদালের তলায় রোপর দিন জমা হইয়া ওদিকে ভুলুর মাথায় খেলার রাজ্যের স্বপ্ন রচনা করে।

দু'দিন থেকে ওদের মস্ত-বড় একটা উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। তাহার অনুপ্রেরণাটা পাওয়া মাড়োয়ারীদের জলুস থেকে। এরাই ছুটিয়া, গড়াইয়া, হাসিয়া,

হল্লা করিয়া সমস্ত উৎসবটাকে সেদিন শরীরে মনে মাখিয়া লইয়াছিল। আজ ওদের নিজেদেরই এক বিবাহের জলুস্ বাহির হইবে।

সব একরকম জোগাড় হইয়াছে।

ঘোড়া-ঘুড়ি মিলাইয়া ছয়টা থাকিবে—তাহার মধ্যে তিনটা ছাগলী, দুইটা খাসী, একটা বোকা-পাঁঠা। তাদের শিঙে কলকে ফুল আটকাইয়া, পিঠে ছেঁড়া কলা পাতার মখমলের ঝালর বাঁধিয়া সাজাইবার চেষ্টায় একদল মাতিয়া আছে। কতরকম পাতা শুদ্ধ ডালের কতরকম পতাকা। আলোয় আলোয় তো ছয়লাপ হইয়া গেছে। বাজনাবাদ্যির ঢালোয়া ব্যবস্থা—গোটা দশেক পেঁপেডাঁটার বিলাতি সানাই, কলা-পাতার ডাঁটার পটপটি করিয়া ঝাঁঝর করতাল হইয়াছে। একটা একদিক ছেঁড়া আসল ঢোলও জোগাড় হইয়াছে। বাজনার মহলায় সমস্ত জায়গাটা গমগম করিতেছে। সবচেয়ে ভালো পাওয়া গেছে হাতিটা—কাছেই ডোমপাড়া, একটা শুওর ছিটকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ডোবায় চোবাইয়া পরিষ্কার করিয়া এখন তাহার গায়ে মাথায় হাতির মত প্রসাধন হইতেছে। কী শুঁড়, কী হাতির মতন ছোট ল্যাজ! কী কালো কালো লোমে ভরা হাতির মতন ঢলঢলে শরীর। এত সত্যিকার কাছাকাছি কোনটাই হয় নাই। হুল্লোড় পড়িয়া গেছে তাহাকে লইয়া।

এদিকে একদল বর-কনে সাজান লইয়া পড়িয়াছে। কাছেই ফুলপাতা দিয়া সাজানো বর-কনের গাড়ি,—রাস্তার ময়লা ফেলা একটা একচাকার টিনের গাড়ি—কাছের ডোমপাড়া হইতেই সংগ্রহ হইয়াছে। ছাগলকে রাজি করান গেল না, তাই দুইটা ওরই মধ্যে একটু ফরসাগোছের ছেলেকে শাদা ঘোড়া করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যথারীতি পা ঠুকিতেছে আর লাগাম চিবাইতেছে। গাড়ির পেছনে একটা পাকা পেঁপে-পাতার ছাতা লইয়া একটি ছেলে মোতায়েন হইয়া আছে।

এমন সময় হঠাৎ একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"আরে খোকাবাবু! খোকাবাবু! খোকাবাবু এসেছে।"

দেখা গেল সরু রাস্তাটা যেখানে আসিয়া ফাঁকা জায়গাটায় পড়িয়াছে সেখানে বাগানের ওদিককার বাঙালী বাবুর ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া, খালি পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলা, ইজেরের উপর একটা পরিষ্কার নীল জামা। খোকাবাবু মুখে চারিটা আঙুল পুরিয়া উৎসব আয়োজনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিবাহ-মিছিলের এমন অভিজাত দর্শক পাইয়া একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

প্রায় সমস্ত দলটা চেঁচামেচি করিতে করিতে আসিয়া ভুলুর সামনে জড়ো হইল।

ভুলু এতক্ষণ আর একটু আড়াল থেকে সব দেখিতেছিল—কী অপূর্ব গাছ। কী যা-খুশির ব্যাপার। যত খুশি ফুল ফুটান গাছ। যেদিকে খুশি মুখ ফেরান বাড়ি-ঘর, যেমন খুশি সেই রকম দাঁড়াইয়া আছে—কোনটার মাথায় রাঙা-খোলা, কোনটার মাথায় ভাঙ্গা-খোলা, কোনটার খড়ের চাল, কোনটার খড়ের মধ্য দিয়া বাঁশপাতা বাহির হইয়া আসিয়াছে, কেহ যেন কিছু বলিবার নাই, শাসন করিবার নাই।......ডোবায় হাঁসের পাল, নামিতেছে, উঠিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে, ডুব দিতেছে। আর এই খেলার সরঞ্জাম! কত ছেলে—ন্যাংটো, কোমরে শুধু ঘুন্‌সি, কাহারও কোমরে ছোট্ট একফালি কাপড, কাহারও ময়লা, ছেঁড়া হ্যাফপ্যাণ্ট, কাহারও শুধু গায়ে একটা বড জামা—ওইরকম মেয়েরাও।......শুওর, পিঠে পাতার ঝালর দেওয়া ছাগল, শিঙে ফুল! আর কত রকম বাজনা।......ভুলুর যেন আবার সেই বিয়ের দিনের মত মনে হইতেছে—এখনই মায়ের কোলের কাছে জাগিয়া উঠিবে যেন......

নিঃসাড়ে কখন আগাইয়া রাস্তার মুখটিতে আসিতে ছেলেমেয়েরা, "খোকাবাবু! খোকাবাবু!" করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।......

ভুলু যেন কি রকম হইয়া গেছে, লজ্জা, একটু বোধহয় ভয়, আর তার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকখানি আনন্দ। প্রথমটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্নে, মন্তব্যে, প্রশংসায়, আদরের মিষ্টি কথায়, সবার উপর ওদের আহ্লাদের ছোঁয়াচ লাগিয়া, ভুলুর মনটাও যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, হাত পা যেন হাল্কা হইয়া আসিতে লাগিল।

"খোকাবাবু, তামাসা দেখতে এসেচ?"

ভুলু মাথা নাড়িল।

একটু গুজগুজ চাপা খুশির হাসির পর—

"খোকাবাবু, খেলবে আমাদের সঙ্গে?"

ভুলু এবার কথা কহিয়াই বলিল—"খেলব।"

বিয়ের দিন রাস্তায় যেমন ফুলঝুরির বাজি হইয়াছিল, যেন সেই রকম গোছের একটা কাণ্ড হইল—"খোকাবাবু খেলবে! খোকাবাবু খেলবে!" শব্দে সমস্ত জায়গাটা ভরিয়া গেল। তাহার সঙ্গে হাসি হাততালি, কত ছেলে ডিগবাজিই খাইয়া গেল—আহ্লাদে যে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছে না।......ভুলুকে সঙ্গে করিয়া সবাই উঠানের মাঝখানে লইয়া গেল। বুঝাইয়া দিল কোন্‌টে হাড়ি,

কোনটে ঘোড়া, কোনটে আলো, কোনটে বাঁশি; তাহার পর আসল জায়গায় লইয়া আসিল—যেখানে বর-কনেকে সাজানো হইতেছে।

ভুলুর বয়সী বর, একটু ছোট কনে।

গায়ে যত খুশি ধুলা, তাহার উপর সাজানো হইতেছে। কত টিপ, কত ফুল, কত কত কি! কনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ধুলায় মাখা রাঙা চুল, কোমরে একটা ছোট্ট ময়লা কাপড়, একেবারে নূতন লোক দেখিয়া একটু জড়োসড়ো হইয়া গেছে।

বোধহয় একসঙ্গে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করার জন্য সবার সাহস বাড়িয়া গেছে। একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"খোকাবাবু তুমি বিয়ে করবে?"

জিনিসটা এমন লোভনীয় যে তিন বছরের ছেলেরও রাজি হইতে আটকায় না, আশী বছরের বুড়োরও রাজি হইতে আটকায় না, ভুলু বিনা বিচারেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—, "করব।"

এর পরে যে আহ্লাদের ফুলঝুরি ছুটিল, তাহার কাছে আগেরটা যেন কিছুই নয়।··· দিকে দিকে কত ছেলে ছুটিয়া গেল, কত ফুল আসিল, কত কি আসিল! এত সুন্দর আর সবদিক দিয়া এত উপযুক্ত বর পাইয়া মৌলিক বরের স্থানে তাহাকে বসান হইল। প্রসাধন আরম্ভ হইয়া গেল।

গঙ্গার লালচে মাটি দিয়া মুখময় চন্দনের ফোঁটা, যেটুকু জায়গা বাকি রহিল পুঁইশাকের পাকা ফলের বেগুনে রং দিয়া কত রকম রেখাচিত্র, পায়ে পুঁইয়ের রসের আলতা, আরও কত রকম দাগ। কামিজের পকেটে ফুল, কলারের চারিদিকে ফুল; মাথায় খুব বেশি ফুলওয়ালা একটা সোঁদালের ছোট ডাল বাঁধিয়া মাথার টোপর হইল, টোপর, মুকুট, পাগড়ি যা বলিবার অভিরুচি হয়। ভালো করিয়া সাজান হইল। শরীরের যেটুকু খালি ছিল পুঁইয়ের রস আর গঙ্গার লাল মাটিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে মিছিলও সাজিয়া উঠিল—সব আগে বাজনা, তাহার পর আলো, তাহার পর ঘোড়া, তাহার পর হাতি, তাহার পর বরের গাড়ি। বরের গাড়ির পিছনে আবার ঘোড়া, আবার পতাকা, আবার বাজনা, আবার আলো।

কনেকে তুলিয়া ঠেলাগাড়ির একদিকে বসান হইল। ভুলুর আহ্লাদে যে মনটা কি হইতেছে! পেরাম্বুলেটার চড়িয়া চিরকালটা কাটিল, কখনও সে এমনভাবে, এমন পেরাম্বুলেটারে চড়িতে পাইবে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বাজনা আরম্ভ হইয়া গেল। সমস্ত মিছিলটায় যাত্রা শুরুর একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল।

বরকে হাতের দোলায় করিয়া কয়েকজন মত্ত গোছের ছেলে উঠাইয়া গাড়ির কাছে লইয়া গেছে, এইবার গাড়িতে তুলিবে, এমন সময় একটা উৎকট চিৎকারে সবাই একেবারে জড়ভরতের মতন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, দেখিল সরু রাস্তার মুখে ছোট একটি দল লইয়া অফিসের কোটপ্যাণ্টে স্বয়ং বরকর্তা। মুখের চেহারা দেখিলে বোধ হয় না ছেলের বিবাহের এমন চমৎকার যোগাযোগে এতটুকুও খুশির ভাব আছে। অবস্থাটা বুঝিবার আগেই একটা মেয়েছেলে একবারে পাগলের মতন হইয়া এদিক পানে ছুটিল, মুখে "খোকাবাবু! ভুলুবাবু! সর্বনাশ! তুমি এখানে? আর আমরা সমস্ত সহর এক করে ফেললাম···কী ডাকাত ছেলে রে বাবা!"

ভুলুর বাবা অবশ্য তখনই চলিয়া গেলেন, কিন্তু এদিকে এক মুহূর্তেই সব ওলটপালট হইয়া গেল। কোথায় যে কে গেল, হাতি, ঘোড়া, আলো, বাজনা, ছেলে, মেয়ে, এক মুহূর্তেই যেন সব মিলাইয়া গেল।

প্রতি রাতের ঘুমের বুড়ির দেশের মতন এমন একটা ওলট-পালট যে, গলায় অত কান্না ঠেলিয়া আসিলেও ভুলু কাঁদিতে পারিল না, একটু হাত-পাও ছুঁড়িতে পারিল না। নীচে থেকে কুড়াইয়া বুকে চাপিয়া কত কি বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঝি যখন সরু রাস্তার মুখে, তখন ভুলু একবার ঘুরিয়া দেখিল সেই ফাঁকা খেলার রাজ্যে টিনের পেরাম্বুলেটারে বসিয়া কনে শুধু হাত পা আছড়াইয়া দারুণ কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। রাগে আরও একটা কিসে, কান্নার মতনই একটা আওয়াজ করিয়া ভুলু ঝিয়ের কোলে ছটপট করিয়া উঠিল। মায়ের গল্পের রাজপুত্র সাতমহলের রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে চলে—তাহারই কথা কি ভুলুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল?

আগামী প্রভাত

হার্ডিঞ্জ পার্ক। পাটনা।

সূর্যাস্ত হইতেছে। আজ খণ্ড খণ্ড মেঘ ছিল সমস্ত দিন, অস্তরশ্মি পড়িয়া রঙের বিচিত্র এক সুষমা সৃষ্টি করিয়াছে। অন্য কখনও হয় তো এ দৃশ্য অন্যভাবে দেখিয়াছি। আজ মনে হইতেছে এ সূর্যাস্ত যেন একখানি যুগের অবসান। স্থবির শীতের অন্ত্যেষ্টি সূচনা করিয়া এ যেন ফাল্গুনের হোলি খেলা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, একটা রাত্রির অন্তরাল, তার পরই আসিবে

নব প্রভাত। সহ্য করিব এ রাত্রিকে আমি, হয় তো অনুভবই করিব না। আমার মন যে চলিয়াই গিয়াছে পূর্ব দিগন্তে, আগামী দিনের প্রভাতকে সম্বর্ধনা করিয়া লইতে।

কি আনিবে সে প্রভাত? কোন্ নবীন পুষ্পদলকে প্রাণ দিয়া জাগাইয়া তুলিবে?

সামনে পার্কের রেডিওটা বাজিতেছে। কি বিশ্রী! যেমন কদর্য রেডিও, তেমনি কদর্যভাবে অবহেলাভরে রাখা, একটা কোথা হইতে ধার করা টুলের উপর। তাও সহ্য হয়; কিন্তু সহ্য হয় না ওর সঙ্গীত। একটা বাঁশী গেল পূরবীতে, এখন একটা গলাবাজি চালিয়াছে গজলে লয়লা মজনু ইশক্! হে ভগবান, আর কতদিন অসহায়ভাবে এই পূরবীর কাঁদুনি আর প্রেমের ভ্যানভ্যানানি শুনিতে হইবে? ঝুলি ঝাড়িয়া দেখ, নূতন কিছু শোনাও এ জাতটাকে।

রাস্তা দিয়া কয়েকখানা মিলিটারি লরি শহরের দিকে চলিয়া গেল! অত্যুগ্র বেগে পিচের রাস্তার উপর তাহাদের মসৃণ গতি করাতের মত একটা একটানা শব্দের জের টানিয়া চলিয়া গেল, মনে হইল বাতাস যে লয়লা মজনুর প্রেম-সঙ্গীতটা জমিয়া উঠিতেছিল, সেটাকে যেন দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল। খুশি হইলাম, এই ছিল ওর প্রাপ্য সাজা।

বুঝিতেছি মনটা একটু অন্যায় রকম বেশি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে আজ এই সন্ধ্যায়। সভ্যতা অন্তরের দরদ দিয়া যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার উপর এতটা আক্রোশ শোভা পায় না। এ যেন কতকটা যাহারা সেণ্ট পলের উপর বোমা ফেলিয়া যুগ যুগের শিল্পসাধনার নিদর্শনটাকে নষ্ট কারতে চায় তাহাদের মনোবৃত্তি। স্বীকার করি, এক দিক দিয়া আমার আজিকার মনোভাবের সঙ্গে মিল আছে, তবুও মনে হইতেছে যাহারা এতদিন ধরিয়া শুধু পূরবী গজলই গাহিয়া আসিয়াছে তাহারা একটু সরিয়া দাঁড়াক্। যাহারা নবযুগের নূতন সঙ্গীত গাহিবে তাহাদের আসরটা ছাড়িয়া দিক্ অন্তত কিছুটা দিনের জন্য।

পিছনের একটা কিসের চেঁচামেচি হইতেছে। ফিরিয়া দেখি মদীয় বন্ধু শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের শিশু পুত্রটির সহিত তাহার চাকরের কি লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। কাছে ডাকিলাম। প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাপার কি?"

চাকর বলিল, "বাবু, ও গাড়িতে থাকবে না, নেমে লাফালাফি করবে।"

একখানি পেরাম্বুলেটার। এক দিকে অরুণের ছেলে, এক দিকে একটি মেয়ে, সেদিন দেখিয়াছিলাম অরুণের বাড়িতে; ওর এক বন্ধু আসিয়াছে কলকাতা থেকে,

তাহারই কন্যা। মেয়েটি ছোট, কিন্তু ছেলেটির বয়স হইয়াছে; সে বয়সে এক বাঙালীর ছেলেদেরই পেরাম্বুলেটারে চড়িতে দেখিলাম। মনে মনে হাসিলাম। নকল যে। আসলকে একটু ছাড়াইয়া যাইবেই।

চাকরকে বলিলাম, "তা ছেড়ে দে না, বাগানের মধ্যে গাড়িতে চড়ে থাকবার দরকার বা কি?"

"জামা নষ্ট করে বাবু, গায়ে ধূলো লাগায়, পাউডার নষ্ট হয়ে যায়। দুষ্টু আছে, রাস্তায়ও ছুটে চলে যায়।" বলিলাম—"তা যাক্, নামিয়ে দে, আমি বাবুকে বলে দেব, বকবে না তোকে।"

খোকা নামিয়া গালের মধ্যে দুইটা আঙুল পুরিয়া দিয়া মুখটা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইল আমার পানে একটু আড়ে চাহিয়া।

কৌতুক বোধ হইতেছিল, প্রশ্ন করিলাম,—"কি?" "খুকু যাবে।"

আদমের ভাবটা তো বোঝা গেল, ঈভ্ কি বলেন জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, "কি খুকু?"

"আমি দাবো।"

বেশ, উভয়েরই তাহা হইলে নিরাপদ পেরাম্বুলেটারে বৈরাগ্য আসিয়াছে। যুগলক্ষণ ভালো। চাকরটাকে বলিলাম, "দে নামিয়ে ওকেও।"

এত বড় অভাবনীয় ব্যাপার খুকুর জীবনে বোধ হয় কখনও হয় নাই। নামিয়া মুক্তিদাতার মুখের পানে একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল।

খোকা ডাকিল—"এসো খুকু।"

হাতপাকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া দুই জনে যেন প্রজাপতির মতোই সামনের হরিৎ ক্ষেত্রটুকুতে ছড়াইয়া পড়িল।

হার্ডিঞ্জ পার্কের রেডিওতে হঠাৎ একটা মিলিটারি ব্যাণ্ডের মূর্ছনা উঠিল। অরুণের ছেলে হঠাৎ খেলার মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল—"খুকু, এদিকে এসো, এসো, সুন্দর বাজনা বাজছে। ...এমনি করে দাঁড়াও, আর এমনি করে চলতে হয়।"

ঘাস ছাড়িয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া কাঁকরের রাস্তায় নামিয়া গেল, এবং বাজনার তালে তালে পা ফেলিবার প্রয়াসের সঙ্গে থস্ থস্ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

আবার হাসি পাইল—একেবারে মেয়ে পুরুষে উভয়ে মিলিয়া? মনের কোথায় উত্তর পাইলাম— 'নবযুগের এই তো গতি; যে কোন দিকে আজ চাহিয়া দেখো না।'

কিন্তু আসিল কোথা হইতে এ খেয়াল, এ আদর্শ?

মনই উত্তর দিল—'নবযুগের হাওয়াতেই আছে বোধ হয়।'

নূতন হইয়া জন্ম লইবার জন্য সূর্যদেব আঁধারের গর্ত আশ্রয় করিলেন।

তেজারতি

ভাইপো কোঁদন মাথায় পাকা চুল তুলিতে তুলিতে একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "মেজকাকা, একটা কথা বলব, রাখবে?"

অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াছি; ছুটি করাইয়া লয়, সিনেমা দেখিবার অনুমতি আদায় করিয়া লয়; উত্তর করিলাম, "না শুনে বলতে পারছি না; কথাটা কি?"

একটু চুপ করিয়া, তাহার পর সঙ্কোচটা কাটাইয়া বলিল, "তেমন শক্ত নয়, —বলছিলাম চুল তোলার পয়সা একটু বাড়িয়ে দেবে না?"

একটা বই পড়িতেছিলাম শুইয়া শুইয়া, সামনের কমার কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলাম, "হঠাৎ?"

"অনেক দিন থেকে তুলছি তো, হাত পেকে এসেছে।" এবার আমাকেই একটু চুপ করিয়া যাইতে হইল, কালে কালে এ হইল কি? পাকা চুল তোলারও এক্স্‌পার্ট রেট চায়। মনের ভাবটা প্রকাশ না করিয়া সহজ কণ্ঠেই একটু মৃদু ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "বলি পয়সারও অভাব বেড়েছে নাকি?"

বোধ হয় সেকেণ্ড পাঁচ-সাত বিলম্ব হইল, তাহার পর আমার চেয়েও সহজ কণ্ঠে বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, মেজকাকা, একটু দরকার পড়েছে!"

বেশ বোঝা যায় প্রশ্নটা করিয়া ওর যেন মস্ত একটা সুবিধা করিয়া দিয়াছি।

প্রশ্ন করিলাম, "দরকারটা কিসের শুনতে পারি?"

"একটা ব্যবসা ফাঁদব মনে করেছি।"

কোঁদনের বয়স সাতবছরের কয়েক মাস উপরে, সবে স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনের গঠনের দিক দিয়া একটু ভারিক্কে গোছের, মুখে স্কুলের ছেলেদের চেয়ে স্কুলের মাষ্টারদের বুলিই বেশি, বাপের পায়ের সামনে নেকড়ার বল রাখিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, কোমরে দুটি হাত, শটটা ভাল হইলে পিঠ ঠোকার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া বলে—"গুড্‌ গুড্‌ এক্‌সেলেণ্ট।"

চুল তোলার 'হাত পাকা'র কথায় তেমন বিস্মিত হই নাই, ইডিয়মের কানটা

ভালো, কোথাও সংগ্রহ করিয়া বসাইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'ব্যবসা ফাঁদা'র কথায় বই মুড়িয়া ফিরিয়া চাহিতে হইল। কোঁদন একটুও অপ্রতিভ হইল না, অবিচলিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি আবার পূর্ববৎ শয়ন করিলাম, মনে মনে ব্যাপারটুকু লইয়া একটু চিন্তা করিতেই বুঝিতে পারিলাম রেট বাড়ানোর প্রস্তাবে একটু সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক কোঁদনের, কিন্তু ব্যবসা ফাঁদার আলোচনা আজকাল যত্রতত্র, এমন কিছু নূতন কথা বলিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না।

প্রসঙ্গটা [illegible] না [illegible] দনে [illegible]র ইচ্ছা হইল, প্রশ্ন করিলাম, "ব্যবসাটা কি তা জানতে পারি ?" [illegible]

উত্তর [illegible] না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাইয়া আর কোণ-ঠাসা করি[illegible] [illegible] হইল না, বলিলাম, "তা নাই বল কোঁদন—আর নিয়মও তাই, [illegible] কথাটা পাঁচ কানে তুলতেও নেই। কিন্তু ব্যবসা করতে নামছ, হিসেব জিনিসটা বোঝ তো ?"

"কত ধানে কত চাল ?"

ওর বাপের মুখের কথা, সে সাধারণতঃ ব্যবসার বিরুদ্ধে ভাইয়েদের সঙ্গে তর্কে এই কথাটা প্রায় ব্যবহার করে, কোঁদন আয়ত্ত করিয়াছে। ঠোঁটের হাসি চাপিতে পারিলাম না, বলিলাম, "হ্যাঁ, বোঝ ?"

"তা বুঝি মেজকাকা, এদিকে, অনেকদূর পর্যন্ত গুণতে পারি,—আর······"

বলিলাম, "ঐতেই হবে, আর কি দরকার ? বেশ, তাহলে হিসেব যখন বোঝাই কোঁদন, তো অমন বেহিসেবীর মতন কথা বলছ কেন ?"

"কি মেজকাকা ?"

"চুল যখন আমার কম পাকা ছিল, তোমার খুঁজতে মেহনত হত, তুলতে সময় লাগত, তখন পাঁচটাতে এক পয়সা হয়েছে। এখন কত বেশি' টপটপ করে চোখ বুজে তুলে যাচ্ছ, সেই এক পয়সাতে দশটা তুলে দেওয়া উচিত নয় তোমার ?"

কোঁদন চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, "অথচ চাইছ তুমি বেশি পয়সা; তার মানে দুটো তুলেই তুমি বোধহয় এক পয়সা জমা ধরছ। আমিই বরং বলতে পারি—কোঁদন, এক পয়সায় দশটা না হোক, গোটা ছয় দাও তুলে, আরও পাকলে তখন দশটা, তারপর পনেরটা, তারপর কুড়িটা, তারপর···"

কোঁদন বাধা দিয়া বলিল,—"পাঁচটাই থাক্ মেজকাকা, ঠাট্টা করছিলুম।"

কয়েকদিন আর কোঁদনের ব্যবসার হালচাল জানি না। বাড়ীতে ছেলে-মেয়েরা একটার পর একটা অসুখে পড়িয়া গেছে, আরাম করিয়া মাথার পাকা চুল তোলাইব কি ঘাড়ের উপর মাথাটা আদৌ আছে কিনা সে হিসাবই রাখিতে পারি নাই।

সবে দিন দুয়েক নিশ্বাস লইতে সমর্থ হইয়াছি, গোছ গাছ করিয়া লইয়া একটু বইখাতা লইয়া বসিব, 'বাবু' আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "মেজকাকা, কোঁদনের অসুখ করেছে।"

সত্যকথা বলতে কি, মনটা খিঁচড়াইয়া গেল, বলিলাম, "খুশি হলাম; পই পই করে বারণ করছি, খারাপ সময় যাচ্ছে, রোদে হাওয়ায় বেড়া সঙ্কুচিতভাবে ছুটোছুটি করে, তা শুনবে কথা, ভুগুগ্, না ভুগলে শিক্ষা হবে না। যাও।"

বয়সে এই দুটিতে সবচেয়ে কাছাকাছি, সেইজন্য অত্যন্ত বেশীখিবার ং অত্যন্ত বেশি আড়াআড়ি। এখন নিশ্চয় ভাবের পালা চলিতেছে, বাবা; কথাটাচু করিয়া বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া রইল। "তেমন শক্ত

রাগের ঝোঁকেই আবার কাজে মন দিয়াছিলাম, ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাছে কে আছে?"

"কেউ নেই।"

"কেন, ওর মা?"

"ঘুমচ্ছেন, মেজকাকা।"

রাগে গাটা আরও জলিয়া গেল। বলিলাম, "ঘুমচ্ছেন?......বেশ, ঘুমতে দাও নিশ্চিন্তি হয়ে। এই করেই তো হচ্ছে এই সব,—মায়েরা ঘুমোন, ছেলেরা দুপুর রোদ্দুরে হুটোপুটি করে ফিরুক, জল খাক্ ঢক ঢক করে।......যাও, আমায় আর জ্বালাতন কোরো না।"

আবার টেবিলের দিকে ঘুরিয়া বসিলাম। বাবু মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। যখন বাহিরের উঠানটা পার হইয়া গেছে, ডাক দিলাম, "এদিকে আয়।"

কাছে আসিলে প্রশ্ন করিলাম, "বলেছিস ওর মাকে?"

"না।"

"বলিসনি, তো জানবেন কি করে শুনি? যা, তাঁকে বল্ উঠে জ্বরটা দেখতে। আমার বলে যা কত জ্বর আছে।"

বাবু ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কাজে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম, প্রায় আধঘণ্টাটাক পরে খেয়াল হইল বাবু খবরটা দিয়া যায় নাই, চেয়ারটা ঠেলিয়া উঠিতে যাইব, দুয়ারের আড়ালে একটি কচি মুখ সট্ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ডাকিলাম, "কে? এদিকে আয়।"

তরুণ বাহির হইয়া মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, যখন ঝগড়া না থাকে সংবাদবাহকের কাজ করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?—দোরের আড়াল থেকে ওরকম উঁকিঝুঁকি মারছিলি কেন?

"বাবু পাঠিয়েছে।"

"তিনি বুঝি নিজে আসতে পারলেন না? জ্বর কত কোঁদনের?"

"একশ পাঁচ।"

"একশ পাঁচ কিরে? বলিস কি!"

[illegible]া না [illegible] মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"ছা[illegible] চাওয়াচাও[illegible]"

তরুণ [illegible]তাহার পর [illegible]থা নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ"।

"ওকে [illegible]বার কড়িক জলপটি দিতে বলগে। আমি এক্ষুণি আসছি।" বরফ আনি[illegible]কথার| চাকরটাকে উঠাইয়া ঘরে আসিয়া টাকা লইবার জন্য ড্রয়ারটা খুলিয়াছি, পিছনে চাপা কণ্ঠের আওয়াজ কানে গেল, "মেজকাকা।"

ঘুরিয়া দেখি অনিল; তরুণের সমবয়সী, বাড়ির শিশু-রাজনীতিক্ষেত্রে জায়গাটাও অনুরূপ; প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

অনিল বাহিরের উঠানের ওদিকে বাড়ির দোরগোড়ায় একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইল, তাহার পর আরও একটু মগ্ন স্বরে বলিল, "কোঁদনের অসুখ তো করেনি।"

"অসুখ করে নি! তবে যে তরুণ বলে গেল একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। একেবারেই কিছু হয়নি?"

অনিল আর একবার দরজার পানে দৃষ্টিপাত করিল, আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে বাবুর মুখের খানিকটা নজরে পড়িয়া গেল। অবশ্য নিমেষে অন্তর্হিতও হইল সেটুকু, কিন্তু অনিল আর কিছু উত্তর দিল না, শুধু মাথাটা নিচু করিয়া আড়চোখে মাঝে মাঝে ওদিককার দরজার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মাথা গুলাইয়া আসিতেছে। ওদের পলিটিক্স লইয়া মধ্যে মধ্যে এই রকম বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। দুপুরবেলা সবাই আপিসে থাকে, মেয়েরা ঘুমায়, যতই বাঁচাইয়া চলিতে চাই না কেন কূটনীতির ধকলটা আমারই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, আর এই সময়ই চারিদিক নিষ্কণ্টক দেখিয়া বাড়িয়াও যায় ওদের আদান-প্রদান, সন্ধি-বিগ্রহ, নালিশ-ফরিয়াদ।—ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অসুখে পড়াটা এদের অনেক সময় একটা পোয়া বারো—পড়ার হাঙ্গামা নাই, নেবু-বেদানা

আছে, যাদের মুখে অষ্টপ্রহর খিঁচুনি, গালমন্দ, তাদের কাছে একটু 'আহা—উহু' ও

—হয়তো অনিলের সঙ্গে এখন আড়ির পালা চলিতেছে——

কিন্তু একশ পাঁচ ডিগ্রির সবটুকুই কি ভুয়া ?

"আয় তো দেখি" বলিয়া ভিতরবাড়ির দিকে পা বাড়াইলাম।

বাড়িতে সবাই ঘুমাইতেছে; অনিল অগ্রসর হইয়া আমায় দোতালার মাঝের ঘরের সামনে পর্যন্ত লইয়া গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গিয়া দেখি মেয়েদের কেহই নাই, চৌকির মাঝখানে কোঁদন শুইয়া আছে, কাঁথা চাদর যতগুলো সংগ্রহ হইয়াছে সব তাহার উপর চাপানো, মুখটা পর্যন্ত ঢাকা, [illegible] কাছে বাবু এবং পায়ের কাছে তরুণ বসিয়া আছে। দুজনেই খুব বিষণ্ণ, আমি [illegible] চিতভাবে [illegible] এক-বার পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। খাও।"

একটা কোনো গভীর ষড়যন্ত্র যে চলিতেছে এটুকু [illegible] বেশী খিবার ও আমি একবার কাঁথার ভিতর হাত দিয়া কপালটা আর বুকটা বাবা. কথাট [illegible] ভিজিয়া টেম্পারেচার প্রায় পঁচানব্বইয়ে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাড়ীটাও জল্যান শক্ত না। ব্যাপারখানা কি ?—এর তল দেখিতে হইবে তো। অনেক কষ্টে কোনরকমে হাসিটা চাপিয়া চক্ষু দুইটা কড়িকাঠ-সংলগ্ন করিলাম, মুখে যতটা সম্ভব চিন্তার ভাব ফুটাইয়া একটু মাথা দুলাইয়া বলিলাম, "হুঁ……।"

তাহার পর বাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নামাইয়া বলিলাম, "কে বললে একশ পাঁচ ?—কে দেখেছে ?"

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, চঞ্চল স্বভাব, উৎসাহের মুখে চোখ দুইটা যেন জ্বলিতে থাকে. থার্মোমিটার নাই, আমার আদেশমতো কোঁদনের মাকেও যে ডাকে নাই, সব ভুলিয়া একটু গলাটা তুলিয়া বাবু বলিল, "আমি মেজকাকা।"

বলিলাম, "একশ পাঁচ, মোটে ? একশ-পনেরর এক ডিগ্রিও কম নয়। যখন জানিস না হুট করে বলতে যাস কেন অমন করে ? মোটে একশ পাঁচের ওষুধ খেয়ে এক্ষুণি যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত, তখন ?"

এতবড় সফলতা বাবু আশা করে নাই, ভিতরে উল্লাসে চোখ দুইটা চকচক করিয়া উঠিল, উহারই মধ্যে যথাসাধ্য চিন্তার ভাব ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হবে মেজকাকা তাহলে ?"

বলিলাম, "ওষুধ খেতে হবে, কুইনিন।"

উৎসাহে তরুণের মুখও রাঙা হইয়া গেল, রোগীও কাঁথার নিচে আড়ামোড়া

বলিলাম, "কিন্তু কথা হচ্ছে,—একশ পনের ডিগ্রি জ্বরের মতন অত তেতো কুইনিন পাওয়াই যায় বা কোথায় ?"

কোঁদন মুখের ঢাকাটা খুলিয়া ফেলিল, ঘামে যেন সমস্ত মুখটা সিদ্ধ হইয়া রাঙা হইয়া গেছে—চুলগুলা পর্যন্ত গেছে ভিজিয়া। "ওকি, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!" বলিয়া কাঁথাটা টানিয়া দিতে যাইতেছিলাম, কোঁদন হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "অত জ্বর হবে না মেজকাকা।"

বলিলাম, "এক ডিগ্রিও কম নয়। তুই তো বলবিই, ভাত খাওয়া বন্ধ হবে কিনা।"

কুইনিনের উপব ভাত বন্ধ—এত সব হিসাব করিয়া দেখে নাই, কোঁদনের যেন ঘামের ধারা নামিল, বাবুর আর তরুণের মুখ গেছে আরও শুকাইয়া, তিনজনেই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল; অকূলে পড়িয়াছে। ঢাকাটা আমি দিলাম টানিয়া কোঁদাহাব পর "এখন কুইনিনটা পাওয়া যায় কোথায় ?" বলিয়া চিন্তিত ভাবে দৃষ্টি প্রশ্নবার কড়িকাঠে তুলিলাম।

কাঁথার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "মেজকাকা।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

উত্তরে জড়াইয়া কি বলিল ভালো বোঝা গেল না, কানটা সরাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি বললি ?"

"বলছিলাম—বেশি তেতো কুইনিন খেলে বেশি টাকা পাব তো ?"

"টাকা! এর মধ্যে টাকার কথা আসে কোথা থেকে ? অসুখ হয়েছে, ওষুধ খাবি, এই তো সোজা বুঝি—টাকা তো এমনি ডাক্তারে ওষুধে কত বেরিয়ে যাবে আমাদের।"

বেচারিরা মতলব আঁটে খুব বড়, কিন্তু কখনও শেষ রক্ষা করিতে পারে না; সব প্ল্যান কাঁচিয়া গেল, তাহার উপর উল্টা উৎপত্তি, বাবু যেন মরিয়া হইয়াই বলিল, "মেজকাকা, একটা কথা বলব ?"

উত্তর করিলাম, "বলো।"

দুইবার ঢোঁক গিলিল, তাহার পর বলিল, "কোঁদন বলছিল—এ অসুখে ডাক্তারও ডাকতে হবে না, ওষুধও কিনতে হবে না, টাকা পেলেই ওর ভালো হয়ে যাবে। ......কটা টাকা রে কোঁদন ?"

কানটা আগাইয়া লইয়া গেল। আমিও কানটা কাত করিয়া দিয়াছি, ফিস্‌-ফিসানির মধ্য দিয়া শুনিলাম, "দুটো।"

বাবু উকিল ভালো দাঁড়াইবে, কেসটা যে খুব মজবুত নয় বুঝিয়াছে, বলিল,

"বলছে—একটাকা হলেই হবে মেজকাকা।" আমি গলাটা পর্যন্ত কড়িকাঠের দিকে উঁচু করিয়া দিলাম, অন্যথা হাসি লুকানো কঠিন হইয়া পড়িত।

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হইল, কোঁদনের পুঁজিসংগ্রহের ফিকির। অসুখে পড়িলেই ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু কিছু জমা হয়। ঔষধ আছে, আবদার আছে, আবার নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াও দেয় এক আধজন—বেশ রোজগারের পথ। পাকা-চুলের দিক দিয়া প্রয়োজনমতো অর্থ সঞ্চয় হইয়া না উঠায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কোম্পানি যে গঠন হইয়াছে তাহার মধ্যে বাবু ও তরুণও যে শেয়ার-হোল্ডার এটাও স্পষ্ট। অনিল প্রতিদ্বন্দ্বী—ভাংচী দিয়া পুঁজির বাজার নষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে, দলে আর কে আছে জানি না, তবে ওদের গণ্ডির মধ্যে ব্যাপারটা যে একটা সাড়া জাগাইয়াছে এটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

কয়েক দিন একটা স্মিত কৌতুক জাগিয়া রহিল মনে, তাহার পর ব্যাপারটা খেয়াল থেকে নামিয়া গেছে। এমন সময় একদিন একটি দৃশ্যে হঠাৎ একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলাম। আমাদের দুইটা বাড়ির মাঝখানে একফালি জমি আছে, দুই দিকে দুই বাড়ির দেওয়াল। দুপুর বেলা, গনগনে রোদ, দুইটি বাড়িই নিস্তব্ধ, আমার ঘর থেকে হঠাৎ নজর গেল—কোঁদন আর ও বাড়ির ভুলুর মধ্যে কি একটা গভীর পরামর্শ চলিতেছে, কোঁদন যেমন ওর বুকের মাঝখানে চারিটা আঙুল চাপিয়া আছে তাহাতে মনে হয় কোনও একটা ব্যাপারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাজি করাইবার চেষ্টা করিতেছে যেন।

আমি আগাইয়া গিয়া একটা আড়াল দেখিয়া দাঁড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময় কোঁদন ঘুরিয়া এদিকে পা বাড়াইল, মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল একটা কিছু ঠিক হইয়াছে, দু-পা আসিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এক্ষুণি আসছি, দাঁড়িয়ে থাকবি।"

ছেলেটি বড় নিরীহ গোছের, বয়সেও কম এদের চেয়ে, মাথাটা কাত করিয়া জানাইল থাকিবে দাঁড়াইয়া। কৌতূহলটা গেল বাড়িয়া! কোঁদন আসিয়া আমাদের বাড়ির একেবারে উল্টা দিকে বাগানের দিকটায় যাইতেছে দেখিয়া, আমি আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলাম, রান্নাঘরে দাঁড়াইলে ওদিকটা দেখা যায়, জানালাটা সামান্য একটু খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কোঁদন ততক্ষণে পৌঁছিয়া গেছে। আমাদের প্রতিবেশী রামকিষণের বাড়ির কানাচে দাঁড়াইয়া গলা খাঁকারি দিতেছে। বিস্ময়ে আমি একেবারে স্থাণুবৎ নিশ্চল

হইয়া গেছি; রামকিষণ বেচারি গরিব লোক, জেলাবোর্ডের রাস্তা আগলায়, ওর বাড়িতে কোঁদনের কি দরকার পড়িল হঠাৎ, সে-দরকারের সঙ্গে ভুলুরই বা সম্বন্ধ কি এমন ?

কয়েকবার গলা খাঁকারি দিতেই রামকিষণের ছোট নাতিটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পেয়ারাতলায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এনেছ ?"

কোঁদন মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

"দাও দেখি।"

"তুই বের কর্ আগে।" নিজে হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত সাঁদ করাইয়া দিল।

ছোঁ[illegible]াইয়া [illegible]র কোমরের কাপড়ের মধ্য হইতে একটা ছোট্ট কাঠিতে জড়ানো মান্‌ঝা [illegible]না কি[illegible]াপী রঙের ঘুড়ির সুতা বাহির করিয়া কোঁদনের দিকে বাড়াইয়া ধরিল, কোঁদনও পকেট থেকে একটা আটআনি বাহির করিল, লেন-দেন হইল। ছোঁড়াটা প্র[illegible]রিল, "আরও চাই খোকাবাবু ? বল তো জোগাড় করি।"

কোঁদন [illegible]করিল, "কর্ জোগাড়, তবে বড্ড দাম, কমাতে হবে।"

যখন ফিরিল সমুখটা দেখিলাম। কী সস্তাই যেন মারিয়াছে, চোখে মুখে উল্লাস আর [illegible]ধরে না। [illegible]বাড়ির সেই গলিটার দিকে চলিল, আমিও আগের চেয়ে আরও কাছে একটা আড়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম।

ভুলু সেইখানে উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কোঁদন আসিয়া বলিল, "বের কর্।"

দুইজনেই হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দিল। ভুলু বাহির করিল একটা টাকা, কোঁদন সেই ঘুড়ির সুতার বাণ্ডিলটা ; নিঃশব্দে হাতফের হইল।

গোলাপী বাণ্ডিলটুকুর দিকে চাহিয়া ভুলুর ঠোঁটে সে যে কী হাসি ফুটিল—কোঁদন যেন আকাশের চাঁদ ধরিয়া আনিয়া দিয়াছে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া আশ আর মেটে না। কোঁদন উৎসাহ দিয়া বলিল, "বড্ড দাম, তুই ভাই তাই সস্তায় ছেড়ে দিলুম। আরও পাবি, যা টাকা জোগাড় কর্‌গে।"

মিনুর স্বপ্ন

মা বলিয়াছে আজ রাত্রে খাওয়া বন্ধ। বকুনি আর তাহার উপর উত্তম মধ্যম এক প্রস্থ যা হইয়াছে তাহাতে মিনুর স্পৃহাও নাই আহারে। বাড়ির মধ্যে যা

একটু আদর তা এক বাবার কাছে। তাস খেলিয়া কখন যে ফিরিবে!—উত্তরণ কি এত দুঃখ-কষ্ট লইয়া বাঁচিবে মিনু? বেশ হয় যদি না বাঁচে—বাবা আসিয়া মাকে বলে —আহা, এমন করে মারলে মেয়েটাকে যে শেষে—

চোখের কোণ দিয়া বালিশের উপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর স্লেটের লেখা যেমন মুছিয়া যায়, মিনুর মনে হইল সেই চোখের জলে এদিককার সব আস্তে আস্তে ধুইয়া মুছিয়া গেল।—মিনু দেখিতেছে একটি যেন প্রকাণ্ড বাড়ি, তাহার সামনেটা অনেকটা রায়চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের মতো।……

কিন্তু স্বপ্নের কথা পরে হইবে, আগে এত নির্যাতনটা কিসের জন্য সেই কাহিনীটাই বলা যাক।—

আজ ছিল লক্ষ্মীপূজা। একেবারে শেষ রাত্রে মা গোলাপারটা [illegible] যখন জলপিড়া স্থাপন করিল, মিনুর ঘুমটাও গেল ভাঙ্গিয়া। বাহিরে আসিয়া রকের উপর দাঁড়াইল, এই সময় নাকি মা-লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্গের বাড়ি থেকে [illegible]।

সামনের আকাশটায় একটু একটু আলো, আর ঠিক আলোর উপরটা [illegible] দপদপে তারার মতো কি! মিনু মাকে জিজ্ঞাসা করিল—নাকি মা-লক্ষ্মীর [illegible] রথ মা?" মা বলিল, "হ্যাঁ, রথ। কিন্তু তুমি ঘুমোওগে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে এত [illegible]।"

মিনু দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিবে ওঁর আসাটা।—সত্যই তো, রথটা আস্তে আস্তে যেন নামিয়া আসিতেছে, আর সত্যই তো, নীচের আকাশটায় আরও আলো, তাহার পর আরও আলো, তাহার পর আরও—একেবারে নীচে মেঘের টুকরার মতো ছোট ছোট সিঁড়িগুলি ঐ রাঙা হইয়া উঠিল—সোনার জলের ছড়া পড়িয়াছে। মিনু আজ দেখিবে, নিশ্চয় দেখিবে, ওই সিঁড়ি দিয়া নামিয়াই ঠাকুর মিনুদের চৌকাঠে পায়ের আলপনার উপর তাঁহার আলতাপরা রাঙা পা দুটি রাখিবেন, তাহার পর আলপনায় আলপনায় পা দিয়া পূজার ঘরে আসিয়া উঠিবেন।

মা কাজের মধ্যে চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শাঁখটা ধুইয়া ঘরে রাখিয়া আসিল, দোরে দোরে জলছড়া দিল, তাহার পর বাড়ির ওদিকে কি একটা কাজে চলিয়া গেল।

আকাশের সিঁড়ি একেবারে সোনা হইয়া উঠিয়াছে, বোধহয় মা-লক্ষ্মী দিলেন পা। হইয়া যায় কিনা সোনা, মায়ের কাছে শোনে নাই গল্প মিনু?—মা অন্নপূর্ণার পা ঠেকিয়া নৌকার কাঠের সেঁউতি সোনা হইয়া গিয়াছিল।

মা আসিয়া বলিল—"ওমা, তুই এখনও দাঁড়িয়ে, শুতে বললাম না গিয়ে?—ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।"

"আমি দেখব আজ, হ্যাঁ মা, লক্ষ্মীটি।"

মা একটু বিব্রত হইয়া বলিল—"না, যাও ঠাণ্ডা লাগবে, নতুন ঠাণ্ডা পড়েছে। আর, কেউ থাকলে কি দেন দেখা? টের পেলেই মিলিয়ে যান।"

"যতক্ষণ না টের পান দেখব মা।—হ্যাঁ, ঠাকুর দেখলে লাগতে পারে নাকি ঠাণ্ডা?"

মা [illegible] রোগ জানে, একটু ভাবিল, বলিল,—"তবে থাকো, আমার কি, অসুখ করলে পেসাদ খেতে পাবে না।" মা চলিয়া গেল।

তবুও খানিকটা দাঁড়াইয়াই রহিল মিনু, ঠাকুরকে দেখাটা ভালো কি প্রসাদ খাওয়াটা, ঠিক করিতে পারিতেছে না।—এদিকে আকাশের সোনা আরও জলজ্বলে হইয়া [illegible]হিয়া এদিকে প্রসাদ—আগে নৈবেদ্য—শশা, কলা, খেজুর, নারিকেল নাড়ু, ক্ষীরের [illegible]না কি তাহার পর ভোগ, মুগের ডালের খিচুড়ী, যত রকম তরকারী হইতে হয়, কত রকম ভাজা, তাহার পর পায়েস, পিঠা, দই, অমৃতী—

আকাশে সোনার পানে একবার চোখ দুইটা তুলিয়া মিনু মুখটি চুণ করিয়া সেই ব[illegible]ায় গিয়া উঠিল।

কা[illegible] দিয়া [illegible]ম ভাঙিল তখন অনেকক্ষণ মা-লক্ষ্মী আসিয়া গেছেন। দাদা একাই ফুল তুলিয়া [illegible]নিয়াছে, বড়দিদি স্নান সারিয়া চুলে গেরো দিয়া চন্দন ঘষিতেছে, রান্না ঘরে মায়ের ভোগ রান্নাও অর্ধেক শেষ। এবার যেন কি হইয়া গেল, ওদিকে মা-লক্ষ্মীর আসাও দেখা গেল না, এদিকে পূজারও গেল অনেকখানি বাদ পড়িয়া, না হইল ফুলদূর্বা তোলা, না হইল চন্দন ঘষা। মুখটা ভার করিয়া মিনু কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল। কাহার উপর যে রাগ করিবে বুঝিতে পারিতেছে না।

একবার দাদার সামনে পড়িয়া যাইতে প্রশ্ন করিল,—"তুই এখনও চান করিস নি মিনু? ফুল তুলতেও গেলিনি আমার সঙ্গে—"

"এইতো উঠলাম।"

"কেন রে? পুজোর দিন এত দেরী করে? অসুখ-বিসুক করেনি তো? দেখি তোর গা।"

মিনুর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু এই সময় দাদাকে বাহির হইতে কে ডাকায় দাদা চলিয়া গেল। আর নয়, একটা যেন ফাঁড়া কাটিয়া গেল। অসুখ কি করিয়া করে, মিনুর মনে নাই। তবে এটা দেখিয়াছে, যখনই কেহ অসুখ করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য গায়ে হাত দিয়াছে, তখনই বেশী না হইলেও একটু অসুখ কেমন করিয়া যেন পড়িয়াই গেছে ধরা। মিনুর মনে হয় ওটা যেন খিদে পাওয়ার মতো, হাজার খাইলেও কোথায় যেন একটু থাকেই লাগিয়া। দাদা তবুও

রাত থাকিতে ওঠার কথাটা জানে না, মা যদি আবার সে কথা বলে তাহা হইলে সর্বনাশ!

মিনু আর রাগ পুষিয়া না রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইল। তাহার পরই পুরুতঠাকুর আসিলেন, শাঁখ, ঘণ্টা, ধূপ-ধুনার সঙ্গে পূজার মধ্যে মনের খেদটুকু কাটিয়া গেল মিনুর। যেটুকু বা রহিল, নৈবেদ্যর সঙ্গে [illegible] তলাইয়া গেল। তাহার পরেও ছিটে-ফোঁটা যেটুকু বাকি থাকিল, সেটুকু [illegible] সঙ্গে। মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ হয় বড় ভালো, মা দৃষ্টি দিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দেন কিনা। পায়েসটি আবার এমন চমৎকার হইয়াছিল, মিনুর মনে হয় মাও নিশ্চয় [illegible] একেবারে দৃষ্টি সরাইতে পারেন নাই ও-থেকে।

আজ স্কুল যাওয়া নাই, নৈবেদ্য-ভোগে শরীরটা একটু ভারী, [illegible] য়াছিল, মিনু একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন উঠিল দেখে আর সবাইও নিজের নিজের ঘরে ফস ফস করিয়া ঘুমাইতেছে—কাল থেকে বেশ একচোট মেহনত গেছে, তো। শুধু মা রান্নাঘরে। চমৎকার একটা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে [illegible] হয়, একটু একটু সাদা ধোঁয়া উঠিতে থাকে, সেই সময়ের [illegible] আস্তে গিয়া চৌকাঠের ওদিকে দোরে পিঠ দিয়া বসিল। মি. [illegible] অন্য পাল্লাটায় গা ঘেঁসাইয়া বসিয়াছিল, সেটাকেও নিজের কোলে টানিয়া লইল মিনু। মা একটু দেখিয়া লইয়া হাসিল।

মিনু জিজ্ঞাসা করিল—"হাসছ কেন মা?"

"দুটি হ্যাংলাকে একসঙ্গে দেখছি, পাবে না একটু হাসি? —না, মা-লক্ষ্মীর, শেতলের ক্ষীর, ওসব মনে করতে নেই। এক্ষুণি উঠে এলি যে?"

"আর কত ঘুমুব? মেয়েদের অত আছে ঘুমোতে? শেতলে খালি বুঝি ক্ষীর খান মা-লক্ষ্মী, মা?"

কাজের মধ্যে গল্পের দোসর পাইয়া মায়ের বোধহয় একটু ভালোই লাগে। মনটি আজ সেবায়, পূজায়, ভক্তিরসে টলমল করিতেছে, ভালো লাগে ঠাকুরকে লইয়া একটু আবদার অনুযোগের কথা কহিতে, বলিল—"হ্যাঁ, ঐ শুকনো ক্ষীরের সন্দেশ করে দোব, নট-ক্ষীর রইল একবাটি; নারকোল নাড়ু আর খান কতক চন্দ্রপুলি আছে। খান তো ভারী, শুধু খেটেই মরা। তেমন ভাগ্যি করেছি কি যে খাবেন মা?"

একটি কালো পাথরের রেকাবিতে টাটকা শুকনো ক্ষীর তাল করা রহিয়াছে, কড়ায় নট-ক্ষীরের সাদা সাদা ধোঁয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। বাহির থেকে যে গন্ধটা পাইয়াছিল, সেটা সমস্ত ঘরটিতে যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। মিনুর

মনের একেবারে কোণায় একটু মনে হইতেছে ভাগ্যিস মা-লক্ষ্মী খান না ?—কিন্তু সে-কথা ভাবিতে নাই। মিনু মায়ের মতনই একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তেমন ভাগ্যি হলে বুঝি খান মা ?"

"খান না ? আমার বাপের বাড়িতেই তো একবার খেয়েছিলেন, অবিশ্যি সে অনেক দিনের কথা, আমার ঠাকুরমার শাশুড়ির আমলে। কোথাই বা আমরা সেরকম ভক্তি পাব, কোথাই বা সে নিষ্ঠে ?

গল্প করি[illegible]তে ওদিকে ক্ষীর হইয়া গেল। কড়াটা নামাইয়া একটি ছোট আর [illegible]াইয়া ও চা[illegible]রবাটিতে ঢালিয়া রাখিল ; বলিল—"যাই, এবার রেখে দিগে পূজোর [illegible] না কিছুই।

[illegible] দেখিতেছে [illegible]খিতে। মিনু প্রশ্ন করিল—"ক্ষীরের নাড়ু পাকালে না মা ?"

[illegible]পারছি না, কোমর পিঠ টনটন করছে। একটু গড়িয়ে নিগে, [illegible]ছাঁচে বসিয়ে তুলে নোব। চল দিকিন, পারবি একটু [illegible]া দিতে ?"

[illegible] সব তুলিয়া রাখিয়া শিকল তুলিয়া দিয়া ওদিককার বারান্দার মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। মিনুর হাত খুব মিষ্ট, একটুর মধ্যেই ঘুম আসিয়া গেল।

ঠাকুরের প্রসাদের এটা একটি দোষই হোক বা গুণই হোক—বড় শীঘ্র হজম হইয়া যায়, আর কাহারও হয় কিনা জানে না মিনু, কিন্তু মিনুর তো হয়, সেখানে অন্তত আজ যে হইয়াছে এতো স্পষ্ট দেখিতেছে। মনে অবশ্য না ভাবিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে মিনু, কিন্তু নাক তো মন নয়, সেখানে ক্ষীরের গন্ধটি যদি লাগিয়া থাকে, কি করিবে বেচারি ?

কোমর পিঠ টিপিয়া দিতে মা যখন ঘুমাইয়া পড়িল, মিনু উঠিয়া বাহিরে আসিল। সব ঘরে সবাই তখনও ঘুমাইতেছে, একটু ভিতরে গিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিল, এমন যদি কিছু একটা পাওয়া যায় যাহাতে ক্ষুধাটা, অন্তত নাকের গন্ধটা যায়। ওটাও থাকিতে নাই কিনা, মা-লক্ষ্মীর শেতলের জিনিস। কোনও ঘরে কিছু নাই, শুধু বড়দির ঘরে একটা বিস্কুটের টিন, খোকা যখন আবদার ধরে, দুটি একটি করিয়া দিয়া ভোলায় দিদি। আলমারীতেই রোজ থাকে টিনটা, আজ কি করিয়া টেবিলের উপরেই থাকিয়া গেছে।

বিছানার উপর দিদি ওদিকে মুখ করিয়া খোকাকে লইয়া ঘুমাইতেছে। মিনু চুপ করিয়া একটা আঙুল কামড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট বোনপোকে নিজের

ভাগ থেকেই দিতে হয়, তাহার জিনিস খাইতে নাই। মাও বলে, দিদিও পিঠে হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া বলে—"লক্ষ্মীটি, তুই মাসী হোস মিনু, খাসনি ওর বিস্কুট, ভালো বিস্কুট, একে পাওয়া যায় না পয়সা দিয়েও।" দিদি দেয়ও নিজের হাতে, যাহাতে নিজে লইয়া না খায় মিনু।

মিনু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ মনে পড়িল—[illegible] নাক থেকে ক্ষীরের গন্ধ যে সরাইতে হইবে। ওটা বোনপোর জিনিস খাওয়ার চেয়ে বড় পাপ নয়? এই কথাটুকু মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মিনুর [illegible] তুনিটা কাটিয়া গেল, মিনুর মনে হইল মা-লক্ষ্মীই দিলেন কাটাইয়া, [illegible] দিয়া পাপ করাইতে চান না।

মিনু আগে দুইটা লইল, তারপর আরও দুইটা, [illegible] সবাইও নিজের লইবে কিনা ভাবিতেছে, খোকা নড়িয়া উঠিল। মিনু [illegible] দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দিদি ঘুমের ঘোরেই [illegible] তখন [illegible] ঘুম পাড়াইয়া দিলে পা টিপিয়া টিপিয়া চারিটা বিস্কুট [illegible]

বিস্কুটের আবার একটি রোগ, কুট কুট করিয়া শব্দ হইবে, [illegible] উঠানের ওদিকে চলিয়া গেল; ওদিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, [illegible] খিড়কির পুকুরের দিকে যাওয়ার গলিটার পরে ঠাকুরঘর।

মনে হইতেছে নাকে আর ক্ষীরের গন্ধটা নাই, বিস্কুটের [illegible]টা তাড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু ক্ষিদেটা যে আবার বাড়িয়া গেল! ক্ষিদে [illegible] উপর কম জিনিস খাইলে এটা হয়ই. মিনুর মনে ছিল না। পরশুরাম চৌধুরীদের বাড়ি নেমন্তন্ন [illegible] প্রথমে একটু শাকভাজা আর লুচি খাইয়া নিজেকে যেন আর সামলাইতে পারা যায় নাই। মনে ছিল না মিনুর, তাহা হইলে কি আর খায় বিস্কুট কটি?

এমন সময় আর এক কাণ্ড হইল, মিনুর মনে হইল ক্ষীরের গন্ধটা হঠাৎ আবার যেন নাকে ফিরিয়া আসিতেছে। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিল মিনু, মনে হইল—দেখিতো গন্ধটা নাকেই, কি পূজার ঘর থেকে আসিতেছে—

দরজার ফাঁকে নাক দিয়া ঠিক বোঝা গেল না। তাহা হইলে করা যায় কি এখন? বিস্কুটেও যায় না এমন পাপ কি করিয়া সরায় মিনু নাকের মধ্যে থেকে?

ইহার পরেই সব যেন কি করিয়া একসঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হইয়া গেল, একেবারে উলটা কাণ্ড—কি করিয়া যে হইল মিনু এখন পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে না—তাড়াতাড়ি উঠানের ওপার থেকে তেপাইটা আনিয়া পূজার ঘরের শিকলটা খুলিয়া ফেলিল মিনু। একটু ভাবিল, তাহার পর তেপাইটার উপর উঠিয়াই একটু নাড়ু

মুখে গুঁজিয়া দিল এবং সেটা ভালো করিয়া গলার নিচে যাইবার আগেই ক্ষীরের ছোট বাটিটা নামাইয়া একেবারে চোঁ চোঁ করিয়া চুমুক দিয়া বসিল; তারপর যখন আর একটুও নাই, বাটিটা নামাইয়া দিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেই খালি বাটিটার পানে চাহিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এর পরের যা ঘটনা সে সম্বন্ধে গোড়াতেই বলা হইয়াছে।

মিন্থু সামলাইয়া লইয়াছিল, এমন কি মা-লক্ষ্মী যখন খানই—মার ঠাকুরমার শাশুড়ির সময় একবার খাইয়াছিলেন—তখন একখানা বিস্কুটও পূজার চৌকির সামনে ভাঙিয়া ছড়াইয়া ও চারখানাও তাঁহার ঘাড়ে চাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল মিন্থু; কিন্তু টিকিল না কিছুই।

মিন্থু স্বপ্ন দেখিতেছে—যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি—তার সামনেটা অনেকটা রায়-চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের মত। বড় বড় থাম, আলোয় আলোয় ঝলমল করিতেছে, আর সেই বাড়িতে মা-দুর্গা! ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কি কাজ করিয়া বেড়াইতেছেন। ওদিকে কার্তিক, এদিকে গণেশ, আলিপুরের চিড়িয়াখানার মত ওদিককার একটা দরজা দিয়া সিংহ আসিয়া মা দুর্গার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় বাহিরে কোথা হইতে সিঁড়ি দিয়া একটা মেয়ে উঠিয়া আসিল, রেশমের জমজমে শাড়ি পরা, গায়ে গয়না, মাথায় মুকুট, বাঁ হাতে একটা ঝাঁপি—লক্ষ্মীর ছবিতে যেমন দেখিয়াছে মিন্থু।

লক্ষ্মীই।

"এই যে, লক্ষ্মী এসেছিস?"—বলিয়া মা-দুর্গা তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া আগাইয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর কিন্তু চোখে আঁচল। মা-দুর্গা কাছে যাইতেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—"এমন বাড়িতে পুজো নিতে পাঠিয়েছিলে মা, শেষে চোর-অপবাদ নিয়ে আসতে হোল—ক্ষীর চুরি, নাড়ু চুরি, তার ওপর বিস্কুট পর্যন্ত চুরি!"—

কালস্য গতিঃ

[গল্পটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। তখন চারদিকে বোমার আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, কলকাতাতে দু-এক ঝাঁক বোমা পড়েছিলও। সে সময়ে বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে লোকদের সতর্ক করার জন্য সরকার "এ-আর-পি" (Air Raid Precaution)

নাম দিয়ে একটি অসামরিক রক্ষিবাহিনী গঠন করেছিলেন।]

লেখা চাই।

কিন্তু কল্পনার সে মুক্ত আকাশ-বিহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে প্রলয়ের ঘনঘটা, সুকুমার সাহিত্যের জন্য অভিযান বিড়ম্বনা মাত্র। এই আতঙ্কে অবরুদ্ধ মনকে দিয়া সৃষ্টি করাই কি করিয়া? ওপার হইতে তাগিদ আসিতেছে ঘন ঘন অমোঘ হুঙ্কারে। এই যে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা"—অবস্থা, এতে বরং একটু পরকালের চিন্তা করাই শাস্ত্র-সঙ্গত, লেখার কথা ভাবিব এমন অবসর কই? কিন্তু লেখা চাই-ই।

আকাশ তো গিয়াছেই, যেটাকে ভূতল বলা হয়, সেটাও ত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় লইয়াছি। পাতাল শুনিতাম মৃত্যুর দোসর। সম্পূর্ণ না হউক্, কথাটা অর্ধসত্য তো বটেই। ভাবিয়াছি, দেখাই যাক্ না এই সশব্দ সাগ্নিক মৃত্যুর নিকট হইতে পালাইয়া শব্দহীন হিমস্পর্শ অর্ধমৃত্যুর আশ্রয়ে কোন একটা সুরাহা হয় কি না। হেঁয়ালি নয়, সত্যই বোমার ভয়ে নিচের তলা আশ্রয় করিয়া আছি। নিচের তলা বলিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার না হইবারই কথা। যুগ যুগ ধরিয়া এতদিন পর্যন্ত লোকে যেটাকে 'নিচের তলা' বলিয়া আসিয়াছে, শুধু বাঁচিবার আশায় তাহারও নিচে একটি গৃহ করিতে হইয়াছে। মানুষের উপরের গতি শেষ হইয়াছে। তবু মানুষই তো! সে চলিবেই। তবে আধুনিক প্রগতির লক্ষণ অধোগতি; ঘরবাড়িও সেই তালে পা ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতে-ছিল, এবার তাহার লক্ষ্য পাতাল।

ক্রমাগতই অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িতেছি। কি করি? অগ্নির আঁচ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াও গায়ের জ্বালা মিটিতেছে না। কারণটা আপাততঃ বোমাও নয়; সাইরেনও নয়—যদিও উভয়ের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছেই। শরীর এবং মনকে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের তাগিদ মিটাইবার যোগাড়যন্ত্র করিতেছি, আমার ভূতলাশ্রিত পরিবার মহলে একটা গোলযোগ উঠিল। মা বলিতেছেন, "জানি না বাছা, কেমন যেন কালেরই দোষ! এতটুকু ছেলে তার মুখের কথা হ'ল 'সেপাই হব, যুদ্ধ করতে যাবো!'......তা যাবি, সবাই বীরপুরুষ হয়েছিস, আটকাবে কে? কিন্তু তার আগে আমায় যেতে দিন ভগবান..."

কন্তা বোধ হয় স্কুল হইতে এইমাত্র ফিরিয়াছে। পড়ার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিতেছে, "কথায় কথায় একালের নিন্দে তোমার একটা রোগ দাঁড়িয়েছে, ঠাকুমা।

না, যুদ্ধে যাবে কেন? চারিদিকে অন্যায়ের আগুন লেগেছে, ও তোমাদের কালের কর্তাদের মতো বসে বসে চণ্ডীমণ্ডপে তামাক পোড়াতে শিখুক আর…"

আমার কনিষ্ঠ পুত্র দোতলায় কি একটা আবদারের সঙ্গে পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া যাইতেছে! স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও বুঝিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া।

ঠাকুমা-নাতনীর কথা কাটাকাটি ক্রমে রসিকতায় গড়াইয়া পড়িলেও, উহারই মধ্যে বেশ ঝাঁঝালোও। আমার বয়সটা মা'রই বেশি নিকটবর্তী; মাথায় বোমা পড়া অপেক্ষা মেয়ের মাথায় এই সব আজগুবি আধুনিকতার সমাবেশ কম বিপজ্জনক মনে করি না। এরা কি দেশটাকে রাতারাতি নব্য তুর্কী করিয়া গড়িয়া ফেলিতে চায় নাকি? আমাদের এ পাতাল প্রবেশের সুযোগে ইহারা আরও কি সব বিপ্লবী মতলব আঁটিতেছে, কে জানে! নিচে হইতে গলাটাকে রাশভারি করিয়া বলিলাম, "কমলী, সব শুনছি। মনে হচ্ছে, নিজেও তাহ'লে বোধ হয় নারীবাহিনী কি ঐ রকম একটা কিছু তোদের চুলোর প্রগতির ব্যাপারে নাম লিখিয়ে এসেছিস। কাল থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। একটা 'এ-আর-পি'তে নাম লিখিয়েছে; আমার মাথার ঠিক নেই, এর ওপর তোর মুখে ঐসব…"

কন্যার মাতা দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইল, কোলে ক্রন্দনপরায়ণ শিশুপুত্র। তর্জনসহকারে বলিল, "সামলাও বীরপুরুষ ছেলেকে, নাজেহাল করে দিয়েছে। দোষ ঠাকুরপোর, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে হাসপাতালে গেছে, আরও কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়ে লড়াইয়ের সব যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, গ্যাস-মুখোশ এই সব দেখিয়েছে। ভাইপোর এখন শখ হয়েছে, সেপাই হয়ে লড়াই করতে যাবো, জাপানীদের মারবো। পায়ে একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চোট-খাওয়া সেপাই হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অলক্ষণ বলে মা যেই সেটা কেড়ে নিয়েছেন, আর…"

বলিলাম, "তোমাদের কাণ্ডখানা কি গো। একটা তিন বছরের শিশু লড়াইয়ে যাবে বলে বায়না ধরেছে, মা ঠাকুমা বোন সবাই মিলে বাড়িতে ডাকাতপড়া লাগিয়ে দিয়েছ! আমি মনে করি, বড়খোকাই বুঝি বা বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করতে চললো; যাও, বাজে গোলমাল বন্ধ করো গিয়ে।"

ছেলেটা আমাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্য গলাটা নরম করিয়াছিল, সুরটা ধরিয়া রাখিয়াছিল; তাহাকে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "বড় বীর হয়েছ, না? সেপাই সেজে লড়াইয়ে যেতে হবে!"

কথাটা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

উহার মাতাকে বলিলাম, "নিয়ে যাও তোমার অভিমন্যুকে, আমায় বিরক্ত করো না, একটা কাজ নিয়ে বসেছি।"

বলিল, "বলছি দেখ একটু, কোনমতে থাকবে না আমাদের কাছে, ঠাকুরপো ওর মাথায় যে কি খেয়াল সাঁধ করিয়ে দিয়েছে! নিজে তো বোমা মাথায় হুড়ুদ্দম করে বেড়াচ্ছে 'এ-আর-পি' নিয়ে, কে যে মামলায় ভাইপোকে,—ছিষ্টির পাট পড়ে আছে।"

বলিলাম, "কমলীকে দাওগে, মরবার ফুরসত নেই, যাও।"

উপরে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে ছেলে সুর চড়াইল এবং মায়ের কাছে একটা চাপড় খাইয়া সেটাকে সপ্তমে ঠেলিয়া তুলিল ধুয়া—"নড়াই-কলা ছেপাই হবো, বোমা কখন্ ফাটবে?"

রাগ চাপিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মনটা ক্রমেই অধিকতর উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য শিশু যে এর মূলে—এ জ্ঞানটুকুতে ফল হইতেছে না, মায়ের মতোই সমস্ত যুগটার উপর মনটা বিষাইয়া উঠিতেছে, কলম এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কমলীর গলা শুনিতেছি, ভোলাইবার সমস্ত কলা-ই ভাইয়ের উপর পরীক্ষা করিতেছে বেচারি; ভাইয়ের সেই এক কথা—"নড়াই-কলা ছেপাই হবো, বোমা কই?"

মা আরও চটিয়াছেন, একালের প্রসঙ্গে আরও নানারকম ব্যাপার টানিয়া আনিয়াছেন। ওর নিজের মাতাও ক্রমেই অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার মন্তব্য-মধ্যে ছেলের পিতার উল্লেখ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। বোনও এক-একবার বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিতেছে। সকলের উপর ছেলের কণ্ঠস্বর, যেমন উৎকট তেমনই উচ্চ—সব মিলিয়া একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দিলাম। হাঁকিলাম, "কমলী, নিয়ে আয় হতভাগাকে, যুদ্ধের খানিকটা নমুনা ওকে দেখাই—অতিষ্ঠ করে তুলেছে! আনলি?"

মা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "খবরদার, এর ওপর মারধোর করবি না শৈল, ছেলে আবদারে কাঁদুনিতে হাল্লাক্ত হয়ে উঠে এমনিই ভিরমি যাওয়ার দাখিল হয়েছে। আমায় যেতে দে, তারপর যা খুশি করিস, বলতে আসব না।

রাগিয়া বলিলাম, "তাহলে কি করতে বলো? ঠাণ্ডা কথায় তো তোমরাও হার মেনেছ! বাড়িতে কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না, এমন করে কতক্ষণ..."

উহার মাতা কমলীর নিকট হইতে ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া এবার একেবারে নিচে নামিয়া আসিল, আমার পায়ের কাছে ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া চাপা ব্যঙ্গের

স্বরে বলিল, "কেন, যত সব আষাড়ে গল্প লিখে লিখে দেশের তাবৎ বুড়োদের মন ভোলাচ্ছ, একটা শিশুকে ঠাণ্ডা করবার হদিস জানো না? না, তাতে যে গেরস্তর একটু উব্‌গার হবে!"

মেজাজের উপর এখ্‌তিয়ার ছিল না, একটা রাগারাগি করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পায়ের কাছে ছেলেটার মুখের উপর দৃষ্টি পড়ায় নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। উপর হইতে সহসা এই প্রায়ান্ধকার পাতালপুরীতে আসিয়া এবং বাপ-মায়ের উগ্র দৃষ্টির মাঝে পড়িয়া যে যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছে! কান্নাটা একেবারে থামিয়া গিয়াছে এবং অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে মুখটা সিঁদুরবর্ণ হইয়া গিয়াছে। উদ্‌গত অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য এক-একবার ঢোঁক গিলিতেছে এবং একপ্রকার অসহায় আর্তদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

অবস্থাটা যেমন করুণ, তেমনই আশঙ্কাজনক। আমি উহার মাতাকে বলিলাম, "আচ্ছা ..ও, সবার মুরদ বোঝা গেল, একটা ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে হবে, সেখানেও শর্মা না হ'লে চলবে না।"

উত্তর যাহা পাইলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম না।

খোকার জননী চলিয়া গেলে উহাকে উঠাইয়া নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "কাঁদছিলি কেন খোকা? কি হয়েছে? গল্প শুনবি একটা?"

খোকা একবার ভালো করিয়া ফোঁপাইয়া লইয়া রুদ্ধ দমটাকে মোচন করিল, উত্তর করিল, "হুঁ"।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিলাম, "তা বেশ তো, শুনবি, এর জন্যে কান্না কেন? এমন সব বেয়াক্কেলে, খোকা গল্প শুনবে, তাকে উল্টে ধমকাচ্ছে। আয় কোলে আয়।"

খোকা উঠিয়া কোলে গুছাইয়া বসিল। আর কালক্ষেপ না করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলাম —

"মস্ত এক তেপান্তরের মাঠ। তার এক ধারে প্রকাণ্ড এক অশথ গাছ, কত-দিন থেকে যে একভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বলতে পারে না। সেই আদ্যিকালের অশথ গাছ! বুঝেছিস্ খোকা? এক থাকতো ব্যাঙ্গমা আর এক থাকতো ব্যাঙ্গমী। আহা, সবাই তো চায় আমাদের খোকার মত লক্ষ্মী একটি ছেলে হোক্? কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায়, ছেলে আর তাদের হয় না। দুঃখে, মনের কষ্টে দুজনে একটা ডালের ওপর হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে

কাঁদে—হাপুস নয়নে…"

খোকা মুখ নীচু করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ যেন মনে হইল চাপা ফোঁপানীর আওয়াজ শুনিলাম। রচনা যে এত হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, ইহাতে পুলকিত হইয়া মাথাটা নামাইয়া বলিলাম, "তুইও কাঁদছিস নাকি খোকা! কান্না কিসের? এক্ষুণি হবে ওদের ছেলে।"

খোকার ঠোঁটটা কাঁপিয়া উঠিল, কান্নার ভাবটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল, "যুজ্যুর গপ্প ছুনবো, এলোপেলেনের…"

ওদিকে মা এখনও এযুগের কথা লইয়া গরগর করিতেছেন।

কতকটা রচনার অমর্যাদাজনিত নৈরাশ্যে, কতকটা এই এক-ফোঁটা ছেলের বেয়াড়া জিদে খানিকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। ইচ্ছা হইল, ঘাড়টা ধরিয়া একটা আছাড দিয়া এরোপ্লেনের আস্বাদ দিয়া দিই নগদা-নগদি। নিজেকে অনেক কষ্টে সংবৃত করিয়া লইলাম। একটু চিন্তা করিলাম, তাহার পর স্থির করিলাম, এমন উগ্র গল্পের অবতারণা করিব যে, আতঙ্ক মিটিতে কিছুদিন কাটিয়া যাইবে। বলিলাম, "বেশ, এরোপ্লেনের গল্পই বলছি, এ আর এমন শক্ত কি? তবে"—বলিয়া স্বরটা যথাসম্ভব আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলাম।—

"তুই তখন ঘুমচ্ছিলি, খোকা। হঠাৎ কড্‌কড্‌ কড়াৎ। আকাশ যেন চৌচির হয়ে ফেটে গেল। সে যে কি ভয়ংকর আওয়াজ, তোকে কি বলবো। ধড়মড়িয়ে সবাই উঠে পড়ে পড়ি-তো মরি করতে করতে গেলাম ছুটে। ছাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। চড়কগাছ দেখিস নি তো কখনও? দেখাবো একদিন, সেই আকাশে পর্যন্ত উঠে বনবন করে ঘুরতে থাকে। ছাতে উঠে সবার চক্ষু চড়ক-গাছ! হবে না? একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে পঞ্চাশখানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে…" খোকা শোধরাইয়া দিল, "হাজালখানা।"

কটু এবং গুরুপাক হইলেও ডেঁপোমিটা হজম করিয়া গেলাম। মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, হাজারখানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে সে কি তর্জন-গর্জন আর ডানা ঝাপটানি! এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, আর তালগাছের মতো বোমা সব আগুন ছড়াতে ছড়াতে দুমদাম করে ফাটতে ফাটতে নিচে এসে পড়তে লাগলো। যেখানটায় পড়ছে, বুঝেছিস কিনা খোকা, ভেঙে-চুরে একাকার করে দিচ্ছে! ওদিকে বোমা-ফাটার বিদকুটে শব্দ, এদিকে দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ি পড়ার হুড়মুড়নি, ভয়ে আতঙ্কে আমরা তো……"

খোকা গলাটা একটু দোলাইয়া নাকী সুরে অনুযোগ করিল, "আমাদের বাড়ি পললো না ?"

কি অলক্ষণে কথা কচি ছেলের, তবু আর ঘাঁটাইলাম না। বলিলাম, "না, আমাদের বাড়ি পড়বে কেন ? আমাদের বাড়িতে খোকার মতন লক্ষ্মী ছেলে রয়েছে, ঠাকুর বাঁচিয়ে দিলেন।"

খোকা তেমনই অনুযোগের স্বরে মন্তব্য করিল, "ঠাকুর দুট্টু।"

প্রসঙ্গটা আর না বাড়াইয়া বলিলাম, "তারপর কি হল শোন্ খোকা। জাপানীরা যখন ওপরে খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে এই রকম, নীচে থেকে দশ হাজার খানা এরোপ্লেন বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের আরও সব এরোপ্লেন এসে পড়ল, এদেরও আরও হাজার হাজার এরোপ্লেন উঠলো, ওদেরও আরও সব কোথা থেকে এসে জুটলো, আরও এদের, আরও ওদের—এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে আকাশে আর এত্তোটুকু জায়গা নেই ! তারপর বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ, সে যে কী ভীষণ, তোকে কি বলবো খোকা ! হাজার হাজার বোমা ফাটছে, লাখো লাখো কামানের গোলা ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন ডানা ভেঙ্গে ওলতে কত বাড়ি ভেঙ্গে, কত ঘোড়া, মোষ, মানুষ মেরে নিচে এসে পড়ছে, হাজার হাজার মানুষ ওপর থেকে ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ছে ঠিকানা নেই, কারুর মুণ্ডু উড়ে গেছে কারুর পা নেই, কারুর হাতের একখানা কেটে বেরিয়ে গেছে, কারুর বুকের ওপর গোলা লেগে হাড় পাঁজরা সব···

একবার আড়চোখে চাহিলাম, ঔৎসুক্যে ভরা কিন্তু ভয়লেশহীন দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর করিয়া খোকা বসিয়া আছে, থামিতে সামান্য যে একটু রসভঙ্গ হইল তাহাতেই খানিকটা অধৈর্যভাবে তাগাদা দিল, "তালপল ?"

বিরক্তিটা আর চাপিতে পারিলাম না। না-হয় কান্নাটাই থামিয়াছে, কিন্তু এত ফলাও করিয়া গল্প বলিবার তো আমার আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল। আর বিভীষিকা সৃষ্টির আমার যতটুকু ক্ষমতা তাহারও চরমে আসিয়া পড়িয়াছি, সবই জলে পড়িতেছে তো। ভয়ের সঞ্চার কোথায় ? গল্পটা গুটাইয়া লইলাম, বলিলাম, "তার পর আর কি ? এত হুলুস্থুলের মধ্যে কি কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ তামাসা দেখতে পারে ? আমরা তাড়াতাড়ি হুড়মুড়িয়ে নেমে এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মাঝে মাঝে গুমগাম শব্দ শুনছি, আর ঠাকুরকে বলছি, 'ঠাকুর, আমাদের সব্বাইকে বাঁচিয়ে রাখো'।"

খোকা প্রসন্ন মুখে একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আমার মুখের পানে

চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আর কাকা ?"

উদ্দেশ্যটা বুঝিলাম, এবং কোথায় একটু লজ্জাও অনুভব করিলাম। কাকা ওর আদর্শ, ওর হীরো, তাহাকে আমাদের—পলাতকদের—দলে টানিয়া আর ওকে নিরাশ করিতে মন সরিল না। বলিলাম, "না, কাকা তোমার এল না, সেও একখানা এরোপ্লেনে বন্দুক বোমা নিয়ে ওপরে উঠে গেল আর জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলে।······এইবার তুমি একটু নামো দিকিন খোকা, আমায় কাজ করতে হবে। একেবারে গোলমাল কোরো না, শুনলে তো যুদ্ধর ঘটাটা ? ওরা আবার কাঁদুনে ছেলেদের বেশি করে খুঁজছে, একটু কান্নার আওয়াজ পেয়েছে কি, ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে সেই একেবারে আকাশের ওপর—।······যাও, নামো।"

নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে লেখা লইয়া কয়েক ছত্র অগ্রসর হইয়াছি, আবার ফোঁপানি। ধৈর্য ধরিয়া আছি, ফোঁপানি স্পষ্টতর কান্নায় উঠিল, কলম থামাইয়া আসিয়া সংযত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "কি হল আবার ?" কোন উত্তর নাই, কান্নাটা আর এক পর্দা উঠিল মাত্র। আর ধৈর্য ধরিয়া রাখা যায় না। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া লেখার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি, অপেক্ষাকৃত অসংযত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "কি হল শুনি, আবার কান্না কিসের ?"

"কাকাল ছঙ্গে যুজ্যু কলতে যাবো···।" গায়ে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল, মনে হইল সমস্ত শরীরটাকে বোমা করিয়া লইয়া এ ছেলের গায়ে ফাটিয়া পড়িতে পারি তো কতকটা রাগ মেটে। শান্তকণ্ঠেই বলিলাম, "কাকা যুদ্ধ করতে যায় নি, কেরোসিন তেল কিনতে গিয়ে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দা উঠিল, "কাকা যুজ্যু কলতে গেছে······"

আর রাগ চাপিতে পারিলাম না, চেয়ারটা একটু সরাইয়া লইয়া ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা বেশ ওজনদুরস্ত চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম, "ঘরেই যুদ্ধর সরঞ্জাম আছে, এই দেখ ; আর বাইরে যেতে হবে না কষ্ট করে।"

খোকা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, গলা যা বাহির করিল তাহার তুলনায় পূর্বের কান্না কোথায় পড়িয়া থাকে। মুখে ঐ এক বুলি, "যুজ্যু কলতে যাবো, নডাই-কলা ছেপাই হবো······"

উহার মাতা ছুটিয়া আসিল। বলিল, "পারলে না তো ? আমি জানি, তোমার দ্বারা এটুকুও হবে না।"

মেয়েও ছুটিয়া আসিল। তাহার কথাবার্তা তাহার মায়ের মতোই ব্যঙ্গপ্রবণ, শুধু শিক্ষার জন্য একটু মার্জিত ; দরজার নিকট আসিয়া বিস্মিত কণ্ঠে শান্তভাবে

বলিল, "ওগুলো তোমার থাপ্পড় ছিল বাবা? সর্বরক্ষে! আমি ভাবলাম, বোমা ফাটলো বুঝি! সত্যি, এখনও আমার বুক ধড়ফড় করছে!"

মা ছুটিয়া আসিলেন, তিক্তস্বরে বলিলেন, "তুই দুধের বাছাকে ঐ রকম করে মারলি? কঁকিয়ে গেছে যে!"

বলিলাম, "ও সেপাই হবে, যুদ্ধে যাবে। চুপ না করে তো আরও ঠ্যাঙাবো, হয়েছে কি এখন?"

মা ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "যাবে যুদ্ধে; এমন নৃশংস বাপের কাছে থাকার চেয়ে সে লাখো গুণে ভালো। একটা কচি শিশু বায়না ধরেছে, তা…"

খোকা চীৎকার করিয়া চলিয়াছে, "আমি ছেপাই হবো—কাকা গো!……"

মা তুলিতে যাইতেই এমন আছাড়ি পাছাড়ি খাইয়া পড়িল যে, তিনজনে হয়রান হইয়াও বাগ মানাইতে পারে না। সমস্ত শরীর রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ঘাম আর অশ্রুর সঙ্গে মেঝের ধূলা মিশিয়া হালকা কাদায় সর্বাঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় কি করিয়া ছড়িয়া গিয়া রক্তের রেখা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, বুলি—"আমি নড়াই-কলা ছেপাই হবো, বোমা কই? কাকা গো!"

তিনজনে ওদিকে একেবারে নাকানি চোবানি খাইয়া যাইতেছে, আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করিবার জন্য দুই-একবার অগ্রসর হইলাম, কিন্তু তিনজনের ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নিষ্ফল ক্রোধে ওর অনুপস্থিত কাকার উপর ঝাল ঝাড়িতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত হইল। 'এ-আর-পি'-র খাকি পোষাকে আপাদমস্তক মোড়া, হাতে কাগজে লেপটানো একটা বাণ্ডিল, তাহার মধ্যে খাকি কাপড়েরই আরও সব পোষাক কি আছে বলিয়া মনে হইল। ওর চলাফেরা আজকাল সামরিক কায়দায়—সর্বত্র শোভা না পাইলেও বোধ হয় অভ্যাসের দোষে সামলাইতে পারে না। দুয়ারের কাছে জুতার গোড়ালি ঠুকিয়া যুক্ত পদে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "ব্যাপারখানা কি?"

ঝঙ্কার করিয়া বলিলাম, "ব্যাপার অনেক। কি সব আজগুবি খেয়াল মাথায় সাঁদ করিয়ে বসে আছিস, না শোনে আদর, না মানে ভয়—সেপাই হবো, বোমা কোথায়? নিজে ধিঙ্গি হয়েছিস, কারুর বারণ না শুনে কোথায় বোমা ফাটবে, কার ঘর পুড়বে—ঐ সব নিয়ে রয়েছিস, ওকে সামলায় কে? চারটে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একটা ছেলের পেছনে।"

মাও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন, ওর ভাজ কিছু বলিবার সুবিধা পাইল না, তবে ভাইঝি বলিল; কিন্তু তাহার মধ্যে কতটা কাকাকে তিরস্কার আর কতটা

আমার অতিসতর্কতা ও ভীরুতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ওর কাকা অবিচলিত এ-আর-পি পদ্ধতিতে খানিকটা শুনিল। আমাদের বক্তৃনির জন্য চটিয়াছে, কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কি খোকার উপর চাপা রাগে সংযতবাক্ হইয়া গিয়াছে, কিছু বোঝা গেল না। গটগট করিয়া আসিয়া খোকার সামনে দাঁড়াইল, গম্ভীর-ভাবে প্রশ্ন করিল, "কাঁদছিস কেন?"

খোকা হঠাৎ শান্ত হইয়া গিয়াছে। কাকার গাম্ভীর্য দেখিয়া, বা যে কারণেই হোক, ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছে, এবং বেশ বোঝা যায়, জোর করিয়া কান্নাটাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। কাকার প্রশ্নে একবার মুখটা তুলিয়া তাহার পানে চাহিল এবং—"নড়াই-কলা ছেপাই হবো, যুজ্যু" বলিতে বলিতে আবার ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ওর কাকা সামরিক বা স্টেজের প্রথায় তর্জনীটা উল্টা দিকে বাঁকাইয়া সেই রকম গম্ভীরভাবেই বলিল, "বেশ, চলে আয়।"

আমরা সবাই থ হইয়া কাকা-ভাইপোর অভিনয় দেখিতেছিলাম। উহারা উপরে উঠিয়া গেলে, মা শাসাইলেন, "খবরদার, মারধোর করবি নি বলছি বড়খোকা। তুই আবার ঐ পাঁশুটে রঙের ছাই-ভস্ম গায়ে দিয়ে অবধি বড় গোঁয়ার হয়ে পড়েছিস।" বড়খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মারি কাটি যা খুশি হয় করবো। তোমরা আর কথা কয়ো না, চারজন মিলে একটা কচি ছেলেকে এঁটে উঠতে পারলে না। তুলোয় শুইয়ে খালি যেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস করে একেবারে মাটি করতে বসেছ। একটু দাগ দেখলে, কি একটু আঁচড় লাগলে…".

আমি কতকটা আশঙ্কায় এবং কতকটা লজ্জায় ওরই তরফে হইয়া মাকে বলিলাম, "ঠিক বলেছে, যেমন করে পারুক করুক সায়েস্তা।"

ভগ্নী কতকটা ভয়ে কতকটা কৌতূহলে পিছু লইয়াছিল, কাকার ধমক খাইয়া থামিয়া গেল।

ভাইপোকে লইয়া বড়খোকা একেবারে তেতলার ছাদে, নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল; নিচে হইতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া যতটা বোঝা গেল তাহাতে মনে হইল না বেশ মোলায়েমভাবে লইয়া যাইতেছে।

প্রায় আধঘন্টা তিন কোয়ার্টার হইবে। খোকার কান্না নাই, কোন রকমই আওয়াজ নাই। বড়খোকার মেজাজ আজকাল যেমন রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, খোকাকে কোন অন্তরটিপুনি দিয়া থামাইয়া রাখিল কি না, চিন্তা করিতে করিতে লেখায় কখন অভিনিবিষ্ট হইয়া গিয়াছি,—"সর্বনাশ করেছে, খুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা!"—বলিয়া মা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপর দিকে চাহিয়া আমিও একেবারে

শিহরিয়া উঠিলাম।

খোকার মাথায় একটা টিংচার আয়োডিন ভেজা মোটা পট্টি বাঁধা, কপালের ডান-দিকের পট্টিটা ভিজাইয়া দিয়া একটু রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বাঁ হাতটায় আগা-গোড়া একটা পট্টি এবং মণিবন্ধে একটা ফাঁস লাগাইয়া হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো। ভাঙিয়া গিয়াছে। নাকের ডান দিকটায় একটার উপর আর-একটা আড়াআড়ি করিয়া ক্রুশের স্টিকিং-প্লাস্টার আকারে সাঁটা ডান নাসারন্ধ্র দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বীভৎস দৃশ্য একটা।

মা ছুটিয়া আসিতেছেন। "ওরে, গুমখুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা; কান্নার আওয়াজও বেরুতে দেয় নি, কি খুনে গোঁয়ার!"

খোকার মাতাও চায়ের সরঞ্জাম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বলিতেছে, "ও ঠাকুরপো, ও কি করলে! সাড নেই যে ছেলের!"

ওদিককার ঘর হইতে উহার ভগ্নীও হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণ প্রথম ভয়ের ঝোঁকটা কাটিয়া গিয়া জখমীর নূতন খাকি শার্ট, খাকি হাফপ্যাণ্ট আর খাকি মোজার দিকে আমার নজর গিয়াছে; তাহার দাঁড়াইবার নির্বিকার বরং কতটা দৃপ্ত ভঙ্গিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। "লড়াই-করা সেপাই"-এর অর্থ বুঝায় মুখে হাসি ফুটিয়াছে আমার।

মা আসিয়া পড়িয়াছে, ওর নিজের মা ও ভগ্নীও আসিয়াছে।

মার বুঝিতে বোধহয় একটু দেরী হইল। বুঝিয়াই কিন্তু চেঁচাইয়া উঠিলেন, "খোল্, শীগগির খুলে দে বলছি। শখ! বাবাঃ, এখনও বুকের ধড়ফড়ানি ঘোচেনি। কাল উলটে গেল একেবারে। খোল্ বলছি, ও বেশ দেখতে নেইঃ চোখে। ষাট! ষাট! আর ও বোম্বেটেও দাঁড়িয়ে আছে কেমন দেখ না! সে কান্নাই বা কোথায় গেল!"

উহারা উভয়েই তৎক্ষণে বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাকা প্রশ্ন করিল, "কোন্ হাসপাতালে ভর্তি হবি রে খোকা?"

জখমী সেপাই অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "বলো হাঁচপাতালে।"

দুই জোড়া জুতার দর্পিত মশ্‌মশানি বাহিরের রাস্তায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সামনেই রাস্তার ওপর দিয়ে চলমান জীবনের বিচিত্র প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। একটা বিয়ের শোভাযাত্রা ঢাকঢোল সানাই বাজিয়ে একটা আবর্ত পর্যন্ত সৃষ্টি করে বেরিয়ে গেল। আমাদের দুজনের কোরিয়ান লড়াইয়ের তর্ক কিন্তু একটুখানির জন্যেও থামাতে পারেনি; এখন এরা দুটিতে এক মুহূর্তেই বন্ধ করে যেন তালা এঁটে দিলে। মাষ্টার মশাই রাশিয়ানদের সামনে না পেয়ে চোখ মুখ রাঙিয়ে আমার ওপরই একটা কড়া মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, ভাব-ভঙ্গী সব গেল বদলে। মুখে ধীরে ধীরে একটি হাসি ফুটে উঠছে দেখে ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চাইলাম, দেখি অনেকখানি দূরে দুটিতে গলা ধরাধরি করে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমার আর সবেতেই বিরোধ, মেলে শুধু এইখানটিতেই। আটত্রিশ অক্ষরেখার দুদিকে দাঁড়িয়ে দুজনের যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল, সেটা আমিও গেলাম ভুলে, বললাম—"চমৎকার, না?"

মাষ্টার মশাই বললেন—"এক বৃন্তে দুটি ফুল একেই বলে।" না, ফুল নয়, আমার মনে হচ্ছিল দুটি প্রজাপতি; তর্ককে ঘরছাড়া করবার জন্যেই সেটা কিন্তু আর প্রকাশ করে বললাম না ওঁকে। প্রজাপতি। মাটিতে যেন ওদের পা পড়ছে না, হাল্কা হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

মাষ্টারমশাই বললেন—"দুটিকে ক'দিন থেকে দেখছি। সত্যিই কি চমৎকার!...... আমার কি মনে হয় জানেন? বড় হয়ে আমরা বোনকেও পাই না, বোনেরাও ভাইকে পায় না, তা সে যতই ভাইফোঁটার ঘটা থাক না কেন..."

সমস্তটুকুই ওদের দিকে চেয়ে বললেন মাষ্টার মশাই একবার একটুকুও কিছু যেন হারাতে চান না। আমি বললাম— "ছেলেবেলাতেও কি ওদের মতন করে পাই পরস্পরকে?"

ছেলেটি কালো, দোহারা গড়ন, একটা আধ ময়লা কাপড় কোমর বেঁধে পরা। গায়ে একটা নীল গেঞ্জি—গলার কাছটা শাদা বর্ডার, বয়স আন্দাজ বছর সাতেক হবে। মেয়েটি খুব ফরসা না হলেও ফরসাই বলতে হয়, একটি হলদে শাড়ি পরে আছে বলেই বোধহয় রংটারও জলুস আরও খুলছে। মাথায় বেড়া বেণী বয়সের অনুপাতে বেশ পুষ্ট। ছেলেটির বয়স যদি সাত বছর হয় এর বয়স ছয় বছরের বেশী হবে না, মাথায় আধ মুঠা নীচু। গড়নটা পাতলা পাতলা, গোলগাল।

হন হন করে এগিয়ে আসছে। কথা কইতে কইতে এ ওর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইছে। ও ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ নিচু করছে। অনর্গল কথা; একবার দুজনেই তার মধ্যে সেপাইদের মতো রাইট্-এবাউট্-টার্ন্ হয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল, দুপুরের রৌদ্রে হলদে কালোর ওপর একটা ঝিকিমিকি খেলে গেল। হতে পারে বাড়ির দিকে চেয়ে কিছু একটা দেখে নিলে, তারপরেই দুজনে পায়ে একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে চরকি-ঘুরে আবার হনহনিয়ে চলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি তার মধ্যেই একটু ডিঙি মেরে উঠল, লাফিয়ে কপালের চুলটা ডান হাতের তেলোয় তুলে দিতে দিতে—সব মিলিয়ে সত্যিই এমন একটা নাচের কলি ফুটে উঠল।—একটা কি? এই রকম কত কলি, রাস্তায় লুটিয়ে দিতে দিতে চলেছে ওরা। ছেলেটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কি বলছে, ভয়ানক গম্ভীর, তারই মধ্যে আড় চোখে মেয়েটির পানে চাইতে সে খিল খিল করে হেসে কুঁজো হয়ে—কুঁজো হবার ঝোঁকেই খানিকটা পেছিয়ে গেল, হাত কোলে জড়ো করা। হেসে যেন কুলিয়ে উঠতে পারছে না, অত করে কুঁজো হয়েও না, অমন করে দুলে দুলেও না; এবার বুঝি পড়বে লুটিয়ে ধুলোর ওপর।

"অত হাসিস নে গো সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, গাড়ি চাপা পড়বি।"

ঘুরে তাকিয়ে উপদেশটুকু দিয়ে চলে গেল একজন। গ্রাহ্যও নেই, যেন কাকে বললে!

মাষ্টার মশাই বললেন—"ওদের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া থাকে না, নয় কি?"

বললাম—"হ্যাঁ, ওরা যা আনন্দের রথ হাঁকিয়ে চলে, তার অতিরিক্ত ..."

গ্রাহ্য নেই-ই বা বলি কি করে? ছেলেটি নকুলে, একটু পরে কথাটাকে লাগালে কাজে, ঠোঁট কুঁচকে-কাঁচকে মুখটা আরও গম্ভীর করে মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে—"অত হাসিস নে গো, গাড়ি চাপা পড়বি!"

এমন একটা তোৎলামির ছিট মিশিয়ে বললে যে, মেয়েটা সত্যিই বুঝি যায় রাস্তার ওপর গড়িয়ে। ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে টানলে, বললে—"চ, মা এসে গেলে হাসি বের করবে ত্যাখন।"

হঠাৎই সহজ ভাব, হয়তো মা আসার সঙ্গে সত্যিই একটা গুরুতর ভয়ের ব্যাপার আছে।...আবার চলেছে, সেই রকম অফুরন্ত কথা কওয়া; এ ওর কাঁধে হাত তুলে দিলে, ও এর কানের কাছে বেড়া বেণীর গোড়াটা ধরলে হাল্কা মুঠোয়—এক একবার চলার ঝোঁকে পায়ে লেপটে পড়ছে দুজন দুজনায়। এখন আর চপলতা নেই, কি গম্ভীর কথা হচ্ছে একটু চাপা গলাতেই! পৃথিবীতে যে শুনে

সেথায় লোক আছে চারদিকে, এতক্ষণে যেন হুঁস হয়েছে। মেয়েটি হঠাৎ বেশ টান দিয়ে একটু জোরে বলে উঠল—"না ভা—ই, সে আমি পালবনি—মা দুখান করে কেতে ফেলবে!"

সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁধ থেকে আঁচলটা নামিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে ওর মুখের ওপর চোখ তুলে প্রশ্ন করলে—"খেলে নিবি একটু? আয় না।" মতামতের অপেক্ষা না করে খোঁপা থেকে ওর হাতটা টেনে ফেলে নাচতে নাচতে ছুটে পালাল।

রাস্তার ধারেই একটা জলের কল। এ সহরে কলগুলো একটু অন্য রকম, একটা বেশ বড় চৌবাচ্ছা, থামের মতো গোল। তারই চারিদিকে গোটা পাঁচেক নল বসানো, এক সঙ্গে জন পাঁচেক জল নিতে পারে।

লুকোচুরি খেলার চমৎকার জায়গা, মেয়েটা গিয়ে বাঁকের মুখে সমস্ত শরীরটা লুকিয়ে শুধু মুখটা বের করে তার হাত দুটো গোল করে ধরে শব্দ করলে—"টু!"

আমাদের স্কুলের বইয়ে ঠিক এই ধরণের একটা ছবি ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে বড্ড বেশী দেখতাম মনে আছে—গ্রীক দেবী প্রতিধ্বনির। বলতে যাচ্ছিলাম মাষ্টার মশাইকে, "ওরা এই মাটির জিনিসটিকেই কি করে স্বর্গের সঙ্গে এক করে দিয়েছে" —উনি একেবারে তন্ময় হয়ে দেখছেন বলে আর ব্যাঘাত দিলাম না, মনে হল যেন একটা পূজাতেই ব্যাঘাত দেওয়া হবে।

ছেলেটা রেগেছে। নিচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা ঠেলে ধরে একটু দাঁড়িয়ে রইল মুখটা গোঁজ করে, তারপর বাড়ির দিকে ঘুরে বললে—"তবে তুই থাক্ গা, আমি চল্লু।"

কিন্তু ওদের সবই তো শরৎকালের দেখাদেখি,—রাগ, অশ্রু, হাসি একটার গায়ে একটা ভিড় করে এসে পড়েছে; ঘুরে একবার একটু হাসলে—অন্ধকারের গায়ে যেন ভোরের ছোঁয়াচ লাগল; বললে—"এসবি নি তো?"

প্রতিধ্বনি উত্তর করলে—"টু-উ!"

"তবে রে।"—বলে ছেলেটা ছুটল কলের দিকে।

তারপরেই পড়ে গেল হাসির লুট। ওকে ধরা ছেলেটার পক্ষে শক্ত নয়, কিন্তু খেলাকে বাঁচিয়ে ধরা; নাগাল আর পেয়ে উঠছে না। ধরার মুখেই দিচ্ছে আলগা। মেয়েটা গুটিসুটি মেরে আবার তক্ষুণি ছুটে পালাচ্ছে হাততালি দিতে দিতে। আর হাসির সত্যই হরির লুট। পাঁচটা কলই খুলে দিয়েছে দুষ্টু মেয়েটা এক এক করে, পাঁচটা ঝরণা ওদের খেলায় দিয়েছে যোগ—খিল-খিল, খিল-খিলের

সঙ্গে ছলছল হাসির রব—শানের গায়ে ভরা চৌবাচ্ছার জল আছড়ে পড়ে রুপোর তারে ছিটকে পড়ছে। মাষ্টার মশাই মিটি মিটি হাসছেন ; বললেন—"শয়তানিটা দেখুন। —দাদার কাপড় তো ভিজুক, ওর নিজের শাড়ি ভেজে ক্ষতি নেই।"

একজন জল নিতে এল, একটি বুড়ি। এত রেগে গেছে যে, তার তাতেই চৌবাচ্ছার বাকি জলটা শুকিয়ে যাবার কথা, যদি ঢাকনাটা খোলা থাকত।— "অলপ্পেয়েরা, পাড়ায় এয়েছে পর্যন্ত যেন উচ্ছন্ন দিয়েছে পাড়াটা! দেখতে এক-ফোঁটা। রোস তোরা, আমায় ভরে নিতে দে, তারপর তোদের দেখাই! সমস্ত কলটা খালি করে দিয়েছে গা! খেলা!……দাঁড়া, তোদের যমের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমার নিস্কিতি।"

কল চারটে বন্ধ করে দিয়ে—একটার মুখে কলসী বসিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। ওরা দুটিতে হাতবিশেক তফাতে একটা কৃষ্ণচূড়ার ঝোপের পাশে গিয়ে বসেছে ; ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এতক্ষণে মনে পড়েছে, রোদ বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে, যার জন্যে ছায়া খুঁজে নিতে হয়।…বেশ বড় ঝোপটা, চৌবাচ্ছার প্রায় পাঁচগুণ। কৃষ্ণচূড়া, একটা কলকে, এক ঝাড় বাসক, আর ও দু-তিনটে কি গাছ মিলে ছোট্ট একটি পঞ্চবটি। ছায়াই ওদের কাম্য না. আর একটা লুকোচুরি খেলার প্ল্যান কষছে? এবার একদিকে ওরা দুজনে, আর একদিকে বুড়ি; কিংবা মাঝখানে বুড়ি, আগে পিছে ওরা দুজন, আরও জমে তাহলে খেলাটা।

দুজনেই ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে হাঁটু তুলে কলের দিকে চেয়ে বসে আছে। কথা কওয়া একটু কমে এসেছে; ছেলেটা মাঝে মাঝে বুড়ির নকল করছে, তাইতেই যা একটু হাসি উঠছে।

বুড়ি জলটা ভরে কলের কাছ থেকেই একটা কাঠি কুড়িয়ে হুমকি দিয়ে কয়েক-পা এগিয়ে গেল। ওরা দুজনে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু পালাল না, ছেলেটা শুধু দুপা পেছিয়ে গিয়ে, নীচ থেকে একটা ঘাসের শীষ তুলে নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়ির মতো করে তেড়ে গেল। মেয়েটা গুটিসুটি হয়ে খিলখিল করে উঠল হেসে।

এইখানেই কিন্তু পর্ব শেষ হয়ে গেল। বুড়ি চলে যেতে ওরা আর কলের দিকে গেল না। ছেলেটা ঝোপের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে গোটা কতক কলকে ফুল আর একটা ডাগর দেখে কৃষ্ণচূড়ার শীষ তুলে নিয়ে এল, কলকেগুলো সারি সারি করে মেয়েটার মাথায় দিলে গুঁজে—ওর শাড়ির হলদে যেন শিখায় শিখায় লকলকিয়ে উঠল, তারপর দুজনে কাঁধে কাঁধ দিয়ে আগেকার চেয়েও যেন গলায় গলায় হয়ে রাস্তা দিয়ে গট গট করে চলে গেল, কলের দিকে আর ফিরেও চাইলে না।

বললাম— "ওরা কোনও খেলা একেবারে শেষ করে দেয় না।"

মাস্টার মশাই বললেন—"হ্যাঁ, They never drink to the dregs (ওরা একেবারে গাদ পর্য্যন্ত চুষে খায় না)। অভাব তো নেই, নিত্য নূতনের।"

ওদের কথা থেকে সাধারণভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের কথায় এসে পড়েছিলাম, তা থেকে আবার কখন কিভাবে কোরিয়ায় চলে গেছি মনে পড়ে না, হঠাৎ একটা হৈ-চৈয়ের আওয়াজে থেমে যেতে হল। খানিকটা দূরে, বড় রাস্তা থেকে একটা গলি ভেতরের দিকে চলে গেছে। টিকে মাটির বাসন আর গোটা দুই ভাজাভুজির দোকান আছে তাতে; সেই গলির মুখে বাজারের একপাল চ্যাংড়াদের মস্ত বড় জটলা। তার মধ্যে হাসি আছে, হাততালি আছে, আবার কান্নার গলায় ঝগড়াও আছে চিৎকার করে। এটা একেবারে শিশুকণ্ঠে। ওরা দুটিতে আমাদের মনটা বাৎসল্যরসে খানিকটা সিক্ত করে দিয়ে গিয়েছিল বলে আমরা দুজনেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম। সব শিশুই ঐরকম হাসি খেলার জন্যে তোয়ের হয়েছে, কাঁদবে কেন? তা ভিন্ন কান্নার সঙ্গে হাততালি হাসিও আজ যেন বেশী রকম বর্বর বলে মনে হল; এমনি তো সব আসছে সয়ে ক্রমে ক্রমে।

আমরা এগুতে এগুতেই ঝগড়ার আওয়াজটা হঠাৎ যেন চেপে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে হাসি-হাততালির দমকটা গেল চড়ে, তারপর দুপা এগুতে ভিড়ের একটা ফাঁকে নজর যেতেই এই বন্য উল্লাসের কারণটা বুঝতে পারলাম—যারা ঝগড়া করছিল, তারা হাতাহাতি কামড়াকামড়ি করতে করতে জমি নিয়েছে। ছুটে গেলাম। তার আরও কারণ, ভিড়ের ঐটুকু ফাঁকে চকিত দৃষ্টিতে মনে হ'ল যেন হলদে-কালোর মাখামাখি।

ভিড় চিরে ঢুকতে ঢুকতে দেখি যা ভয় করেছি তাই, সেই ছেলেটা আর মেয়েটাই। কি গূঢ় উপায়ে জানি না মেয়েটাই ছেলেটাকে পেড়ে ফেলেছে—অন্তত আমরা গিয়ে তাই দেখলাম—তার ওপর খামচে, কামড়ে একসা করে দিচ্ছে, ছেলেটা বেকায়দায় পড়ে নিচে থেকে হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে একটা বেণীর গোড়াটা ধরেছে মুঠিয়ে, অন্য হাতে চালেছে কিল, চড়, খামচানি যখন যেটা সুবিধে পাচ্ছে—গালে, পিঠে, কোমরে, এক একবার কোনখানেই নয়—হাতটা ফসকে গিয়ে শূন্যে ঘুরে যাচ্ছে।

আমরা অবশ্য দাঁড়িয়ে দেখছিলাম না, ভিড় চিরে ঐ কয়েক পা যেতেই যা দেখলাম। ভিড়ের মধ্য থেকে নানা মন্তব্য নানা উপদেশ—নানান ভাষায় উৎসাহ-দান..."তুই এবারে উঠে আয়, চুলে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে...আর উঠে কাজ

নেই, বল্, মা ধরণী দ্বিধে হও সেঁধে যাই একেবারে…তুমি ছোড়োনি মা রণচণ্ডী কোথাকে ছিলে এতদিনে?—এত বড় দাঙ্গাটা গেল!…ধুতি শাড়ি অদল বদল ক'রে নেরে ছোঁড়া, মেয়ে মানষের হাতে মার খাবি তো অন্তত শাড়ি পরেই খা!" ছেলেটা গোঁ গোঁ করতে করতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেয়েটাকে প্রায় উলটে ফেলেছে, এমন সময় আমরা দুজনে গিয়ে দুটোকে সরিয়ে নিলাম। একবার চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বললাম—"দুটো বাঁদরে ঝগড়া ক'রে খুন হয়ে গেল আর তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ—আরও লেলিয়ে দিয়ে!…আর তোরাও ভাইবোন হয়ে…"

হাসিতে হাততালিতে আবার একটা কলরোল উঠল—"ভাইবোন কি মশাই, ওরা স্বামী স্ত্রীরি!…অমন অধর্মের কথা বলেন কেন? অর্জুন ঋষির মেয়ে…এই সেদিন ওটাকে ঘজ্জামাই করে নে 'এলে' অর্জুন …"

মেয়েটার শাড়ি কুটি কুটি হয়ে প্রায় সমস্তটাই রাস্তায় লুটচ্ছে, একটা গেরোর সঙ্গে কোমরে যা সামান্য আছে লেগে; ছেলেটার যেটুকু আছে সেটুকু কোমরেই জড়ানো, তার নিচে কিছু নেই। নখের আঁচড়ে, বোধ হয় দাঁতের কামড়েও দু-জনের শরীর ক্ষতবিক্ষত—পা থেকে মাথা পর্যন্ত; তারই মধ্যে আহত দাম্পত্যের স্মৃতি জাগিয়ে মেয়েটির খোঁপায় একটি কলকে ফুলের আধখানা কি করে রয়েছে আটকে।

চারিদিকে মুড়ি আর ছোলা ভাজায় ছত্রাকার। মেয়েটিকে একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দিচ্ছি, হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আবার তার সঙ্গে আধ আধ কথায় আপসানি, "ইছ, বল! মুলো জ্বেলে দি অমন বলেল মুয়ে। আব্দেক্তা মুলি ছোলা ওল কোঁচলে ধেলে দাও! দেবে!—মুলো জ্বেলে দেবে মুয়ে!…"

ছেলেটা শুধু উগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, একবার মাত্র বললে—"খা মুড়ি বাটি থেকে কুইড়ে খানা কত খাবি!…দেবে না! একলা খাবে—অমন রাক্কুসী ক'নের বাকোড়ে আকার ছাই ঠুসে দি…"

ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরতে ফিরতে বললাম, "হতভাগারা অমন একটা জমাটি জিনিষ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট করে দিলে!"

মাষ্টার মশাই এত অল্পে দমবার পাত্র ন'ন, এত বিস্মিত হয়ে পড়লেন যে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "সেকি! এটুকু না হ'লে যে অপূর্ণ থেকে যেত মশাই সমস্ত জিনিসটাই! আদি জননী ইভ আর আদি পুরুষ আদম কি খালি গলায় গলায় হয়েই থাকতেন? ঝগড়া হোত না কখনও।…আমি তো সেই কথাই

ভাবছি—আমাদের দাম্পত্যজীবন—তাতে এত মাখামাখি তো নেই-ই, ঝগড়াটাও যদি এই রকম অবাধ মুক্তিতে করতে পারতাম মাঝে মাঝে!"

লেতিচ্চিৎ

কি যে এক আজগুবি বায়না ধরেছে, বাড়ির সবাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন মতেই সামলাতে পারছে না মেয়েকে। আমি যখন গেলাম তখন একটা বিরতি, কচি ছেলেমেয়েদের বায়নায় যেমন চলে মাঝে মাঝে। রকে একটা মাদুরের ওপর বসে আছে, সামনে মাটির, কাঁচের, পেটাপার্চার নানারকম পুতুল; খেলাঘরের হাঁড়ি, কড়া, উনুন, হাতা, খুন্তি; একটা ছবির বই; গোটা দুই রবারের ফানুষ; এর ওপর সমস্ত মাদুরটায় এক রাশ মুড়িমুড়কি ছড়ানো দেখে বোঝা যায় সব রকম চেষ্টা করেই দেখা হয়েছে; মন কিন্তু পাওয়া যায় নি মেয়ের। আমি গিয়ে উঠনে দাঁড়াতে নিচু মুখেই একটু আড়চোখে দেখে নিলে। দুর্জয় অভিমান, কান্নাটা চেপে রেখেই শোধ নেবে। সেই চেষ্টাতেই ফোঁপানির তোড়ে সমস্ত শরীরটা দুলে উঠছে, এমন সময় ওর ভাই বাইরে থেকে এসে গট্‌গট্‌ করে রকে উঠল, দুটো পকেট থেকে একগাদা ন্যাকড়া বের করে ওর কোলের কাছে ছুঁড়ে দিতে দিতে বললে—"নে, কত ছিট নিবি, কোন্‌টে পছন্দ বল্‌, আরও এনে দিচ্ছি।"

দর্জির দোকানের ছিটের টুকরো; খুকু রংচঙে দু'একখানা তুলে নিয়ে দেখলে, মনে হোল একটু যেন অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছে, তারপরেই যেন হঠাৎ আবার খেয়াল হোল এ ভোলাবার চেষ্টা, সমস্ত টুকরোগুলো দুহাতে ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে গলাফাটানো চীৎকার, "লেতিচ্চিৎ! লেতিচ্চিৎ! আমার লেতিচ্চিৎ!"

সবাই এসে আবার দাঁড়াল বাইরে, ওর ঠাকুরমা বললেন—"হোল আবার আরম্ভ···! দেখছেন তো? সকাল থেকে ঐ এক বুলি মুখে, সারা রাস্তায় জ্বালিয়েছে, বাড়ি এসেও নিবৃত্তি নেই—লেতিচ্চিৎ! যাই না কেন সামনে এনে ধরো লেতিচ্চিৎ চাই—বলুন তো, মানুষে কথা বুঝবে, তবে তো তার ব্যবস্থা হবে। ফিক বসিয়ে ওর ওপর যা কতক, তারপর গোয়াল ঘরে ফেলে রেখে আসুক···

এগিয়ে যেতে যেতে একটু শাসনের সুরেই বললাম—"আপনাদের ঘটে একটু

বুদ্ধি নেই; একটা সোজা কথা বললে বুঝতে পারবেন না সে দোষ তো ওর নয়…
এই তো আমি শুনেছি কি বুঝে নিয়েছি।”

কোলে তুলে নিয়ে বললাম—“এসো তো দিদি, আমি দিচ্ছি; এই এক্ষুনি। ও চাইছে কি, ওর সামনে একগাদা বাজে জিনিষ জড়ো করে মনে করলেন সব মস্ত বড় বুদ্ধিমান হয়েছি। আহা-হা পুতুল যেন কখনও দেখেনি খুকু, মুড়ি মুড়কি—জিলিপি যেন কখনও খায়নি ভোলানো হচ্ছে ওকে! ও চাইছে লেতিচ্চিৎ…না দিদি, তুমি লোতিচ্চিৎ চাইছ না? বলো তো আমায়……।”

ফোঁপানিতে শরীরটা থরথরিয়ে উঠল তারই মধ্যে ঝাঁকড়া মাথাটুকু দুলিয়ে জানাল—হ্যাঁ।”

“ঐ দেখুন, ঠিক বুঝেছি কিনা আমি, যার একটু বুদ্ধি আছে সেই পারবে বুঝতে—তা নয়, পুতুল, হাঁড়ি বই!—খুকুর কি এখন রান্নাবান্না করবার সময় আছে, না দাদাদের মতন বই কোলে করে বসে থাকবার সময় আছে?—না পুতুল খেলবারই সময় আছে?…:…আছে দিদিমণি, তুমিই বলো না……।”

“ না লিতিচ্চিৎ।”

কথা বাড়িয়ে চলেছি আর ও দিকে মনে মনে সাড়া দুনিয়া, তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি—এ পোড়া ‘লেতিচ্চিৎ’ জিনিসটা কি, কোথা থেকে এ ভূত এসে ঘাড়ে চাপল! আবার একবার ভালো করে রকে ছড়ানো জিনিসগুলো দেখে নিলাম, জামা জুতো বাদ দিয়ে তো সবই রয়েছে, কচিদের মন ভোলানোর মতো এ সবের অতিরিক্ত আর হতেই বা পারে কি মাথায় তো আসছে না, এদিকে এমন বিজ্ঞ সেজে নেমেছি যে আমিও যদি একবার ভুল করে বসি কোন উপায়ই থাকবে না।

নজর পড়ে গেল মাথার ফিতেটার ওপর। যা গা-হাত-পা চালচ্ছে, আসমানী রঙের চওড়া ফিতের ‘বোটা খুলে থেঁৎলে গিয়ে রকের নীচে ছিটকে পড়েছে।’

একটু যেন অবলম্বন পাওয়া গেল, বিশেষ করে ছিটগুলো দেখে একটু অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছিল দেখলাম।—তবে অত্যন্ত পিচ্ছিল পথ, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সর্ব্বনাশ। ভোলাতে ভোলাতে নেমে এসে ফিতেটা কুড়িয়ে নিয়েছি, তুলসী মঞ্চের যে চাতালটুকু আছে তার সামনে বললাম—“নামো তো দিদি দেখি।”

স্পষ্ট করলে চলবেনা, শুধু ইঙ্গিতে যতটুকু হয়। দাঁড় করিয়ে ফিতের গেরোটা খুলে আবার ঠিক করে বাঁধতে বাঁধতে বললাম— “আরে এই দেখো না বুদ্ধি সবার, আজকাল কেমন চমৎকার ছিটের ফিতে সব পাওয়া যাচ্ছে, রেশমের আবার

মালিকের কত রকমের ছিট সব—সাদা, জেডনে, সবুজ, ফুলকাটা, লতাপাতা দেওয়া চেক—কী সুন্দর ছিট সব—না খুকু……?"

মাথা দুলিয়ে জানালে হ্যাঁ। … আশা হচ্ছে। ছিট কথাটা যতবার পারছি বসিয়ে যাচ্ছি—।

"তা ওঁদের সে আক্কেল আছে যে সেই সব চমৎকার ছিটের ফিতে আনবেন একটু কিনে? সেই পুরোনো পচা এক রঙের ফিতে!……আচ্ছা, এখন এইটেই পরছে খুকু খালি মাথায় তো বিচ্ছিরি দেখাবে—তারপর আমি যখন …।"

একটু চুপ করে ভেবে নিলাম, করাই যাক না আর একটু সাহস যদি লেগে যায়।

বললাম—"আমি যখন একেবারে লেতিচ্চিতের মতন এতখানি চওড়া ছিটের ফিতে এনে…।"

অত্যন্ত শৌখীন মেয়ে, কিসে, 'চমোৎকার' দেখায় উদয়াস্ত সেই ভাবনেই রয়েছে, যাতে বেশ পরিপাটি করে ফিতেটা বাঁধা হয় সেই জন্যে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, লেতিচ্চিৎ কথাটা শুনেই একবার চোখ তুলে মুখের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলে।

বোঝা গেল বেতালা হয়ে গেছে, এ জিনিসও, সুতরাং আর এগুনোও ঠিক নয়। ফিতেটা ভালো করে বেঁধে কোলে তুলে নিলাম। বুক গলা ঠেলে আবার একটা ফোঁপানি উঠে দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। গতিক ভালো নয়, ও সন্দেহটুকু ভালো করে মিটিয়ে নেওয়া দরকার, বললাম—"কি রকম বোকা দেখো না সব, খকু বলছে লেতিচ্চিৎ—অতবার অত স্পষ্ট করে বলছে—বাবুয়া জামার ছিট নিয়ে এসে হাজির, খুকু যেন বোকা মেয়ে! … জামার ছিট কখনও লেতিচ্চিৎ হতে পারে যে ভুলিয়ে দেবে খুকুকে?"

"পিঁতের চিত্তও না।"

মনে মনে বললাম—তা অনেকক্ষণ বুঝেছি, কিন্তু কি তা একটু ভেঙে বলতে পার? মাথা যে ক্রমেই গুলিয়ে আসছে, এবার যদি আছাড় খেয়ে পড় ঘূর্ণিনীতে, তো আর কি তোমায় যাবে সামলানো?

সুরে সুরে মিলিয়ে উত্তর করলাম—"ফিতের ছিট কখনও হতে পারে! দেখতো ভুল আমার! তা হ'লে তো জুতোও ওদের ফ্রিলুনিয়া হয়ে যাবে। নয় কি?"

এ যাত্রাও কোন রকমে সামলানো।

তো বাবা কি আমার 'কাবু' আর মন অন্য দিকে, তবু যা হোক অমন

পাওয়া যাচ্ছে। এক রকম করে। শেষ হলে আবার মুখে চোখে আর দুই হাতে তুটো হাত দিয়ে একটু অভিনয় করা গেল,—বললাম 'বাঃ' চমৎকার দেখাচ্ছে!"

এ চাটুবাদ ওদের কানে এখন থেকেই মধু ঢালে, আর কাছু চাটুবাদের মুখে, এরপর স্বয়ং আপনজনের।

একটু যে ঠোঁটে হাসি ফুটল—দেমাকের, আত্মপ্রসাদের তাইতেই আমার মনে পড়ে গেল—প্রসাধনের দিকটাতেই ঝোঁক দিলে কেমন হয়। ওর তো সবচেয়ে বড় তুর্বলতাই ওটা, সাজাতে—গোছাতে বেশ ঢালা খানিকটা সময় তো পাওয়া যাবেই গবেষণার জন্যে, চাই কি অন্যমনস্ক হ'য়ে একেবারে ভুলেও যেতে পারে আবদারটা শেষ পর্যন্ত।

ভোলবার পাত্রীই বটে! ফল হোল একেবারে উলটো।

ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর মাকে ডেকে বললাম—"মেয়েটাকে কী বিচ্ছিরি করে রেখেছিস দেখ্ দিকিন, খালি মার-ধোর আর বকুনির জন্যে যা হয়েছে! যে ভালো করে সাজিয়ে, চমৎকার না দেখালে করবে না কান্নাকাটি, তুই করতিস না?"

বেশ অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলো। ওর সাজগোজ আবার আপ্‌রুচি। মা-ইসাজাতে লাগল, তবে আরম্ভ করবার আগেই বললে—"দেচিং তেবিল…।

ওর মা চটছে, কিন্তু আমি রয়েছি বলেই কিছু বলতে পারছে না। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে আরশির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। খুকু বেশ ঘুরে ফিরে দেখে নিল নিজেকে।

মা চুল আঁচড়ে দিতে যাচ্ছিল, বললে—"ভালি।"

ওর মা বললে—"বাডাও কত আবদার বাড়াবে…দেখলে তো? শাড়ি চাই।'

বললাম—"তুই দে তো পরিয়ে, কেন, বাড়িসুদ্ধ্য সবাই তো হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছিলি, বদি বা আনলাম একটু সামলে…আন্, সেই দিদের টুকরোটা তো রয়েছে।"

মুখটা ভার করে বললে—"আগুনে ঘি ঢালছ, ঢালো কত ঢালবে, আমার কি?"

পরানো হল শাড়ি, যেখানে খুঁতখাঁত হতে লাগল—মায়ের চাপা রাগের জন্যে —সেখানে সেখানে ঠিক করিয়ে দিতে লাগল। ভালো করে খোঁপা বাঁধা হোল, তারপর ঠোঁটে রং গালে রং, পাউডার, টিপ, সব শেষ হলে বললে—"ব্যানিতি।"

প্রতি পদেই মেয়ের ফরমাস মতো সংশোধন করতে করতে মায়ের মেজাজ ভেতরে ভেতরে খারাপ হয়ে উঠেছে, প্রকাশ করতে পারছে না বলে আরও বেশিই বন্ধ, শেষকটা আঁধ কাঁদ হয়েই বললে—"ঐ নাও, বলিনি? …ও হত—।"

পালাটা শেষ করার আগেই একটু রাগ দেখিয়েই বললাম—"হয়েছে। কি চাস ও সব…এয়ে দে—?"

"ভ্যানিটি ব্যাগ চায়…কোথায় পরব আমি ?

একটু স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে থাকতেই হোল, কিন্তু বেশী দেরি হবার আগেই চাড় হোল, বললাম—"তোরটা দে…।

অত দুঃখের মধ্যেও ওর মা হেসে ফেললে, তাতে এদিকে আবার মুখ তোলো হাড়ি হয়ে দেখে, ধমক দিয়েই বললাম—"একটা মানুষের সব আছে, কিন্তু হাতে ভ্যানিটি ব্যাগই নেই—এতে তোর হাসতে লজ্জা করে না ?"

একটু একান্তে টিপেও দিলাম—"একটা কিছু ব্যবস্থা কর না মা, ভুলে এসেছে আবার আবদার ধরলে কি সামলানো যাবে ?"

পকেটে আমার সাপের চামড়ার পার্সটা ছিল, একটু আড়াল করে বের করে দিলাম, ওর মা গর্‌গর্‌ করতে করতে তাইতে একটা রঙিন ফিতে বেঁধে নিয়ে এল। মেকি জিনিষ চিনবে না সে মেয়েই নয়, তবু কি ভেবে আর আপত্তি করলে না খুকু, বাঁ হাতে গলিয়ে নিয়ে পূর্ণ প্রসাধনের পর কি রকমটা দাঁড়াল এঁকেবেঁকে আর্শির ছায়ায় একবার ভালো করে পরখ করে নিলে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "এবার লেতিচ্চিৎ।" ওর মা আক্রোশ ভরে টিপ্পনী কাটলে, "ভুলবে,—সেই বান্দা।"

আমি বেশ থতমত খেয়ে গেছি। আসলে আমিই গেছি ভুলে ; এতখানি যে সময় পেলাম তাতে ও সম্বন্ধে আর ভাবিই নি, বেশ বিচলিত হয়েই বললাম—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক তো…সাজগোজ তো হোল—এইবার—লেতিচ্চিৎ আনতে যাব…।

"দাবো না,—বোথে থাকব।"—মুখটি ভার হয়ে আসছে। আরও ঘাবড়ে গেলাম—এতো নূতন পথ ধরলে বলে মনে হচ্ছে। বললাম—"হ্যাঁ, দেখতো, যাব কোথায় আবার। আমরা তো বসেই থাকব এখানে—লেতিচ্চিৎই তো আসবে আমাদের কাছে।"

"আথবে না, দাবো…।"

জট পাকিয়ে যাচ্ছে উত্তরে উত্তরে। ওর মার রাগ বেড়ে গেছে নিশ্চয়, কিন্তু মুখ সে ঘুরিয়ে নিয়েছে। তার কারণও বেশ বুঝতে পারছি, আমার পরাজয়ে হাসছে। এদিকে মেয়ের যা অবস্থা তার আর বুঝি নামল বলে…।

নাজেহাল হয়ে পড়েছি, মাথায় কিছু আসছে না, তবু সামলাবার সাধ্যমতো

চেষ্টা করে বললাম—বাঃ, যাবে না খুকু! না গেলে কি [illegible] আসবে [illegible]—বসে থাকলে চলবে ?" "না, আথবে না—যাবো ! নিয়ে চলো !"

বলতে বলতে আবার সেই রকম আছড়ে পড়ে চীৎকার—"লেতিচ্চিৎ !—যাবো ! লেতিচ্চিৎ··· । লেতিচ্চিৎ··· ।"

কুটুমের সামনে প্রয়োজন মতো চটতে না পেরে ওর ঠাকুরমা মায় হাতেই দিয়ে সরে পড়েছেন। একটু করলাম চেষ্টা, তারপর আমারও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হোল। যা অবস্থা করে তুলেছে, বাড়ি ছেড়েই পালাচ্ছিলাম, কয়েক পা গিয়ে কিন্তু একটা কথা মনে হতে একটু দাঁড়িয়ে খানিকটা ভেবে নিলাম, তারপর আবার বাড়ির দিকেই ফিরলাম।

ভেবে যা নিলাম তা এই—অর্থাৎ গবেষণাটা একটু বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে করে দেখলে কেমন হয় ? একটু কোনানডয়েলের ভূমিকা আর কি ; এতক্ষণ যা হচ্ছিল তা তো মাত্র অন্ধকারে হাতড়ানো।

বাড়িতে তখন কাকচিল বসা দায়। কেউ বলবার নেই ওদিকে মাতৃত্বেও বোধ হয় অবাধ মুক্তি, চড়-চাপড়টাও পড়েছে নিশ্চয়, আর দোষ দেওয়া যায়ই বা কি করে ?

গিয়ে বললাম—"কি বলছে কেউই ধরতে পারছিনা এতো বড় বিপদ হোল, এরকম ভাবে কান্না-আবদার ধরে থাকলে অসুখে পড়ে যাবে যে।"

ওর মা বললে—"তুমি নিশ্চিন্দি থাকো, এ নিত্যি হচ্ছে। এই ওষুধ পড়তে আরম্ভ হয়েছে, এবার ঠিক হয়ে যাবে।" বললাম—"মন্দ ওষুধ নয়, রোগ-রোগী কোনটাই থাকবে না।···যা বলি শোন, খুব মা হয়েছিস !, ওকে ওর ঠাকুরমার কাছে দিয়ে আয়। ছেলেমানুষ একটা কি কথা বলছে তা বোঝবার যুরোদ নেই, অমন পাকা গিন্নি বলে দেমাক, তিনিও হার মেনে গেলেন উলটে ওষুধের ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"তুমিও তো করলে চেষ্টা বুঝতে··· ।

"তুই যা, দিয়ে আয় আগে, শাশুড়ীর হয়ে কাকার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে না। চেষ্টা যেমন করছি তেমনি বুঝেছিও, আর তারই ব্যবস্থা হচ্ছে··· ।"

খুব মিথ্যে বলিনি, যেন মনে হচ্ছে [illegible] অর্ধেকটা পেরেছি করতে ; [illegible] অর্ধেকটা ; অবশ্য সেটা মেয়ের যা প্রকৃতি তাই থেকে আন্দাজ করে, তবু [illegible]—বদ্ধ সব কথাটুকুর অর্থ কি [illegible] নাগাল পাচ্ছি না।

ও ফিরে [illegible]—"সকাল থেকে কি যে হয়েছে [illegible], খুঁটিনাটি কিছু আর দিবি না।

একটু উঁচিয়ে বললাম—"থামো কন্যা হয়েছে। এখন তোমার শাশুড়ি ঠাকুরুণকে একটু তোরের হয়ে নিতে বলো, চটপট, বেরুতে হবে।...

"তাঁর অপরাধ ?... ।"

"যে জিনিসটির জন্য এত হাঙ্গামা যেটি গাড়িতেই ফেলে এলেছেন তাঁর বোঝা উচিত ছিল। আর কন্যারত্নটিকেও ঝেড়ে মুছে ফিটফাট করে দাও, দেখেশুনে নেবে নিজের জিনিস... ।

"কিন্তু সে গাড়ি খুঁজে বের করা—মেয়েছেলে—তাঁর পক্ষে। আবার তর্জনী উঁচিয়ে বললাম—"ফের শাশুড়ীর হ'য়ে ওকালতি! যাও, হুকুম তামিল করতেই হবে।"

একটা রিকশা করে তিনজনে এসে রসা রোডে পড়লাম, এবার আমি পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ভরসা দিয়েছি, খুকু বেশ শান্ত। ওর ঠাকুরমা বলেছেন—"নাতনীর মাথার ছিট এবার দাদুর মাথায় সেঁদিয়েছে, দেখতে চান তামাসাটা একটু!' একটা কৌতুকের হাসি মুখে নিয়ে বসে আছেন চুপটি করে।

উপরোউপরি গোটাচারেক ট্রাম ছেড়ে দিলাম। বললেন—"আপনি ঠিক সেই ট্রামটা বের করবেন ?......থাক্ টের পেলাম বেয়াই আমাদের মস্ত বড় দৈবজ্ঞ।" আসলে ভিড় ছিল। সেকথা কিন্তু না বলে চুপ করে ঠাট্টাটুকু হজম করলাম।

আর সব ঠাট্টাই সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেবার সময় তো আসছেই। জমুক না একটু।

এর পর একটা খালি ট্রাম দেখে উঠে পড়লাম। খুকুর মুখটা প্রত্যাশার উদ্বেগে রাঙা হয়ে উঠেছে' টানা টানা চোখ দুটো হয়ে পড়েছে চঞ্চল।

ব্যাপার কিছু নয়। কিছু করতেও হোত না, তবু ও গিয়ে ঠাকুরমার পাশটিতে বসবার আগে আমি বেঞ্চের পেছনে "Ladies" লেখা সাদা প্লেটটা একবার দেখিয়ে দিলাম, জিগ্যেস করলাম—"দেখো, হয়েছে তো লেডিচিং ?"

হাসি ফুটল মুখে, মাথাটি, কাৎ করে জানালে, হয়েছে।

পাঁচজনের মধ্যে পড়ে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে; তারই মধ্যে কিন্তু সেই প্রসন্ন হাসিটুকুও আর একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেইটুকু ঠোঁটে করে জানালার ধারটিতে বসে বাইরের দিকে মুখটি ঘুরিয়ে নিলে,—আগেই শাড়ির আঁচল আর ভ্যানিটি ব্যাগটা ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছে; পুরোদস্তুর একটি লেডি।

ট্রাম কলেজ ছেড়ে এগিয়ে চলল।

সান্ত্রী

খোকার নতুন বউদিদি এসেছে। মানুষটি যে বাড়ির আর সবাইয়ের চেয়ে বিশেষ করে আর বেশি করে খোকারই, এই ধারনাটাই গড়ে উঠেছে আজ কদিন থেকে ওর—চারিদিকেই তো সেই কথা—খোকার বউদিদি আসবে এবার।…খোকা, তোমার বউদিদি আসছে, শীগ্‌গির লক্ষ্মী হয়ে পড়ো…ওর দাদা এবার খোকার জন্যে বউদিদি নিয়ে আসতে যাবে…লিলি বলে, তোল বউদিদি এলে আমায় দিবি না-বাই ?

দেবে খোকা, তার জন্যে লিলির হাতে বিস্কুট, লজেন্স চক্‌লেট যাই থাক্‌, তার অর্ধেকটা করে আগাম পেয়ে আসছে। তারই বউদিদি যে!

বউদিদি যখন এল, খোকার কিন্তু বড্ড কি রকম মনে হতে লাগল। বউদিদি মোটরগাড়ি থেকে নামল, রাঙা পা, রাঙা কাপড়, মাথায় গয়না, দাদা খোকার জন্যে আস্তে আস্তে বেঁধে নিয়ে আসছে, বাজনা শাঁখ উঠল বেজে, খোকার কিন্তু কি রকম মনে হতে লাগল, সে সবাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে একেবারে চণ্ডীমণ্ডপের থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই খোঁজ পড়ল, ওরে, নতুন বৌয়ের কোলে ছেলে দিতে হবে যে, খোকাটা কোথায় গেল ?…খোঁজ, দেখ…"

খোকা কিন্তু যাবে না, কোনও মতেই যাবেনা—না কোন মতেই না…

চল, লক্ষ্মীটি…তোর বউদিদি হয় যে রে খোকা।…চল, সোনা আমার, লজ্জা কিসের ? বউদিদির কোলে বসবি…তা হলে নিয়ে আয় লিলিকে ডেকে, গোড়া থেকেই নিক কেড়ে…

লিলির ভয়, তার ওপর দুহাতে দুটো সন্দেশও…বসল গিয়ে খোকা, চোখ দুটো শক্ত করে বুজে, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে…আর একটু দেরি হলেই খোকা কেঁদে ফেলত।

বড়ই অস্বস্তিতে কাটতে লাগল খোকার! দূর থেকে ইচ্ছে করে বউদিদির কোলে যেতে, থামের আড়াল থেকে, জানলার ভেতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, বৌদিদি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে ভাল, কাপড় সব চেয়ে ভাল গয়না, কিন্তু কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয় সাহস্ হয় না যেতে। দুর্বোধ্য মনে হওয়ার, তার আবার আরও একটু কারণ আছে,—সেদিন যখন কোলে বসেছিল—অমন তো ভালোমানুষ

দেখতে বৌদিদি, কারুর সঙ্গে কথা কইছে না, ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, খোকাকে কিন্তু দুবার কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরেছিল। কথা কয় না, অথচ আদর করবার মতন করে ঢুকিয়ে চেপে ধরে—এমন মানুষ খোকার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

বুঝে উঠতে পারে না, ভয় করে অথচ কাছেও যেতে ইচ্ছে করে, এমন মানুষের ওপর প্রথমটা একটু একটু করে রাগই হোত, কিছুই না করতে পারার জন্যেই। মনে হত যে-বৌদিদি তারই সবচেয়ে বেশি হবার কথা, তাকে যে একেবারে পাওয়া যাচ্ছে না, এর মধ্যে নিশ্চয় তারই কোথায় একটা মস্ত বড় দোষ আছে। রাগ-টাই উঠেছিল বেড়ে, এমন সময় একটা দিকে নজর পড়তে মনের ভাবটা বদলে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। যেটা বউদিদির অসহায়তা। এই বাড়িতে বৌদিদি বেচারী যেন পা টিপে টিপে চলে, সবাই যেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে সে রকম নয়, নাইতে যাবে, একজন দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কপাটের বাইরে থাকবে দাঁড়িয়ে, খেতে যাবে, একজন পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে গিয়ে বসাবে, শুতে যাবে তাতেও তাই। খোকা আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতই দেখে ততই একটা অবুঝ সহানুভূতিতে মনটা যেন ভরে আসতে থাকে। আর রাগ করতে ইচ্ছে করে না, শুধু ইচ্ছে করে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমার কি হয়েছে আমায় বল।···খোকাকেই বলা যে সবচেয়ে আগে দরকার, এই বাড়ীর মধ্যে আর সবার চেয়ে খোকার সঙ্গে সম্বন্ধটাই যে বেশি বউদিদির···আহা, বেচারী এইটুকু জানতে পারছেনা, আর খোকারও যে কি হয়েছে, কোনমতেই গিয়ে উঠতে পারছেনা কাছে।

তারপর একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ ওর সাহসটা হল।

কয়েকদিন থেকে খোকার মনটা আরও এই জন্যে খারাপ ছিল যে ওকে কেউ আদর করত না, ডেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করত না। খোকাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল কিনা, তার জন্যেই সবাই সর্বদা কাজ করত। নেমন্তন্ন হয়ে গেছে পরশু, কালও কিন্তু আদর পায়নি খোকা, সবাই খালি খুব ঘুমিয়েছে। আজ ওর মা আগেকার মত ওকে বুকের কাছটিতে নিয়ে দুপুরবেলা শুয়েছিল।

আর আগেকার মত গল্প বলছিল, সবচেয়ে সেই ভাল গল্পটা—রাজপুত্তুর আর কোটালপুত্তুরের সেইটি।

মা বলছিল, গল্প শুনলে, এবার কিন্তু তোমায় ঘুমুতে হবে খোকা, তুমি বড্ড দুষ্টুমি করে বেড়াও, আমরাও দেখতে পারিনা তোমায়, না ঘুমুলে তোমায় আর কখনও গল্প বলা হবে না।···আর কেমন সুন্দর বউদিদি এসেছে তোমার, পাড়ার মধ্যে

সবচেয়ে সুন্দর, সোনার পালঙ্কী, ঘুরে ঘুমুরে, তারপর উঠে·
কানের উপর আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে মা নিজেই পড়ল ঘুমিয়ে।

খোকার ঘুম কি করে হবে? কালো দত্যিটা যে রয়েছে কোথায়, তার মায়ার শরীর, তাই কেউ দেখতে পায় না, তাইত সে ঘুরে ঘুরে জগতের মধ্যে যারা সবচেয়ে সুন্দর তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে গভীর সাগরের মধ্যে সাতমহল সোনার বাড়ির মাঝখানে মণিমানিক্যের ঘরে রাখে লুকিয়ে। তারই সেই ঘরে আছে রাজ-কন্যে, যার হাসলে ঠোঁট দিয়ে ঝরে হীরে, কাঁদলে চোখ দিয়ে ঝরে মানিক, তারই জন্যে রাজপাটের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাজপুত্তুরকে বের হতে হয় পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে কোটালপুত্তুরকে সঙ্গে নিয়ে···

গল্প শুনতে শুনতে সবচেয়ে সুন্দর একটি মুখ ভেসে ভেসে উঠছিল খোকার চোখের সামনে, তার বউদিদির। মা ঘুমিয়ে পড়লে তারই মায়া ওকে পেয়ে বসল। আহা, বড্ড অসহায়, সর্বদা কেউ ওর কাছে না থাকলে কি যে হয়ে বসবে কখন! এই কথাই ভাবতে ভাবতে এক সময় মায়ের কোল থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে খোকা উঠে বসল। এখন তো সবাই ঘুমুচ্ছে খেয়ে দেয়ে, বউদিদির কি হচ্ছে! খোকার মনটা আনচান করে উঠল, আর যতই আনচান করে উঠতে লাগল, ততই অনুভব করতে লাগল খোকা যে, সে ভিন্ন আর উপায় নেই এই নিদারুণ সমস্যায়।···খোকা নিজে যে খুব বীর, একদিন তাকেই যে রাজপুত্তুর হয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে হবে।

মনটা ভয়ানক কী-রকম করতে লাগল খোকার, বউদিদির ওপর যত দয়া হচ্ছে মায়ারূপী যে দত্যিটা তার ওপর ততই হচ্ছে রাগ। একসময় চুপি চুপি নেমে খোকা দোরটা আস্তে আস্তে খুলে বেরিয়ে পড়ল।

বউদিদি থাকে দাদার ঘরে। এও একটা অপরিসীম রহস্য খোকার কাছে। দাদাকে ভয় বউদিদির; দেখেছে লক্ষ্য করে, ঘরেই হোক বা যে কোনও জায়গাতেই হোক, দাদা এলেই বউদিদি ঘোমটাটুকু টেনে সেখান থেকে যাবে সরে।···একটা দুর্ভেদ্য রহস্য খোকার কাছে। ভয়ে ভয়ে সেই দাদারই ঘরে থাকতে হয় বলে খোকার এক একবার বন্দিনী রাজকন্যার কথাই মনে পড়ে, অথচ দাদা তো কত ভাল, তাকে তো মায়ারূপী দত্যি বলে একেবারেই মনে করতে পারেনা খোকা। কিছুই বুঝে উঠতে পারেনা বলে মনটা যেন আরও টনটন করতে থাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এল খোকা। একেবারে নিঝুম বাড়ি, সাগরের মধ্যে-কার সেই দত্যির বাড়ির মতো কোথায় যেন থমথমে একটা ভিড় আছে। এই

মিনুটার জন্যেই নিজেকে যেন মনে হচ্ছে রাজপুত্তুরের মতন। ভয় করছে একটু একটু কিন্তু, রাজপুত্তুরের কথনও ভয় করেনি বলেই খোকা বুকের মধ্যে খুব সাহস ভরে নিয়ে পা টিপে টিপে এগুতে লাগল দাদার ঘরের দিকে—যতই এগুতে লাগল ততই মনে হ'তে লাগল সমস্ত বাড়িটা যেন সেই সাগরের মধ্যেকার রত্নপুরী আর বউদিদি যেন রাজকন্তে…

কি করছে বউদিদি ?

দোরটা ভেজানো, কিন্তু ফাঁক আছে দুটো দোরের মধ্যে। তাই দিয়ে ভেতরে দেখতেই খোকা অবাক হয়ে গেল।

সত্যিই বন্দিনী রাজকন্তে বউদিদি। ঘরে কেউ নেই। বউদিদি শুধু জানলার ওপরটিতে বসে পা দুটি ঝুলিয়ে হাত দুটি কোলের ওপর করে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে গল্পের সঙ্গে আর সত্যির সঙ্গে যে এত মিল খোকা কল্পনাও করতে পারেনি কখনও, বাড়ি, ঘর, রাজকন্তে—সব একেবারে। তারপর আরও মিল—মুখটা একবার এদিক পানে একটু ফেরাতেই চোখ থেকে এককোঁটা জল গালের উপর পড়ে চিকচিক করে উঠল মুক্তোর মত। বউদিদি কাঁদছে। কি করে, ঠিক বুঝতে পারে না খোকা, বোধহয় রাজপুত্তুরের মত খাপ থেকে রাগে তলোয়ারটা বের করতে যাবে, তাইতেই দোরে হাতটা লেগে দোরটা একটু খুলে গেল, আর ক্যাঁচ করে একটা শব্দও হলো।

"কে রে ?" বলে বউদিদি ঘুরে চাইলে।

খোকা আর রাজপুত্তুর নয়, খোকাই। পালাতে যাচ্ছিল, বউদিদি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিয়ে উঠে এসে ধরে ফেলল খোকাকে।

প্রথমটা ভয়ই হয়েছিল, পালাবার জন্তেই ছটপট করেছিল, বউদিদি বললে, "ভয় কি এই শুনি তুমি কত বীর। এস গল্প করি।

ঠিক তেমন বীরের মত আর নিজেকে মনে না হলেও খোকা বউদিদির সঙ্গে গিয়ে জানালার ধারটিতে গিয়ে দাঁড়াল, বউদিদি রইল বসে সেইরকম করে। জিজ্ঞেস করলে,—"দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন অমন করে ? দেখছিলে আমায় ?"

লজ্জা করছে খোকার, কিছু উত্তর দিতে পারলে না।

বউদিদি আবার বললে,—"আমি তোমায় কত খুঁজি, তা কোথায় যে থাক সমস্ত দিন।…বীর পুরুষ কিনা, সমস্ত দিন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়, না ?"

খোকার মুখটা হাত দিয়ে তুলে ধরে, একটু হেসে চেয়ে রইল বউদিদি। খোকা একটু হেসে বললে—"হ্যাঁ।"

"আসবে, কেমন ? তোমার জন্তে লজেন্স, চক্‌লেট কিনে রেখেছি, আর একটা কত বড় খোকা…এই দেখ না…পালাবে না তো বীরপুরুষ ?"

না, খোকা আর পালাবে না, মাথা নেড়ে তাই জানালে। বউদিদি উঠে গিয়ে দেয়াল আলমারি খুলে একহাতে একমুঠো চক্‌লেট আর লজেন্স আর এক হাতে একটা বড় খোকাপুতুল নিয়ে এসে বসল, বললে, "এই দেখ দোব, কিন্তু আগে একটা কথা বলতে হবে—আমি তোমার কে হই ?"

খোকা যে ওগুলো নেবার জন্তেই বললে তা নয়, বউদিদিকে বেশ ভাললাগছে বলেই বললে, "বউডিডি হও।"

"কি হই ?"—চমৎকার হাসতে হাসতে বউদিদি জিজ্ঞেস করলে।

"বউডিডি।"

সেই রকম হাসতে হাসতে একটু চেয়ে রইল বউদিদি, তারপর চকলেট আর লজেন্স দু'হাতে ভরে দিয়ে বললে—"আর একবার বললে এইটে দোব ; আমি ভাল করে শুনতে পাইনি।"

"তুমি টালা ?"

বউদিদি খিল খিল করে হেসে উঠল, তারই সঙ্গে একবার বুকে চেপে তখনি ছেড়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললে—"একটু বেফাঁস কথা পড়বার জো নেই কোনও ভাইয়ের কাছেই। হ্যাঁ আমি কালা, তুমি আর একবার বল, কে হই ; অনেকবার বল। তবে দোব এটা।"

পুতুলটা দাদার বন্ধু সতুদাদা দিয়েছিল বৌদিদিকে, আরও অনেক জিনিস—আরসি, রুমাল, তেল, স্নো আরও কত কি। খোকা বললে, "ওটো তোমার খোকা।"

কপালে হাত দিয়ে মুখটা ঠেলে ধরে বউদিদি চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে রইল, মনে হল রাগ করেছে, এবার বকবে, তারপর তার সেই বড় বড চোখ থেকে সত্যিই যেন হীরের মত হাসি ঝরে পড়তে লাগল, "ও-রে দুষ্টু ! বেশ, আমার খোকাই, নিতে হবে না তাকে তোমায়।"

তারপর কাছে, একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, "কে হবে রে আমার খোকা তোর ?"

খুব ভাব হয়ে গেছে বউদিদির সঙ্গে। কত আদর করে, কত গল্প করে, কত খেলনা দিয়ে; বৌদিদি যে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে তারই জন্তে এতে আর একেবারেই সন্দেহ নেই।

আর ভয় করেনা লজ্জাও করেনা। ভয় শুধু এখন [illegible] যে লিকলিক

আবার বৌদিদির ভাগ না দিতে হয়।···না, তাও দেবেনা···যা সব নিয়েছে, ফিরিয়ে দেবে বরং।

শুধু একটা কথা মনের কোথাও লেগেই রইল, বউদিদি অত অসহায় কেন? অত ভয়ে ভয়ে কথা না করে থাকে কেন? একটু দু'পা কোথাও গেলেই সঙ্গে থাকবে কেন কেউ পাহাড়ার মত? যখন একলা থাকে বউদিদির এইরূপটাই বেশি করে মনে পড়ে খোকার, এক এক সময় কান্না ঠেলে আসে। মনে মনে ঠিক করে জিজ্ঞেস করবে বউদিদিকে, কাছে গেলে আদরে, গল্পে, নতুন খেলনায় আর মনে থাকে না।

তারপর একদিন দুপুরে ও-ছাড়া অন্য কোন কথাই হতে পেল না।

সেদিনও খোকা মায়ের কোলের কাছ থেকে উঠে বউদিদির ঘরে যাচ্ছিল। আজকাল রোজ দুপুরে তার কাছেই থাকে, খাওয়া-দাওয়ার পর বৌদিদিই সঙ্গে করে নিয়ে যায়, খেলা করে, গল্প হয়, কোন কোন দিন ঘুমিয়েও পড়ে। আজ লিলিদের বাড়ি বউদিদি আর দিদির নেমন্তন্ন ছিল। খাইয়ে-দাইয়ে মা-ই ওকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। তারপরে ওকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই পড়ল ঘুমিয়ে।

আজ যে খোকা গেল তা বউদিদির সঙ্গে কথা না কইবার জন্যে, কেন ও একলা লিলিদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেল? প্রথমে ঠিক করেছিল, বউদিদি যখন মায়ের কাছ থেকে ওকে নিয়ে যেতে আসবে ও কোনমতে যাবেনা, কোন মতেই না। তারপর বউদিদি যখন এলনা আর নিতে, ও এই ঠিক করেছে। মুখটি ঘুরিয়ে বসে, হাজার লজেন্স, চকলেট দিক, হাজার খেলনা দিক, একটা কথা কইবে না।

দোরের কাছে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল খোকা। কেমন করে বউদিদিকে জানাবে যে, সে না কথা কইবার জন্যে এইখানে এসে আছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে—সেইটেই মনে মনে ভাবছিল, এমন সময় পুষী আস্তে আস্তে ভেজানো দোরটা থাবা দিয়ে একটু খুলে বেরিয়ে এল। খোকা দেখলে বউদিদি আজও ঠিক সেদিনকার মত জানালাটিতে বসে বাইরের দিকে মুখ করে রয়েছে। আজ আবার হাতে আঁচলটা, খোকা চেয়ে থাকতে থাকতেই একবার চোখ মুছলে।

খোকার মনটা টনটন করে উঠল। এখন আর সেদিনকার মত তো নয়, খুব ভাব হয়েছে এর মধ্যে। না কথা- কইবার কথা ভুলে আস্তে আস্তে দোরটা খুলে খোকা পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করলে "কাঁদচো?"

বউদিদি ঘুরে দেখেই তাড়াতাড়ি আর একবার চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললে, "ও তুমি? কই কাঁদছি আমি? বাঃ,···তুমি কখন চুপি চুপি করে এসে দাঁড়িয়েছ?"

খোকা বললে, "হ্যাঁ, তুমি কাঁদছো, আমি জানতে পারি।" খোকা যে খুব চালাক হয়েছে আজকাল, বউদিদিকে সে কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবেনা?

"কই কাঁদছি? যাঃ,। কই কাঁদছি? এই দেখ তো।"—বলে হাতটা সরিয়ে নিয়ে খোকার দিকে চাইতেই আবার চোখ দুটো জলে ভরে গেল বউদিদির, আঁচলে তাড়াতাড়ি মুখ চেপে বেশ ভাল করেই উঠল কেঁদে।

খোকা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কী যে করবে কিছু বুঝতে পারছেনা। তারপর বউদিদি এক সময় মুখটা ভাল করে মুছে ফেললে, বললে, "কান্না পাবেনা? তোমার-মতন একটা সোনামনি ভাই বাড়িতে রেখে এসেছি…"

"কেন?"

"কেন আবার, আমায় যে কেড়ে নিয়ে এল সেখান থেকে?"

"কে?"

বউদিদির উত্তরটা দিতে যে একটু দেরি হল তাতে খোকাই আবার জিজ্ঞেস করলে, "ডত্যি?"

"ডত্যি কি?"—বলে বউদিদি মুখের পানে একটু চেয়ে রইল, তার পরেই খিল খিল করে উঠল হেসে, হাসতে হাসতেই মাথা দুলিয়ে বললে, "হ্যাঁ, দত্যিই।"

"ডাডাটা টীর ডিয়ে মেরে কেড়ে নিলে টোমায়?"

বউদিদি ভেবেছিল, দাদাই দত্যি, প্লটটা যে এত গভীর আন্দাজ করতে পারেনি— কতদূর গেছে দেখবার জন্য গম্ভীর ভাবেই বললে, "হ্যাঁ, কেড়ে নিয়ে এল।"

"উড্ডার করে?"

ভাষার চটক দেখেও হাসি পায়, সেটা চেপেই বউদিদি বললে, "হ্যাঁ, উদ্ধার করে।" শুধু মনে মনে বললে, উদ্ধারের তো এই ছিরি।

"আমিও পারি উড্ডার করতে।" খোকা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ, পাশে দাঁড়িয়েছিল, জানলার ওপর উঠে মুখোমুখি হয়ে বসল।

"সত্যি?…দাদার কাছ থেকে নাকি?" অনেক কষ্টে হাসিটা চেপে ধরে গম্ভীর হয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। খোকা আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। মাথাটা খুব বিজ্ঞের মত, আর অত্যন্ত রাগী বীরের মত আস্তে আস্তে নাড়লে অনেকক্ষণ, বললে, "না, বাবা-ডত্যি আসে।"

রকমারি কাণ্ড। বউদিদি হাসিটা চেপেই সাথে কোন রকমে বলে, "কই, তাকে তো দেখতে পাইনা? আমার বড্ড ভয় করে যে খোকনবাবু, কখন এসে ধরে নিয়ে যাবে।"

"কিন্তু ভয় কোরোনা, আমি আছি।"

"তুমি তো সর্বদা থাক না। নিয়ে যখন চলেই যাবে, বাবা-মা কাউকে দেখতে পাব না, তোমায় দেখতে পাব না..."

খোকা হাতটা খেলিয়ে নিদারুণ অবহেলার সঙ্গে বলে, "পারবেই না নিয়ে যেটে। আমার এটো বড় বণ্ডক আচে সব্বডা মুকিয়ে ঠাঁকব টোমার কাছে, টারপর মায়া ডটিয় যেই টোমায় ঢরটে যাবে অমনি—ডুরুম! ডুরুম!..."

"সত্যি?"

খোকা ঠোট দুটো জড়ো করে অনেকক্ষণ ধরে মাথা দোলায়, তারপর বলে, "সট্যি মছাই, ডেকো না টখন।"

রাত্রে খোকার দাদা যতীন খেয়ে-দেয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলাটাচ্ছিল। পাশের টেবিলে একটা সবুজ শেড দেওয়া আলো জ্বলছে। আজ কথা আছে দুজনে কাব্যপাঠ হবে অনেক রাত্রি পর্যন্ত। যতীন বই থেকে মুখ সরিয়ে এক একবার ঘড়ির দিকে চাইছে, রাত দশটা এমনি তারই একটু দেরি হয়ে গেছে ফিরতে, তার ওপর বধূ মলিনা এখন পর্যন্ত এলনা।

একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে যতীন; বই ছেড়ে নেমে একটু পায়চারি করলে, একবার দরজার কাছে গিয়ে উঁকিও মারলে বাইরের দিকে। তারপর আবার গিয়ে বিছানায় উঠল।

চাঞ্চল্যের একটু কারণও আছে, এই কটা দিনেই টের পাওয়া গেল, বধূটি একটু বেশি অভিমানী, কালকে একটু হয়েও গিয়েছিল সে পাট। কতকটা তাই জন্যেই নানারকম সাধ্য সাধনা করে এই সহ-পাঠের-ব্যবস্থাটুকু করা।...এখন যতীনের সন্দেহ হচ্ছে, মলিনা হয়তো এসেইছিল, ওকে না দেখে রাগ করেই গেছে ফিরে। আসবে সেই মা যখন যাবেন ঘুমোতে ওদিকে, এগারোটা সাড়ে এগারোটায়, বলবে, শরীর খারাপ—হয়ে গেছে এ ব্যাপার একদিন, আজ আবার অভিমানের গায়ে অভিমান।

অত দেরী করলে না মলিনা, তবে বিছানায় না গিয়ে আস্তে আস্তে বড় কুশন চেয়ারটায় গা ডুবিয়ে বসল।

যতীন ঘুরে দেখে বললে, "এসনা, বড্ড দেরি করলে আজ।"

"আমিই?" চুপ করে বসেই রইল। যা সন্দেহ করেছে যতিন। বললে, "একটু দেরী হয়ে গেল পেনোদের সদরে গল্প করতে করতে।"

কোন মন্তব্য নেই, চুপ করে শুধু বসেই রইল মলিনা। যতীন আবার ঘুরে

বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল, ভাবছে, এতই যার কথায় কথায় রাগ তার সঙ্গে গোড়া থেকেই একটু অন্যভাবে ব্যবহার ঠিক হবে কিনা।

তারপর আবার ঘুরে বললে, "না, এস লক্ষ্মীটি।"

"তুমি ঘুমোও না।".

"না হয় থাক্ পড়া..."

"থাক, তুমি ঘুমোও তারপরে যাচ্ছি।"

"কেন? খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর নেমেই এল, বধূর হাতটা ধরে বললে, "চল, চল, অপরাধ হয়েছে আমার।"

মলিনার সেই ভাব, বললে, "তুমি ঘুমোও গেনা, যাচ্ছি।"

"কেন?. আমি কি যে, আমার এত ভয়? আমি না ঘুমুলে তুমি আসবেই না—না, ওঠ..."

* * *

চেয়ারের পাশেই বড় টেবিলটা, চারিদিক দিয়েই টেবিলক্লথের ঝালরগুলো নেমে এসেছে, হঠাৎ সেটা উঠল নড়ে। যা আড়ি পাতার হিড়িক, দুজনেই আঁতকে উঠে ঘুরে চাইলে।

না; সে সব কিছু নয়, খোকা, হাতে তার খেলার বন্দুকটা। বেশ সোজা হয়ে গটগট করে বউদিদির পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাতটা তখনও দাদার মুঠোর মধ্যেই, বললে, "যাও কিট্টু ভয় নেই, দাদা ডট্টি না টো, খু—ব নক্ষী।"

জবানবন্দী

আমার শেষতম উপন্যাসটিতে নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাতে রীতিমত গলদ্-ঘর্ম হয়ে পড়ি। এবং সেই. জন্যেই সক্ষম যখন হলাম শেষ পর্যন্ত, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বার মতোই বেশ একটি স্ফূর্তি অনুভব করি। মনের যখন এইরকম অবস্থা এসেছে সেই সময় চিঠিখানি পেলাম। লেখিকা একজন মহিলা। চিঠিখানি আমার প্রকাশকের দোকান থেকে রিডাইরেক্ট করা।

লিখেছেন—

মান্যবরেষু,

আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আপনার সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। আমার স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ, একটি কন্যা ও দুইটি পুত্র লইয়া আমি বহুকষ্টে সামান্য চাষের জমির উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কন্যাটির বিবাহ দেওয়ার কোন উপায়ই করিতে পারিতেছি না। কন্যাটিও বড়। খুব সুন্দরীও। কিন্তু একে অর্থাভাব, তায় সেই অর্থাভাবের জন্য লেখাপড়া শিখাইতে না পারায় মনের মত পাত্র পাইতেছি না। একা স্ত্রীলোক, দেখিয়া শুনিয়া দিবারও কেউ নাই। বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আপনি মহৎ ব্যক্তি, আমায় এই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিলে চিরকাল আপনার কাছে ঋণী হইয়া থাকিব। আপনি কতজনকে এই দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন বলিয়া আপনার শরণ লইলাম। আমার প্রণাম লইবেন।

ইতি

প্রণতা

রুবা নন্দী

১৩।এ মদন সাধু লেন

বাগবাজার. কলিকাতা।

চিঠিটা একটু অদ্ভুত লাগল। বিষয় বা লেখার দিক দিয়ে অবশ্য নয়। কন্যাদায়গ্রস্তা মোটামুটি কোন একজন শিক্ষিতা মহিলার হাতের চিঠি যেমন হওয়া স্বাভাবিক, এ-ও তাই। অদ্ভুত লাগল লেখাটার জন্য। অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা। অক্ষরগুলোর কোনটা বড়, কোনটা ছোট, লাইনগুলো আঁকাবাঁকা, কোথাও বেশি ফাঁক, কোথাও ঘেঁষাঘেষি। যুক্তাক্ষরগুলো জায়গায় জায়গায় জট পাকিয়ে গেছে। একটা মোটামুটি ভালোভাবেই লেখা চিঠির লিপিবিন্যাস একরকম অপরিণত, কেমন যেন ঠেকে প্রথমটা। অবশ্য কারণ অনেক থাকতে পারে। হয়তো ভদ্রমহিলা নিজে খুব অসুস্থা; ছোট ছেলেদের কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন।···মেয়েকে দিয়েই বা কেন নয়? সঙ্কোচ বোধ করতে পারে? কিংবা হয়তো তারই হাতের লেখা—শিক্ষার এই অবস্থা। যুক্তি অনেক সংগ্রহ করা যায়, তবে মনে হয় যেন কতকটা টেনেবুনেই। আরও একটু কেমন যেন খটকা লাগে চাষের জমির কথায়। অবশ্য, বাগবাজারে বাড়ি থাকলে চাষের জমি থাকা এমন কিছু রীতিবিরুদ্ধ নয়, জমি যে বাগবাজারেরই এমন কথাও লেখেননি ভদ্রমহিলা, তবু কি ক'রে যেন খাপছাড়া হয়ই মনে।

এও হতে পারে যে, ভদ্রমহিলা সাহায্য ভিক্ষা করছেন বলেই মনটা অনুকম্পাযুক্ত হয়ে পড়ায় সামান্য অসামঞ্জস্যগুলো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে যাই হোক, চিঠিটা পড়ে মনের ওপর প্রথম ছাপটা যা পড়ল সেটা এই।

এ ছাড়া, শেষের প্রশংসাটুকু, অর্থাৎ অনেক কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করেছি—এর ওপর আমার কোন দাবিই নেই, একটিকেও করেছি কিনা মনে পড়ে না। ওটাকে এই ধরণের চিঠির ছেঁদো কথা বলে বাদ দেওয়া যায়, যদিও নিখরচার যশটুকু ছড়াল কি করে সে রহস্যটা একটু থেকেই যায়।

যাই হোক, যেমন বললাম, এ সবই মনের প্রথম প্রতিক্রিয়া চিঠিটা পেয়ে। এটা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল এবং বাদ-ছাদ দিয়ে যা রইল তা একটি অসহায়া নারী, একটি বয়ঃপ্রাপ্তা অনূঢ়া কন্যা, সুন্দরী বলে সমস্যাটি আরও ঘনীভূত হয়ে পড়ায় চিত্রটুকু আরও করুণ হয়ে উঠেছে।

মনটাকে ধীরে ধীরে অধিকার করে ফেলতে লাগল চিঠিটা, এবং ক্রমেই একটা অশান্তির কারণ হয়ে উঠতে লাগল। এ ধরনের সাহায্য-ভিক্ষা যে আজকাল এক-শ্রেণীর লোকের মধ্যে রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে, এ তর্ক দিয়ে ব্যাপারটাকে কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না। এত অসঙ্গতি সত্ত্বেও কী যেন একটা কোথায় ছিল আবেদনটার মধ্যে, যতই দিন যেতে লাগল, ততই বেশি করে মনে হতে লাগল, কিছু একটা করা নিতান্ত দরকার, তা সে যতই সামান্য হোক না কেন।

"যতই সামান্য" বলতে নগদ কিছু পাঠিয়ে দেওয়া। তাতে কিন্তু মনটা আবার সায় দিতে চায় না। প্রথম যা বাধা এবং যুক্তিসঙ্গতও, তা এই যে, প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওঁর আবেদন, কেউ উদ্যোগী হয়ে জোগাড়যন্ত্র করে পাত্র ঠিক ক'রে, পাত্রপক্ষের সঙ্গে যথাবিধি কথাবার্তা করে, বিবাহটি দিইয়ে দেন। বেশি নিরুপায় উনি এইখানেই।

মুশকিল হয়েছে, তাঁকে ডেকে অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করা যায় না। আমার একা পুরুষের বাড়ি; অসম্ভবই। দ্বিতীয় উপায়, গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া। সেটা যেন আরও বিসদৃশ।

এরপর এই চিন্তা নিয়ে থাকতে থাকতে একদিন হঠাৎ মনে হোল, নিতান্ত ওঁর বাড়ি গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে খোঁজ না নিতে পারি, কোনও প্রতিবেশীর মাধ্যমে তো খবরটা নেওয়া যেতে পারে। একটু খুঁৎ যে তাতেও না থাকে এমন নয়, তবে বিষয়টা সমস্ত মন জুড়ে নিয়ে এমন একটা অশান্তি সৃষ্টি করল যে, অন্তত মন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যও একবার চেষ্টা করাই ঠিক করে ফেললাম।

প্রথমত, গলিটা খুঁজে বের করতেই দু'টো দিন লেগে গেল। যেদিন করলাম আবিষ্কার,—সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে অন্ধকারই হয়ে গেছে, বাগবাজার আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরত্ব—গলিটা দেখে নিয়েই ফিরে আসতে হোল। দ্বিতীয় দিন ঠিক করলাম, প্রথমে নম্বর দেখে বাড়িটা বের করতে হবে। অনেকখানি হাঁটতে হোল, এ দিকটা গলির শেষ দিক। নম্বরের ওপর দৃষ্টি রাখতে রাখতে অগ্রসর হচ্ছি, দেখি একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ির সামনের রকে একটা মাদুরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। একটু বেশ নিরিবিলিও মনে হল জায়গাটা। দাঁড়িয়ে পড়ে 'মশাই' বলে এগিয়েছিও, উনিও কাগজ থেকে দৃষ্টি তুলেছেন, থমকে চুপ করে যেতে হোল। খেয়াল হোল, ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর নামটা দেননি। একেবারে স্ত্রীলোকের নাম নিয়ে প্রশ্ন করাটা বড়ই বেখাপ্পা মনে হোল, এবং তার জন্যে নিশ্চয় এমন একটা বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠে থাকবে চেহারায় যে ভদ্রলোক একটু বিস্মিতভাবে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন—"আমাকে কিছু বলছেন?"

ততক্ষণে হুঁস হয়েছে। বললাম—"১৩।এ নম্বরটা বের করতে…"

"খুঁজে পাচ্ছেন না?—মুখের কথা কেড়ে নিয়েই প্রশ্ন করলেন উনি। বললেন —"ভুল হয় একটু। এই গলি থেকেই ডান দিকে একটা ফিকড়ি বেরিয়েছে, ব্লাইণ্ড লেন, ছোটই, ঢুকলেই নম্বরটা দেখতে পাবেন।"

মানিয়ে নেওয়ার জন্যে একটু হেসে বললাম—"বড় গোলমেলে নম্বর দেখছি এদিকে।"

উনি যেন গল্পের জন্যও প্রস্তুত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন—"গোলমালটা কোথায় নয় বলুন না? এই যে কাগজে লিখছে…"

বেশ চমৎকার একটি সুযোগ ছিল, ওঁর কথায় একটু সায় দিয়ে নিজে যে-গোলমালে পড়েছি তার কথা এনে ফেলা। কিন্তু যে রকম গল্পিয়ে মানুষ মনে হচ্ছে, আর ওদিকে না গিয়ে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই একটু হেসে বললাম —"আজ্ঞে হাঁ, কাগজ তো আর খোলবারই জো নেই।…আচ্ছা আসি, নমস্কার। ডানদিকে বললেন না?"

ঘুরে পা চালিয়ে দিলাম।

আর প্রতিবেশী নয়। এবার একেবারে সোজা ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। স্বামীর নাম জানি না, বাধাটুকু পেয়ে ভদ্রমহিলার নিজের নামটুকুও এতক্ষণে যেন একটু অদ্ভুত ঠেকল; এ-নাম এক কচি মেয়েকে কিম্বা সিনেমা-আর্টিস্টকেই মানায়। এ-নাম নিয়ে পরিচয় জানতে আরও যেন কুণ্ঠা আসতে লাগল গলায়।

ও-পার্টই তুলে দিলাম।

এরপর খানিকটা এগুতেই কানাগলি এসে পড়ল এবং তারপরেই একেবারে চক্ষুস্থির।

কানাগলিতে প্রবেশ করতেই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কম্পাউণ্ডওলা বেশ বড় একটা দোতলা বাড়ি। তারই গেটের থামে পেতলের ফলকে নম্বরটা লেখা—13-A, ওপরে গৃহস্বামীর নাম এবং পরিচয় লেখা P. K. Dutt, Zemindar। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। এ বাড়ি থেকে কন্যাদায়গ্রস্তা কারুর চিঠি বের হ'তে পারে কি করে? এর ভেতর ঢুকে এ রকম একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া যায়ই বা কি করে? নম্বরের কোনও ভুল করিনিতো? যদিও সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহই—এক আধবার দেখা নয় তো—তবু পকেট থেকে চিঠিটা বের করে মিলিয়ে দেখছি, মোটরের হর্ণে চকিত হয়ে ফিরে দেখি, একটি সুদৃশ্য মোটর যেন এই বাড়িতেই প্রবেশ করবার জন্যে যেন গলি থেকে মুখ ঘুরিয়েছে। আরোহী পেছনের সীটে একজনই। বয়স্থ; গৃহস্বামী' বলেই মনে হয়। আমি গেটের থামটার সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, হর্ন শুনে পাশ কাটাতে গাড়িটা আস্তে আস্তে গেটের মধ্যে প্রবেশ করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি তখন সরে আসবার জন্য ঘুরেছি, গাড়িটা হঠাৎ থেমে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কর্তা মুখটা বের করে এই দিকেই চেয়ে আছেন। বললেন— 'একটু শুনবেন?"

এগিয়ে যেতে একটু ভালো করে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি হঠাৎ এখানে যে?"

বুঝলাম মুখ চেনা আছে, লেখক মানুষের সভাসমিতি তো লেগেই আছে।

সবই অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত, একটু আমতা আমতা করে বললাম—"এই যে—একটা নম্বর মনে হচ্ছে, এই নম্বরটাই···"

"হাঁ, এই নম্বরই, আসুন।"

মোটরের দরজাটা খুলে ধরেছেন, আমি দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখে বললেন —"কন্যাদায়গ্রস্তা রুবা নন্দীর খোঁজে এসেছেন নিশ্চয়। ঠিক আছে, উঠে আসুন।"

গিয়ে উঠলাম, আস্তে আস্তে। উনি একটু একটু হাসছেন, আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। বাড়িটা একটু ভেতর দিকে, গাড়িটা গোল রাস্তা ঘুরে থাম-ওলা গাড়িবারান্দায় প্রবেশ করতে দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়ে আমায় আহ্বান জানালেন—"নামুন"।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হেঁকে বললেন—"ওরে, কে আছিস—একবার

রুবা নন্দীকে ডেকে দেতো। বলবি, আর একজন ঘটক এসেছেন।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চওড়া বারান্দা, দামী সোফা সেট পাতা, মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের টপ দেওয়া সুদৃশ্য গোল টেবিল। একটি সোফায় আমায় বসতে অনুরোধ করে নিজে একটাতে বসতে বসতে বললেন—"কী কাণ্ডটা যে করেছে, কোথায় যে এর শেষ..."

এবার বেশ ভালোভাবেই হেসে উঠলেন। যেন কিছু কিছু আন্দাজ পাচ্ছি এতক্ষণে, মন একটু সহজও হয়ে এসেছে, প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপারখানা কি বলুন তো?"

ঠিক এই সময় একটি ফ্রক পরা বছর চারেকের ফুটফুটে মেয়ে লাফাতে লাফাতেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল এবং একবার আমার দিকে চেয়ে ওঁর হাঁটুর কাছে এসে গায়ে লতিয়ে পড়ে আবার আমার দিকেই কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল। কর্তা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"এই আপনার শ্রীমতী রুবা নন্দী। সোজা এঁকেই জিজ্ঞেস করুন এবার।"

মেয়েটির চিবুক ধরে মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি দিদি! হোল মেয়ের কোনও হিল্লে?"

একটু জড়োসড়ো হয়ে গেলেও, বেশ সপ্রতিভ মেয়েটি। তাছাড়া দাদুই তো। ঠোঁট দুটি গুটিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্তা পাকা গৃহিণীর মতোই মাথাটা দুলিয়ে বলল—"বড্ড কাঁই। দেখতেও তেমন..."

নাকে ঠোঁটে মিলিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যে, আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম। একটুও অপ্রতিভ নয়। চোখ দুটো বড় বড় করে ওঁর দিকে ঘুরে বসল—"আর জান দাদু? বংছেও দোছ আছে।"

এবার একেবারে হো হো করে হেসে উঠলাম দুজনেই। কর্তা বললেন—"বুঝুন একবার, ঘরের কেচ্ছা টেনে বের করাটা, মেয়েই তো!"

রুবাকে বললেন—"না, এবার আর ওসব খুঁৎ থাকছে না। খুব ভাল পাত্রের সন্ধান এনেছেন উনি। ছেলে দেখতে শুনতে কার্তিক, খাঁই একেবারে নেই, এদিকে নৈকষ্যকুলীন। তুমি যাওতো, বেশ ভালো করে চা, কেক্, মিষ্টি সব সাজিয়ে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ তোমার ঘরের অবস্থাটা ভালো করে জানিয়ে কথা-টথা পাকা করে ফেলি। কর্তার কিছু চিঠিপত্র এল?"

মেয়ের বিয়ের সুরাহা হয়েছে, নিরুদ্দেশ কর্তার জন্যে আর ভাবনা নেই রুবার, বব দুলিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সিঁড়ি বেয়ে নাচতে নাচতে উঠে গেল ওপরে।

প্রশ্ন করলাম—"তা এই রকম দাদু থাকতে, বাইরে পত্রাঘাত—এ রহস্যটা

তো পরিষ্কার হচ্ছে না"—"রহস্যটা জটিলও খানিকটা।"—দত্তজামশাই হেলান দিয়ে গুছিয়ে বসলেন। বললেন—"ও বেচারির ভরসা আবার বিশেষ করে আপনাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের ওপর—যাঁরা গল্প উপন্যাস লেখেন।"

প্রশ্ন করলাম—"এ পক্ষপাতিত্বের কারণ ?"

"কিছু মনে করবেন না, আপনারা যে নানারকম জটিল অবস্থা থেকে নায়ক নায়িকাদের টেনে তুলে তাদের মিলন ঘটাতে দক্ষ ! আর এমন যোগাযোগ, আপনারই একখানা নভেল থেকে ও বেচারি এই গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পায়।

এরপর লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে জানতে পারলাম—আমার শেষতম গ্রন্থখানি নিয়েই একদিন অবসরের মজলিসে মেয়েদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। তাইতে একেবারে গেল গেল করেও আমরা কি ভাবে সামলে নিই, সেই নিয়ে বিভিন্ন কণ্ঠে যে মন্তব্য হয় তার মধ্যেই একজন রুবাকে উদ্দেশ করে বলেন—তার মেয়ের বিয়ের এত সমস্যা, ঘুম হচ্ছে না, যারা বই লেখে তাদের বলুক না ব্যবস্থা করতে। হাসিচ্ছলেই। এর পরেই ব্যাপারটা এই গুরুগম্ভীর আকার নিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই ওঁর টেবিল থেকে একটা চিঠি অদৃশ্য হোল। আমতা থেকে এক কন্যাদায়গ্রস্তা মহিলা সাহায্য চেয়ে চিঠিটি দিয়েছিলেন। অবশ্য তার সঙ্গে এ-ব্যাপারটাকে যুক্ত করবার কোনই কারণ ছিল না। তারপর হারাবার দিন পাঁচেক পরে, এক ভদ্রলোকের (তিনি লেখকই) রুবা নন্দীর নামে লেখা একটি চিঠি হাতে পড়ায় দত্তজামশাই কৌতূহলবশে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে অনেকটা যেন হদিস পান। মূল সেই চিঠিটা ধরে যে-সব প্রশ্ন হতে পারে সেই সবের অবতারণা করে চিঠিটা লেখা।

এই সূত্রটুকু ধরে রুবাকে শেষে ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রশ্ন করে জানা গেল, ওদিকে মেয়েদের লঘুভাবে বলা কথাটা শুনে দারুণ অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো সে দেখতে পায়। কি ভাবে এই রকম অঘটনঘটপটীয়ান বই-লিখিয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় ভাবছিলই, এই সময় কন্যাদায়ের জন্য সাহায্য চেয়ে এই ভদ্রমহিলার চিঠিটি আসে। আদরের দৌহিত্রী, মামার বাড়ী এসে ওঁর কাছে কাছেই থাকে, দৈবক্রমে সে দিনও ছিল। চিঠিটা পড়ে আলতো ভাবে নিজের মনেই কন্যাদায়ের সমস্যা নিয়ে কিছু বলে থাকবেন, রুবার দৃষ্টি পড়ে যায় চিঠিখানির ওপর। অদৃশ্য হয়ে যায় সেটি।

এর পরের সমস্যা একজন সক্ষম এবং বিশ্বাসী লিপিকার সংগ্রহ করা। রুবার [illegible] সামনের সরস্বতী পূজায় হাতেখড়ি হবে, এখনও চার-পাঁচ মাস বাকী।

তবে এঁনিয়ে খুব বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হোল না। ওর বিপুল প্রতিপত্তি এখানে, বিশেষ করে ছোটদের মধ্যে। তাদের যে-সব বস্তু লুব্ধ করে অথচ নাগালের বাইরে, দাদুর পেয়ারের নাতনির শরণাপন্ন হলেই তা হাতে এসে যায়। এইরকম একজন পাওয়া গেল বীরুকে। সেও নাতি, পৌত্র, তবে স্কুলের ছাত্র বলে আদরের অভাব না থাকলেও কতকগুলি বিধিনিষেধের মধ্যে পড়ে খানিকটা অসুবিধাগ্রস্ত। তাকে হাত করে ফেলতে বেগ পেতে হোল না রুবার। তাকে দিয়েই বই ঘাঁটিয়ে লেখকদের নাম জোগাড় করে ঐ আগের পত্রখানির নকল করে পাঠিয়েছে। ঠিকানা অবশ্য প্রকাশকদের, যেমন আমার ক্ষেত্রেও দেখলাম। যতদূর জানা গেল, এ যাবৎ পাঁচখানি এইরকম পত্র গেছে। শেষতম বোধহয় আমারটিই। বইটা হাতে হাতে মহিলামহলে ঘুরছিল, সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না।

লিপিকার বীরু উপস্থিত পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

আমাদের গল্পের মধ্যে রুবা এল নেমে, চাকরের হাতে একটা ট্রেতে খাবার আর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। এবার মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। উত্তেজনা, তার সঙ্গে একটু লজ্জাও। ওপরে নিশ্চয় আলোচনা চলছে, প্রশ্নাদির হিড়িকে পড়ে গিয়ে থাকবে।' এবার আমিই কোলে টেনে নিলাম। আপত্তি নেই, তবে একটু জড়ো-সড়োই। চিবুকটি তুলে ধরে বললাম—"তা রুবাদি, মেয়েটিকে একবার দেখতে হবে তো।"

"যাঃ।" আরও গুটিয়ে গিয়ে উত্তর করল এবার। বললাম—"না হয় থাক, যখন বলছই খুব সুন্দর, আমি একেবারে রাজপুত্রের মতন ছেলে এনে দোব, দেখে নিও।...তা হলে কালই, কি বলো? রোববার, বেশ ভাল দিন।"

একটু হেসে মাথাটা একটু কাৎ করল। তবে সরে পড়তেই চায়; হাত একটু ঢিলে করতেই তুড়তুড় করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

চা-জলখাবারের সঙ্গে ওদের জগৎটা নিয়েই গল্প চলল আমাদের। ওঠবার সময় রুবার হয়ে বিবাহের নিমন্ত্রণটা পাকা করে দিলেন দত্তজামশাই। বললাম —"অতিথি নিয়ন্ত্রণের বাজারে আর হাঙ্গামা বাড়াচ্ছেন কেন?"

হেসে বললেন—"ভুলে যাচ্ছেন কেন, রুবার জগৎ সব আইন কানুনের ওপরে।"

হেসে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে সোজা চৌরঙ্গীর বাসে গিয়ে উঠলাম। হগ্ মার্কেটে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্তা রুবা নন্দীর মেয়ের জন্য বেছে বেছে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বর সংগ্রহ করতে হবে আগে।

অদ্ভুত একটা চঞ্চলতা পড়ে গেছে ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে, এই যারা আট নয় বছরের মধ্যে। পাকাচুল তুলে দেওয়া, পায়ে হাত বুলোনো, কি পিঠে সুড়-সুড়ি দেওয়ার জন্য যাদের ডাক পড়ে, এই করে যারা দু'-পয়সা রোজগার করে।

দু'-দিন পরে জ্যাঠামশাই আসছেন।

রোজগার কিছু কিছু প্রতিদিনই আছে অবশ্য, দাদু রয়েছেন, দিদিমণি রয়েছেন, যাঁরা অতবড় নন তাঁদেরও মাথায় খুঁজেপেতে দেখলে পাওয়া যায় দু' চার গাছা করে পাকা চুল। তা' ছাড়া পায়ে হাত বুলোনো, পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া আছে, কিন্তু সে যা আয় তাতে জুত হয়না। ভাগ বসাতে আছে অনেকগুলি। এদিকে দাদুর মাথায় একটা রুটির মত টাকই মাঝখানে। দিদিমণির পাকা চুল বেড়ে যাচ্ছে বলে টাকের ভয়ে কমই তোলান আজকাল। হাত বুলোনো, সুড়সুড়ি দেওয়ার দিকেই ঝুঁকেছেন বেশী। ওতে পয়সা নেই তেমন। পাকা চুলের একটা হিসেব আছে। দাদু দেন বারোটায় এক পয়সা, দিদিমণি দেন ষোলটায়। আর সবাইও তাই; হিসাবের জিনিস, গুনিয়ে দিলে এসে যায় দাম। সুড়সুড়ি কি পায়ে হাত বুলোনোর মুশকিল হচ্ছে, কখন্ ঘুমিয়ে পড়েন, এতবার সুড়সুড়ি দিয়েছি, কি এতবার হাত বুলিয়েছি, সেটা চোখের সামনে ধরে দেবার কিছু থাকে না। বাড়িয়েই বলতে হয়। বাড়িয়ে বলছে মনে করে ওঁরা কমিয়েই হিসাব করেন। বিশেষ কিছু থাকেনা হাতে। এ দুটোর রেটও কম, দাদু, দিদিমণি, অন্য কেউ—সব কুড়িবারে এক পয়সা। আবার বেগার খাটাও আছে, কেন না, "অন্য কেউ"-এর মধ্যে দাদারা আসেনা। বলে—"পুণ্যি উপার্জন করছিস্. আবার পয়সা কি? বরং বেশি করে দে, দু' হাতে পুণ্যি লুটে যা।"

বাইরে থেকে কেউ এলে সে দেয় ভালো। পিসেমশাই, বা মামাদের কেউ, কি মেসোমশাই—এঁরা এলে সুবিধেই হয়, তবে কারুরই চুল পাকা নয়, সুড়সুড়ি কি হাত বুলোনো থেকে যা পাওয়া যায়। তা পাওয়া যায় ভালই। অনেকদিন পরে পরে আসেন, কে পড়ায় ফাঁকি দিলে, কে কি দুষ্টুমি করে ফেললে, সে সব দিকে নজর থাকেনাত, কাজেই দয়া-মায়া থাকে একটা। রেটও ভাল দেন, তা ভিন্ন একটু যদি বাড়িয়েই বলা যায় তো মিছিমিছি-মিথ্যাবাদী বলে কমিয়ে দেন না।

জ্যেঠামশাই এলেন একেবারে অনেক দিন পরে। এমনি-সেমনি অনেকদিন নয়। কাশ্মীরে থাকেন, সে অনেক দূর। এতদিন পরে এলেন যে টুনী, বাঁটুল দেখেইনি,

টাক দেখেছিল তার মনে নেই। সে তখন মাত্র দেড় বছরের। মনে আছে শুধু রত্নার, তার বয়স তখন তিন বছর। জ্যেঠামশাই মানেই তো কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু তখন পাকা চুল তোলা হ'তনা। রত্নার মনে আছে কোলে করে নিয়ে খুব বেড়াতেন, খেলনা, বাঁশী কিনে দিতেন। এতদিন পরে এখন তো আরও ভাল করে জ্যেঠামশাই হয়েছেন, পাকাচুল আরও বেড়েছেই নিশ্চয়। যে অমনিই আদর করে খেলনা বাঁশি কিনে দেয়, পাকা চুল তুলে দিলে, পায়ে হাত বুলোলে, পিঠে সুড়সুড়ি দিলে সে যে কত কি-ই না দেবে ওরা ভেবে পাচ্ছেনা।… সে খোঁজও নিয়েছে ভাল করে সবার কাছে; না, জ্যেঠামশাইয়ের টাক নেই মাথায়, একেবারেই নেই।

দুটো দিন যে কী করে কাটল ওদের, তা শুধু ওরাই জানে। যতই জ্যেঠামশাইয়ের গল্প শোনে সবার কাছে, ততই ছটফটানি যায় বেড়ে, কবে আসবেন কখন্ আসবেন। তারপর, মাঝখান থেকে আর এক দুশ্চিন্তা—যেদিন আসবেন, সেদিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—জ্যেঠামশাই প্রয়াগে নেমে একদিন কাটিয়ে আসবেন। সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করল—সর্বনাশ প্রয়াগ মানেই যে একেবারে মুড়োনো মাথা। দাদু এইতো সেবারে বড় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মুড়িয়ে এলেন, দু' জনেই। তারপর এইতো সেদিন সবাই গেল এক সঙ্গে,—জগুর ঠাকুমা আর পিসীমা, হারানের মা আর জ্যেঠাইমা, সনাতনের বড়দিদি, ফটিকের খুড়িমা, ফিরে এল যেন একঝুড়ি বেল। এক জনেরও মাথায় একগাছি চুল নেই। জ্যেঠামশাই আবার এমন সর্বনেশে জায়গায় নামতে গেলেন কেন? কি হবে; কি দেখতে হবে, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আরও একটা দিন কাটাল সবাই। তার পরদিন সকাল বেলায় জ্যেঠামশাই এসে উপস্থিত হলেন। বাঁচল সবাই! না প্রয়াগের ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছেন, এক মাথা চুল। একটু অসুবিধে। কিছু বোধহয় বাদ যাবে, কানের কাছে আর ঘাড়ের কাছেরগুলো বড্ড ছোট; তাহলেও বাকি যা থাকে, তাতে বেশ দু' পয়সা আসবে সবার হাতে। তবে একটা মুশকিল হয়েছে; জ্যেঠামশাই যেন বড় কি রকম। বেশ মোটাসোটা, মুখখানা টকটকে লাল, আর এত বড়। কাছে যেতে যেন সাহসই হচ্ছেনা। ভেবেছিল মামাদের বেলায় যেমন হয়, ডেকে নেন কাছে, তারও তো কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। আর, মুখে একটুও হাসি নেই। এসে বড় ঘরটায় বসে গল্প করছেন সবার সঙ্গে—দাদু, দিদিমণি, কাকা-দাদারা; এরা চারজন হাঁ করে রয়েছে কখন্ একটা হাসির কথা হবে, জ্যেঠামশাই হাসবেন একটু, তা বদিবা হ'ল দু'বার; সবাই হাসল, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম, জ্যেঠামশায়ের মুখ কিন্তু সেই একরকম। এ-জ্যেঠামশায়ের অত পাকা চুল তা'হলে

আর কি কাজে লাগবে, কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।

এমন সময় এক ব্যাপার হ'ল।

কাছে তো আসতে ভরসা হচ্ছে না। হীরু, টুনী, বাঁটুল, রম্ভা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল কি করে কি হবে,—হীরু আর টুনী দোরগোড়ায়। বাঁটুল আর রম্ভা জানলার ধারে, জ্যেঠামশাই গল্প করতে করতে একবার ওদের দিকে চেয়ে দাদাদের বললেন—"তা ওরা ও-রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন বাইরে বাইরে? বৌমা ডেকে নিয়ে খাবার দিক্ না হাতে।"

মেজকাকা বললেন—"থামো, খাবারের ভাবনাই যেন বড় ওদের কাছে, ওরা এখন হিসেব নিয়ে পড়েছে!"

জ্যেঠামশাই হাঁ করে চেয়ে বললেন—"কিসের হিসেব?"

ছোটকাকা বললেন—"তুমি যে মস্তবড় এক বেসাতি নিয়ে এসেছ মাথায় ক'রে। দেখছ না, কি করে চেয়ে আছে সব? ওদের নাকি এখন খাবারেব কথা ভাববার সময় আছে!"

জ্যেঠামশাই মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"বেসাতি কি এনেছি? পাঞ্জাবীদের মতন ক'রে পাগড়ী বাঁধতে হয়, তাও তো সেখানেই রেখে এসেছি।"

ছোটকাকা বললেন—"অনেক চুল পাকিয়ে এসেছ যে, পাগড়ী বেঁধে বড়দা; কি রকম লাভের ব্যবসা টের পাওনি তো এখনও। বারোটা তুলে দিলে এক পয়সা। নেহাত দাঁড়িয়ে নেই চুপ করে কেউ, মাথার কোনখানটায় কি রকম মাল রয়েছে..."

অত গম্ভীর তো জ্যেঠামশাই, হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠলেন যে সবাই যেন চমকে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না, ওদিককার বাজে গল্প থেমে গেল। ওদের সবাইকে ডাকলেন। ততক্ষণে লজ্জায় পড়ে ওরা তো লুকিয়ে পড়েছে, দাদারা গিয়ে ধরে নিয়ে এল এক এক করে।

কী চমৎকার যে জ্যেঠামশাই! প্রকাণ্ড কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে একসঙ্গে চারজনকেই আদর করতে লাগলেন। "...আমি কোনটিকে দেখে গিয়েছিলাম সেবার? ...এইটিই তো সেই রম্ভা না? কোলে কোলে থাকত।...হ্যাঁ গো মা, তা তুমিই তো বুড়ী হয়ে গেছ, আমাকেই পাকা চুল তুলে দিতে হবে যে তোমার।" আবার সেই রকম করে হেসে ওঠেন।..."আর কাকে দেখে গিয়েছিলাম?"...

ছোটকাকা বললেন—"ঐ যে, হীরু, যখন গেলে তুমি, তখন মাত্র দেড় বছরের-টি তো।"...হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঠেলে ধরে জ্যেঠামশাই চোখ বড় বড় করে বললেন

—"আরে, এই নাকি সেই হীরুবাবু ?—দেড় বছরের থেকে এমন করে চুপি চুপি সাত বছরের হয়ে গেলে কি করে চিনব ? আমি বেচারী তো এক বছরও বাড়তে পারিনি।" ...আবার হেসে উঠে ছোটকাকার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"পেরেছি বাড়তে ?" ...রত্না তো বড় হয়েছে, এত হাসি দেখে সাহসও গেছে বেড়ে, খুব চালাক হ'তে ইচ্ছে হয়। বলে দিল—"মোটা তো হয়েছেন আপনি।"...সবাই একেবারে হো হো করে হেসে উঠল। জ্যেঠামশাই তো মনে হল যত হাসি এতক্ষণ পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সবগুলোকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন। দিদিমণি কেউ কাউকে মোটা বললে রেগে যান, তার ওপর জ্যেঠামশাই তাঁর ছেলে, কিন্তু ধমক দিতে গিয়ে তিনিও একটু হেসে ফেললেন। টুনী-বাঁটুলের কথাও জিজ্ঞেস ক'রে ঐ রকম মজার কথা বলে বলে হাসলেন জ্যেঠামশাই, আরও সবাই হাসল, তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে সবার হাতে একটা একটা করে দিয়ে বললেন—"এই নাও, আমি বাপু দাদন দিয়ে রাখছি, খেয়ে দেয়ে যেই গিয়ে বিছানায় শোব, সবাই আসবে পাকা চুল তুলতে, হাত বুলিয়ে দিতে। যাও, তোমার কাছে খাবার রয়েছে, খাও গে।"

চমৎকার মানুষ জ্যেঠামশাই, এত আদর ওরা জন্মে আর কারুর কাছে পায়নি। আর সব রেটও বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক—পাকা চুল চারটে তুলতে পারলেই এক পয়সা। গায়ে সুড়সুড়ি আর পায়ে হাত বুলোনো আটবারেই এক পয়সা। একদিনেই যে টাকাটা জ্যেঠামশাই দিয়েছিলেন সেটা শোধ হয়ে গেল। কত রাত জেগে এসেছেন, তার ওপর খুব ভাল বলে ওরা সবাই খুব যত্ন ক'রে সেবা করল, পাকাচুল তুলে দিল, একটুর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু সত্যি এত ভালো যে ওরা যখন বলল যে এতবার করে হাত বুলিয়েছে সুড়সুড়ি দিয়েছে, এতগুলি করে পাকা চুল তুলে দিয়েছে, একবারও তিনি, দাদু, দিদিমণি কি কাকাদের মতন বললেন না যে তোরা মোটে এতবার দিয়ে এত বেশি করে বলছিস। ছোড়দার কাছে ওরা সবাই হিসেবটা করিয়ে নিলে —এত পাকা চুল, এতবার করে সুড়সুড়ি, এতবার হাত বুলুনো, এত করে রেট ; একটাকা শোধ। জ্যেঠামশাই উঠলে ওরা সবাই দেখাল স্লেটটা, দেখে একটু হাসলেন, তারপর বললেন—"বেশ, আবার কাল দুপুরে।"

বেশ রোজগার হ'ত, তবে ছোড়দা শত্রুতা করল। ছোড়দা বলে ও হিসেব করে দেবে, তার জন্যে জনা-পিছু ওকে আট আনা ক'রে দিতে হবে। ওরা চার আনা করে দিতে চায় ; নৈলে আর থাকে কি ওদের ? ছোড়দা জ্যেঠামশাইকে বলে দিলে—দাদু, দিদিমণি, কাকারা সবাই পাকা চুল গুনিয়ে নেন ; সুড়সুড়ি, হাত বুলোনো যতবার বলবে তার থেকে দশটায় পাঁচটা করে বাদ দেন—এই বাড়ির নিয়ম, জ্যেঠামশাইও যেন তাই

করেন, নৈলে ওরা বড্ড ফাঁকিবাজ, ছ'দিনে পকেট খালি করে ছেড়ে দেবে। জ্যেঠামশাই সবতাতেই আজকাল হাসেন ঐ রকম করে, বলেছেন—"আচ্ছা, সে দেখা যাবে। ওরা আর ছোড়দার কাছে হিসেব করাবেনা, সেজ বৌদি চার আনাতেই রাজি হয়েছে, তার কাছেই কষিয়ে নেবে।

সুড়সুড়ি আর হাত বুলোনোতেই বেশী পয়সা, সবার ইচ্ছে ঐ দিকেই থাকে; কিন্তু মুশকিল হয়েছে অত পা আর অত গা কোথায় জ্যেঠামশায়ের? তাই ঠিক হয়েছে দু'জন দু'জন করে থাকবে দুদিকে। এ-দু'জনের পাকা চুলের পালা শেষ হলে, গায়ের দিকে পায়ের দিকে চলে যাবে। ও-দু'জন আসবে চুলের দিকে।

চুলের দিকে আব একটা মুশকিল যে, মাথায় অত পাগড়ি বেঁধেও জ্যেঠামশাই খুব বেশি চুল পাকাতে পারেননি। তা ভিন্ন, দাদুর মত এক রকমের বড বড চুলও তো নয়—কানের কাছে, ঘাডের কাছে এত ছোট যে, ধরতেই পারা যায় না ভালো করে। অথচ উপায়ও তো নেই, অমন করে পালা বেঁধে দেওয়া হ'ল, তুলতেই হবে। চুলের দিকটা নিয়ে সবাইকে যেন একটু মনমরা করে দিয়েছে। ভাবছে সবাই।

আরও ভাবনার কথা হয়েছে, জ্যেঠামশাই রেট্ খুব ভাল দিচ্ছেন, হিসেবের ওপরও একবার একটু হেসে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তখনি যা হোক ফেলে দেন। রোজগার ভালই হচ্ছে, কিন্তু থাকছেন না তো বেশিদিন উনি। শিগ্‌গিরিই কলকাতায় চলে যাবেন তারপর ফিরে দুটো দিনও থাকেন কি না-থাকেন, তারপরেই আবার আজমীর। সামনেই জন্মাষ্টমীর মেলা, জ্যেঠামশাইকে পেয়ে কত মতলব আঁটছে সবাই। কি কি কিনবে, কি করবে, কিন্তু সময় কোথায় আর? খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। বাড়ির অনেকেরও নজর পডল। ছোটকাকা প্রশ্ন করল "হাঁ রে খাচ্ছিস-দাচ্ছিস তার ওপর রোজগারও করছিস্ ভালোই, তবু যত ভাবনা যেন তোদেরি ওপর এসে পড়েছে, ব্যাপারখানা কি?"

দু' দিন পরে হঠাৎ যেন ভাবটা বদলে গেছে মনে হল। ছোট কাকারই নজরে পড়ল আগে, সবদিকে তাঁর নজরটাই তো একটু বেশী থাকে। সন্ধান নিয়ে টের পেলেন যে, সবার আয় হঠাৎ বেড়ে গেছে। ছোট ভাইপোকে ডেকে বললেন, "ওরে, একটু খোঁজ নিয়ে দেখতো ব্যাপারখানা কি? এমনি তো বড়দাকে যেমন খুসি ঠকাচ্ছে, তার ওপর আবার হঠাৎ আয় বাড়িয়ে ফেলল কি করে?"

খাপ অডিটর, ছোট ভাই বলল—"সেজবৌদি ওদের হিসেব করে দেন, দাদা অডিট্ করে দেখবে?"

অডিট করে কিছুই পাত্তা পাওয়া গেল না। যেতও না পাওয়া, কারুর ট্রেড সিক্রেট বের ক'রে নেওয়াতো সোজা কথা নয়। তারপর কিন্তু একদিন আপনিই সমস্তটা বেরিয়ে পড়ল।

—সেই পুরোনো ইতিহাস, যা নিত্য ঘটছে বাঙালীর ব্যবসায়ে। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য। কার ভাগে একটু বেশি পড়েছে তাই নিয়ে ঈর্ষা, অন্তর্দাহ, তাই থেকেই এ-ওর কেচ্ছা ছড়াতে আরম্ভ করলে, সব কথা পড়ল বেরিয়ে, কোম্পানীও গেল রসাতলে।

আয়টা সর্বপ্রথম বাড়িয়ে ফেলল রত্নাই ; সব চেয়ে বড়, আগে তার মাথাই তো খুলবে। একটি দিনের হিসেবে দু'গুণ আয় ক'রে নিল একেবারে, তাও হাত বুলোনো বা সুড়সুড়িতে নয়, পাকা চুল গুনিয়ে দিয়ে।

রহস্যটা আগে ধরতে পারল হীরু, দিদির পরে তো ওই। তক্কে তক্কে থেকে রহস্যটা বের করল , কিন্তু একেবারে নকল না করে সেই পথেই একটা মৌলিক উপায়ে সেও দু'দিন পরে আয়টা প্রায় আড়াই গুণ করে নিল। টুনীর আরও একটা দিন লাগল, তবে সে যে উপায় বের করল তাতে প্রায় তিনগুণ টেনে নিয়ে গেল। চার পাঁচ গুণও স্বচ্ছন্দে করে ফেলতে পারত, অত সুবিধা সত্ত্বেও যে করল না, তার জন্য তার আত্মসংযমের প্রশংসাই করতে হয়।

কথাটা বেরুল প্রথমে রত্নার মুখ দিয়েই। দু'জনে ছোট, অথচ দু'জনেই হঠাৎ বাড়িয়ে নিলে আয় তার চেয়ে, লেগেছে মনে। তার ওপর বোধহয় লেনদেনের কথাও কিছু তুলেছিল, ওরা রাজী হয়নি।

চারজনে সেবা করছে, জ্যেঠামশাই পাশ ফিরে শুয়ে একটা বই পড়ছেন। একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছেন পড়তে পড়তে। অন্যদিকে ওরা গল্প করে, মাঝে মাঝে তাঁকেও টানে, আজ কিন্তু যেন অন্যরকম ভাব। কি যেন ইশারা বিনিময় হচ্ছে তিনজনের মধ্যে , মাথা নাড়ানাড়ি, শাসানো, আঙুল উঁচানো। একবার ফিস্‌ফিসিনিও কানে গেল—"বলে দিই ?"

রত্নাই জিজ্ঞেস করছে। হীরু সেই রকম ফিস্‌ফিসিনিতেই বেপরোয়াভাবে উত্তর করল—"দাও গে।...ইস্ !"

বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। একটু চুপচাপ গেল। তারপর আবার—"তোমার কথাও !"

রত্নাই শাসাচ্ছে, এবার টুনীকে। বইয়ের আড়াল থেকে দেখা গেল টুনী ঠোঁট দুটো জড়ো করে মাথাটা দুলিয়ে দিল, বেপরোয়া ভাবেই। আবার একটু চুপচাপ গেল।

রত্না পায়ে হাত বুলোচ্ছিল, হাতটা আরও মোলায়েম ক'রে দিল, বেশ লম্বা লম্বা গোটাকতক টান, তারপর আরম্ভ করল—"জ্যেঠামশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন ?"

"না না, কিছু বলবে ?"

বইয়ের আড়াল থেকে সন্তর্পণে দেখা গেল হীরুর ওপর আবার তির্যক দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। হীরুও আবার বেপরোয়াভাবেই ফিরিয়ে দিল দৃষ্টিটা।

"বলছিলাম জ্যেঠামশাই—এই, আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকাচ্ছে হীরু।" (টুনীর দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ, সেও ফিরিয়ে দিতে)—"আর টুনীও। ওদের দেবেন না অত করে পয়সা।"

হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠছে জ্যেঠামশায়ের পেটে। বললেন—"ঠকাবার পদ্ধতিটা কি, না হয় শুনি একবার, তবে তো বুঝব।"

আর একবার সেইরকম দৃষ্টি বিনিময় হ'ল।

"আপনি ভেবেছেন নাকি সবগুলো আপনার চুল ? বয়ে গেছে। এই দেখুন এই কাঁচি। নিয়ে এসেছি আমি।"

"বুঝলাম নাতো ; কাঁচি তো কি ?"

"ওগুলো সব আপনার চুল নাকি ? দিদিমণির চুল বিকেলবেলায় বসে বসে তোলে। তারপর কাঁচি দিয়ে আপনার মতন ক'রে কেটে গুণে দেয়। একটাতে পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, যেমন হয়। সেখানেও পয়সা নেয় এখানেও আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে…"

হাসি চাপা কষ্টকর হয়ে পড়েছে জ্যেঠামশায়ের। কোনরকমে প্রশ্ন করলেন—"তাই নাকি ?"

ওদিকেও যে নালিশ জমছে সেই প্রত্যাশায় কোন রকমে চেপে রেখেছেন হাসিটা।

রন্তাই বলছে—একবার যেন তির্যক দৃষ্টিতে টুনীকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়ে—

"আর টুনীই কম নাকি—ঐটুকু দেখতে হলে কি হয় ?"

"ব্যাপারখানা কি ?"

"আপনি কি ভেড়া জ্যেঠামশাই ? আমাদের কত গুরুজন তো ? দাদু, দিদিমণি ছাড়া, সবারই গুরুজন। টুনী কম্বল থেকে বেছে বেছে শাদা শাদা ভেড়ার লোমগুলো…"

আর বুঝি পারা যায় না ; বুকটা চেপে ধরতে হয়েছে।

টুনীর একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ গিয়ে পড়ল রন্তার ওপর। মাথাটাও একটু ঘুরে গেল। তারপর—

"হ্যাঁ, জ্যেঠামশাই, তা' বলে আপনি কি গোলু বলুন না?"

—ভালো করে জিভের আড়ও ভাঙেনি।

শরীরটা দুলে উঠছে, তবু কোনরকমে বইয়ে মুখটা ঢেকে প্রশ্নটুকু করতে পারলেন জ্যেঠামশাই—"কেন গো মা?"

"ও গুলো আপনাল ঘাডেল চুল মনে করেছেন নাকি? ধবলীর পিত থেকে আঁচলে আঁচলে নিয়ে আছে দিদি…"

—দুই বোনে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি-বিনিময়ও হয়ে যায়। টুনী নাক মুখ একটু সিঁটকে নিয়ে বলে—"ইছ! ছবাই যেন জ্যেতামশাইয়ের মতন বোকা!"

মোহমুক্তি

আর বছরের সরস্বতী পুজোর কথা মনে পড়ে খোকার। হাতে-খড়ি হবে, বই শ্লেট নিয়ে ছোটদা, ন'দি, এদের মতো সকাল বেলায় মাষ্টারমশায়ের কাছে দুলে দুলে পড়বে, তারপব বইয়েব গাদা বাডবে, সঙ্গে সঙ্গে মেজদার মত স্কুল, তারপর বডদার মতো কলেজ, সাইকেলের পেছনে বইখাতা চামড়ার বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিয়ে বনবন করে বেরিয়ে যাওয়া। গেটের কাছ পর্যন্ত গিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকত খোকা। মা সরস্বতী, নমো, নমো, নমো, আমায় শিগ্গির পাঁচ বছর করে দাও মা।

আর বছর পুজোর সময় মা সরস্বতী ওকে পাঁচ বছর করে দিলেন।—কী যে চমৎকার! সকাল বেলা উঠে, নেয়ে হলদে রংয়ের কাপড় পরে কপালে সাদা চন্দনের কোঁটা পরলে খোকা। দিদি যে বলেছিল হলদে রংটা বাসন্তী রং তাও মনে আছে। তারপর পূজা যেই শেষ হয়ে গেল, পুরুতমশায়ের কোলে বসে হাতে খড়ি। এই পুরুতমশাই আবার ছোডদাদের স্কুলের মাষ্টারমশাই! কত যে মজা খোকা ভেবে কুলিয়েই উঠতে পারে না।

'অ' থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত লিখে ফেলে ঠাকুরকে প্রণাম করল খোকা। তার-পর পুরুতঠাকুরকে প্রণাম করে একটা টাকা দিল। খোকার যে একটুও কষ্ট হয়নি টাকাটা দিতে তাও বেশ মনে আছে। কষ্ট কখনও হতে আছে? ছিঃ!

খোকার নাম রাখাও হল ঐ-দিনেই—আশুতোষ। বাইরের ঘরে যে বড় ছবিটা টাঙানো আছে—মোটাসোটা, বড় বড় গোঁফ—দাদা দিদিরা স্কুলে কলেজে যাবার

লয়য় যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে যায়, তাঁরই নাম। নামটা হয়ে গেলে মা খোকাকে তাঁর সামনে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করালেন, খোকার হাতে একটা মালা দিয়ে বললেন— পরিয়ে দাও, ঐ রকম বিদ্বান হতে হবে তোমায়।···খোকা সমস্ত দিন খালি খালি ঘুরে ঘুরে এসেছে আর দেখেছে। ঐ রকম বিদ্বান হবে সে, কত বাড়ির দাদা-দিদিরা মিলে ওকে প্রণাম করবে!

কী চমৎকার যে দিনটি গেছে!

কিন্তু তারপরেই কী যে কষ্ট বেচারী খোকাই জানে। সকাল থেকেই বাড়ি-সুদ্ধু সবার তাগাদা—"ওঠ, পড়তে বোস্, এখনও মুখ ধুস্‌নি! পড়তে বস্‌বি কখন?" মনে করে রাখতে কথাটা—"ছেড়ে দিলুম আজ, কিন্তু যে দিন ধরব······"

প্রত্যেকটি দিন কেটেছে এইভাবে—কতদিন যে।

কারুর মুখেই ভাল কথা নেই, কাকেই বা বলে খোকা, যে হাতেখড়ির পরদিন থেকেই ওর ঘুমটাই লাগে বেশি মিষ্টি? আর লেখাপড়ার কথা—অত যে ভাল-বাসতো খোকা দাদা দিদিদের দেখে, অত যে হিংসে হোত, তা কী যে করে দিয়ে গেছেন মা সরস্বতী হাতেখড়ির দিন—বই স্লেট দেখলেই খোকার যেন জ্বর আসে আজকাল, জ্বরের চেয়েও খারাপ মনে হয় ঠিক যেন কুইনিন। কুইনিনের চেয়েও খারাপ—মনে হয় ঠিক যেন···এত খারাপ যে কিসের মতো তা আর মনেই করে উঠতে পারে না খোকা···অত চমৎকার পুরুতমশাই যেমন অমন ভয়ঙ্কর মাষ্টারমশাই হয়ে গেছেন, অমন চমৎকার মা-সরস্বতীও তেমনি কী যে হয়ে গেছেন, মনে করলেই এখন ভয় করে খোকার।

খুব খাটুনি পড়লে, খুব কষ্ট হলে মা যে বলেন—মানুষে আর কত পারে? খোকাও সেই কথা বলেছে, অবশ্য নিজের মনেই চুপি-চুপি,—জোরে কাকেই বা বলে, কে-ই বা শোনে? আরও অনেক রকম চেষ্টা করেছে, বই স্লেট লুকিয়ে রেখেছে, বাড়ি সুদ্ধু সবাই শত্রু, ঠিক খুঁজে বের করেছে। বই ছিঁড়ে ফেলে কি স্লেট ভেঙে ফেলেও দেখেছে—তাতে আবার একদিনও দেরি হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে এসে যায়, লাভের মধ্যে কিল-চড়, খিঁচুনি-বকুনি। এই করে করে একটা বছর কেটে গেল খোকার। অত চেষ্টা করেও প্রথম ভাগটা একদিন হয়েই গেল শেষ। যে দিন শেষ হলো, নূতন দ্বিতীয় ভাগ কিনে আনা হোল, সেদিন মন্দ লাগেনি খোকার। তারপরেই দেখলে দ্বিতীয় ভাগ প্রথমভাগের বাবা!

দ্বিতীয় ভাগটা যেদিন প্রথম ছেঁড়া যায়, বেশ মনে আছে খোকার। মাষ্টার-মশাই কখন এসে গেছেন পড়াতে। প্রথমটা খোকা অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে পেলে না;

তারপর সব্বার বকুনিতে যখন আর না-পাওয়া গেল না, তখন শ্লেটের উপর বইটা রেখে প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো হয়ে চলল বাইরের দিকে।...বাড়িতে তো এক একদিন ডাল বাড়ন্ত হয়, তেল বাড়ন্ত হয়, দ্বিতীয়ভাগ বাড়ন্ত হলেই যত দোষ!...ডিকি কুকুরটা চেনে বাঁধা রয়েছে, ভিমির বাচ্চা, খোকাকে যে কি ভালবাসে! খোকাও যে কি ভালবাসে! অর্ধেক খেলা তো ডিকিকে নিয়েই খোকার। কিন্তু কে-ই বা দিচ্ছে খেলতে? ডিকি রইল বাঁধা, খোকা চলল পড়তে!... ছটপট করছে ডিকি খোকাকে দেখে—খেলবে।...খোকা মনে মনেই বললে— "হাতেখড়ির আগে যদি জন্মাতিস তো দেখতিস, জিজ্ঞেস করিস বরং তোর মাকে, কত খেলাই খেলতে জানি আমি।"

ডিকি আছে জানলার গরাদের সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা রকের ওপর; ছটপট করছে, দুপায়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো তুলে চেনের টানে দুলছে। সবার ওপর রাগে খোকার মনে হল দিই একবার খুলে। যাক ঢুকে রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে সব কুটি কুটি করুক, ঐ ভয়েই তো বেঁধে রাখা।...তারপরেই কি হোল, খোকার মনে হল দ্বিতীয়ভাগটা ডান হাতে করে নিই।...সরু রক, ধার দিয়ে গেলেই তো খোকা উঠোনে পড়ে যেত; ছেলেমানুষ, যদি হাতটাই ভেঙ্গে যেত তো কে ভুগত তখন?—তাই যেমনি একটু ওদিক ঘেঁষে যাবে, ডিকি হাত থেকে দ্বিতীয়ভাগটা ছোঁ-মেরে নিয়েই দাঁত দিয়ে একেবারে টুকরো টুকরো করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে খোকা চেঁচিয়ে উঠল, ইচ্ছে ছিল কেঁদেই ওঠে, কিন্তু অত শিগ্‌গির পারলেনা। কেড়ে নেবারও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই ডিকি দফা একেবারে নিকেষ করে দিয়েছে বইটার।

সবাই ছুটে এল, মনে করেছে খোকাকেই বুঝি ডিকিটা দিয়েছে কামড়ে। তারপর বাইরে থেকে এল মেজদা, ঠোঁট দুটো চেপে মাথা নাড়লে খানিকটা, তারপর—

"তোমার হাতে বই, কুকুর ওদিকে বাঁধা, মাঠের মতন রক—কুকুর পেলে কি করে বই যে ছিড়লে?"

"হাত থেকে কেড়ে নিলে মুখ দিয়ে।"—ভয়ে ভয়ে বললে খোকা।

"কেড়ে নিলে! কৈ আমার হাত থেকে তো কেড়ে নেয় না?"

এগিয়ে এসে কানটা ধরে বললে—"তুমি ওর মুখে তুলে দিয়েছ"—বেশ করে নেড়ে দিলে মাথাটা। "আবার মিথ্যে কথাও বলতে শিখেছ!" অন্য কানটাও ধরে দুহাতে আরও ভাল করে নাড়া দিলে—তারপর তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, বললে "[illegible] খেলার সরঞ্জাম বের করো। খেলাই তোমার কাল

হয়েছে, কিছু একটা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, তোমার লেখাপড়া কিছু হবে না। আর লেখাপড়া যতো হবে না ততই তোমার শয়তানি বাড়বে। ডিকি কেড়ে নিলে, না? প্রত্যেকবারেই একটা নতুন মতলব, বের করো কোথায় কি আছে, আমার কাছেও আছে শয়তানির ওষুধ।"

ছোড়দা, ন'দিদি, সবাই ঐ দিকেই; গুলি, ঘুড়ি, লাট্টু, বল যেখানে যা ছিল সব এনে এনে জড়ো করলে মেজদার সামনে। মেজদা ঘুড়িটা ছিঁড়ে ফেলে, গুলি, লাট্টু, বল সব দিলে বিলিয়ে, তারপর খোকাকে টানতে টানতে মাষ্টারমশায়ের কাছে নিয়ে বললে—"আপনার ছাত্রের গুণ শুনুন পণ্ডিতমশাই—এখন থেকেই, দ্বিতীয় ভাগটা ডিকির পেটে তুলে দিয়েছেন, নিন, এখন কী করবেন করুন।"

দুটো দ্বিতীয়ভাগ এল এক সঙ্গে, একটা রইল খোকার কাছে একটা তার মেজদার কাছে। মেজদা বললে, "এবার যদি হারায় কি ছেঁড়ে তো এবার এক ডজন দ্বিতীয়ভাগ এনে সবার কাছে একটা একটা করে দিয়ে রাখবে, আর যার সঙ্গেই কথা কইতে যাবে সে কোনও কথা না কয়ে তাকে টেনে নিয়ে শুধু দ্বিতীয়ভাগ পড়াবে। সকাল সন্ধ্যে দুপুর বিকেল যখনই কইতে যাবে কথা।"

দ্বিতীয়ভাগটা হারানো বন্ধ করতে হোল। খোকার এখন সদাই আতঙ্ক কোন রকমে নিজেই হারিয়ে না যায় বইটা, রাত্রে পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে তারটা হারিয়ে গিয়ে সবার হাতে হাতে ঘুরছে; মার কাছে খাবার চাইতে গেছে তাঁর হাতে দ্বিতীয় ভাগ; পালিয়ে এল, কিনেই খাবে খাবার। খাঁদু ময়রার দোকানে গিয়ে দেখে তার সন্দেশ রসগোল্লা জিলিপি গজা সব এক এক থালা দ্বিতীয়ভাগ হয়ে রয়েছে; খাঁদুর হাতেও একখানা, একগাল হেসে বলছে—"এই যে খোকাবাবু, খাবার চাই বুঝি? বেশ, এই যে দিই; আগে দ্বিতীয়ভাগের এই রুক্মিণীর পাতাটা একবার পড়ে নেবে এসো তো।" আরও সব কত রকম স্বপ্ন—ভাত চাইতে গেলে ঠাকুর আসে দ্বিতীয়ভাগ নিয়ে। খুব তেষ্টা পেয়েছে, জল গড়াতে যাবে, কুঁজোটার হাত পা হয়ে দ্বিতীয়ভাগ কাঁকে চেপে নাচতে নাচতে আসে এগিয়ে। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙবার পর থেকেই যেন জেগে থাকতে ভয় করে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুতে যেতে যেন তার চেয়েও বেশি ভয় হয়।

পাছে হারায় সেই ভয়ে দ্বিতীয় ভাগ কোলে করেই শুচ্ছে আজকাল খোকা।

কিন্তু আর ঘুম পায়না।

খোকার জিনিসগুলোর জন্যে মন কেমন করে। কতদিন যে খেলতে পায়নি! কাল মেজদা ডেকে বলছিল—"আজ একমাস হল খোকার বই হারায়নি না; কেমন ওষুধ দিয়েছি দেখো।"

একমাস এই এতদিন নাকি।

আর যখন হারাচ্ছে না হারাবেও না, তখন খোকার বলগুলি সব ফিরিয়ে দিক্না। কিন্তু দাদাকে বলতে ভয় করে খোকার, ওর কাছে যদি আরও কোন রকম ওষুদ থাকে! রাত্রের স্বপ্নগুলো দিনে সত্যি হয়ে ওঠে, ভাবতে ভয় করে খোকার, ভূতের চেয়েও বেশি ভয় করে।

আচ্ছা, এক কাজ করলে কি রকম হয়?

কথাটা আজ সকাল থেকে মনে হয়েছে খোকার। মাষ্টারমশাই আজ বাবাকে বলছিলেন। মাষ্টারমশাই আবার পুরুতমশাইও তো, বলছিলেন—"মায়ের শ্রাদ্ধে নবীন যা কপিলে গাই দান করেছে, এখন ফিরিয়ে নেয় তো বাঁচি।"

বাবা বললেন—"কেন পুরুতমশাই? অমন কালো গোরু, ভালই তো!"

মাষ্টারমশাই বললেন—"যতদিন ছিল ভালো ততদিন কি আর দান করেছে? সে পাত্তোরই নয় নবীন। তুমি আগে দেখেছিলে, এদানিং দেখোনি তো।···ভীষণ পেট-রোগা, কবে আছে কবে নেই। শেষকালে দড়ি হাতে ক'রে ভিক্ষে করতে বেরুতে হবে। এখন ঐ সিং দুটোই সার, তার ওপর ভুগে ভুগে মেজাজ হয়েছে তিরিক্ষি।···নাঃ, দিয়েই আসব ভাবছি।"

বাবা বললেন—"কিন্তু দান করা গোরু ফিরিয়ে নেবে কি? তাও আবার পুরুতের হাত থেকে।"

মাষ্টারমশাই বললেন—"বেশ তো, না হয় বিক্রিই করলুম, কিনে নিক্; একটা দাম ধরে দিক্ পাঁচটাকা দশটাকা, যাই দেয়। তুমিই একবার বলে দেখবে? পরের মুখ দিয়ে হলেই ভালো হয়, মিষ্টি কথা তো নয়।"

শুনে অবধি কথাটা খোকার মাথায় যেন ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছে না, কিন্তু ওর মনে হচ্ছে কোথায় যেন মাষ্টারমশায়ের নবীনের সঙ্গে মা-সরস্বতীর মিল আছে।···ঠিক ধরতে পারছে না খোকা···কিন্তু ঐ কথাটা যেন সর্বদাই মনে হচ্ছে। হাতেখড়ির পরদিন থেকে যা দিয়েছেন তা যেন একজোড়া সিং, প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ শ্লেট ধারাপাত কারুরই তো নেই সিং, তবুও যেন ক্রমাগত ঐ কথাটাই মনে খচ্‌খচ্ করছে, সেদিন গলায় মাছের কাঁটা লেগে যেমন খচ্‌খচ্ করছিল—একজোড়া সিং—একজোড়া সিং—একজোড়া সিং—

ভাবতে ভাবতে খোকার হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল—বেশ তো; যা দিয়েছেন, মাষ্টারমশাইয়ের নবীনের মতো মা-সরস্বতীকে ফিরিয়ে দিলে কেমন

ধড়াস ধড়াস করতে লাগল বুকটা, আহ্লাদে কি ভয়ে ঠিক বুঝতে পারছে না খোকা, তবে যতই ভাবছে ততই যেন মনে হচ্ছে একটা রাস্তা খুলে গেছে খোকার সামনে—বাঃ, মা-সরস্বতী যা নিজেই দিয়েছিলেন হাতেখড়ির দিন, তা নিজেই যদি ফিরিয়ে নেন তাতে মেজদাদারই বা কি, আর মাষ্টারমশাইয়েরই বা কি? খোকা কি পায়ে ধরে বলতে গিয়েছিল নাকি কাউকে সাক্ষী রেখে?

(দুই)

এক 'হাতেখড়ি' থেকে আর-এক 'হাতেখড়ির' দিন এসে গেল। সেই যে মনে হয়েছিল সেই থেকেই মা-সরস্বতীকে মনে মনে বলছে খোকা। আজ আবার নেয়ে বাসন্তী রংয়ের কাপড় পরে, কুল পর্যন্ত না খেয়ে, বলছে খোকা…পাছে কারুর একটুও সন্দেহ হয় সেইজন্যে বাড়ি থেকে সরে গিয়ে পুকুর ধারটিতে বসে খুব মনে মনে বলছে—"মাষ্টারমশায়ের নবীনের কালো গোরুর মতন তুমি সেদিন যা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নাও মা-সরস্বতী, নমো-নমো-নমো—চমৎকার গোরুটা কিন্তু মেজাজ যা তিরিক্ষি দুধ দেবে কি, সিং দিয়ে গুঁতিয়ে তারপর নিজেও যাবে মরে—দড়ি হাতে করে ভিক্ষে করা হবে সার"…

ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছেনা খোকা, কিন্তু মা-সরস্বতী তো হাতে খড়ির দিন বড্ড ভালো থাকেন, বুঝতে পারবেন না? নমো—নমো—নমো মা-সরস্বতী—নাও মা ফিরিয়ে—যা বলতে চাইছি ভালো করে বুঝে নিয়ে…

ছোটদা, ন'দি হন হন করে এসে বললে 'বা, খোকাবাবু চমৎকার। বই সব ঠাকুরের চৌকিতে দিতে হবে না? লাটসাহেবের মতন দিব্যি পুকুর ধারটিতে বসে আছেন, আমরা ওদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।"

খোকা যেন কি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে না। সেই বুক ধড়ফড় করাটা গেছে থেমে, আহ্লাদে কি ভয়ে ঠিক বুঝতে পারছেনা খোকা—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে ও যখন নমো নমো মা-সরস্বতীকে বলছিল ঠিক ধ্রুব-প্রহ্লাদ যেমন করে কেষ্ঠাকুরকে বলত—সেই সময় ওর যেন মনে হল তিনি এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, সত্যি শুনবেন নাকি তার কথা? —ফিরিয়ে নেবেন সব?—দ্বিতীয়ভাগ, ধারাপাত, শ্লেট, পেন্সিল সব?

ন'দি বললে—"দেখো, হাঁ করে চেয়ে আছে! ওঠো, কাল রাত্তিরে কুমোরের ঘর ঝড়ে পড়ে গিয়ে সব ঠাকুর নষ্ট হয়ে গেছে, বিনোদ কুমোর এসে বলে গেল, সবাই বই দিয়ে পুজো করবে এবার—ওঠো—দেখো, তবুও হাঁ করে বসে!"

(তিন)

সব মিছে কথা, সবাই দুষ্টু,—মা-সরস্বতী পর্যন্ত …কি চমৎকার যে কালকের দিনটা গেছে! হাতেখড়ির পর থেকে অমন একটাও দিন পায়নি খোকা, পড়াতো নেই-ই, বই পর্যন্ত ছুঁতে নেই! কপালে ফাগের টিপ প'রে প্রসাদ খেয়ে ঘুরে বেড়াও—অর্ধেকটা দিন তো কাল ফুলগাছটার তলাতেই কেটেছে। মার? কেউ যে কানে হাত দেবেন তাও নেই! মার তো দূরের কথা।

তারপর? তারপর বিসর্জন। দাদা দিদিরা সব বই দেয়নি, কিন্তু খোকা বুদ্ধি করে সব ফিরিয়ে দিয়েছিল—দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, শ্লেট, পেন্‌সিল্‌, মায় সেই ছবির বইটা পর্যন্ত মামার বাড়িতে ছোটমামা যেটা দিয়েছিল, মেজদাদার কাছের সেই দ্বিতীয় ভাগটাও চেয়ে নিয়েছিল খোকা—না বলার তো জো নেই। ঠাকুর! রাত পোহালেই সব বিসর্জন। এবার তো মাটির মূর্তি নেই।…কাল রাত্রে স্বপ্ন পর্যন্ত যে কী চমৎকার দেখেছে খোকা!—ঝড় উঠেছে, পরশুকার রাতের মতো, দিনের শুকনো পাতার মতো উড়ে-উড়ে-উড়ে কোথায় যে যাচ্ছে চলে—ছিঁড়ে খুঁড়ে একশা হয়ে—ডিকিও সেদিন সে রকম করে ছিঁড়তে পারেনি—এটাও যে মা-সরস্বতীর দয়া—আবার যে সব ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সকাল বেলায় যখন উঠল—এত হাল্কা বোধ হচ্ছে, যেন ইচ্ছে করলেই উড়তে পারে এক্ষুনি।

মেজদাদা এসে বললে—"এই ওঠা হল বাবুর! আরম্ভ হোল পুজোর পরদিন থেকেই? নাও মুখ হাত ধুয়ে নাও—মাষ্টারমশাই আসবেন তো?……

"আর বিসর্জন?"—কথাটা বলতে গিয়েও আটকে গেল খোকার। মেজদাদা বেরিয়েও গেল।

ন'দিদি এল।

"খোকাবাবু ওঠো, বইটই সব গুছিয়ে নিতে হবে না?"

"আর বিসর্জন?"—বুকটা সেইরকম ধড়াস ধড়াস করছে। এবার ভয়ের—কি উত্তর যে দেয় ন'দিদি!

"বিসর্জন?—সে তো ফুলটুলগুলো দেওয়া হবে—বিকেল বেলা…বইগুলো দিলেও তোমার হাড় জুড়োত, না?…ও মা, এই শোন তোমার ছোটছেলের কথা!"…

(চার)

কি করে যে আবার কেটেছে খোকার, সেই জানে। ঠাকুরেরা তবে এইরকম?

খোকার তো মনে হয়েছিল কেষ্টঠাকুর যেমন ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা শুনেছিলেন, মা সরস্বতীও ঠিক তেমনি করেই শুনেছিলেন তার কথা। সব ঠাট্টা!

যখন খুব রাগ হয়েছে, খোকার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। দেওয়া জিনিস যে কেউ ফিরিয়ে নেয় না। তায় আবার ঠাকুর।

একেবারেই যে পাপ করেন না ওঁরা! ইস্, কি ভুলটাই হয়ে গেছে! একটু যদি বলত খোকা—যেমন মনে মনে বলেছিল—তোমায় কাছে সব বিক্রি করে দিচ্ছি মা, ফিরিয়ে নেওয়া নয়, তুমি দাম দিয়ে কিনে নাও, দোষ হবেনা তাহলে। তোমার যখন খুশি দামটা দিও—না তো ঐ প্রণামীর টাকাটাও তো রয়েছে…ইস্, কি ভুলটাই হয়ে গেছে! আবার তো সেই আসছে বছর? ততদিন কি করে যে কাটাবে?

মা পান সাজছেন। খোকা কাছে বসে ঠাকুরদের কথা জিজ্ঞেস করছে—"মা, সরস্বতী পুজো তো হয়ে গেল, এবার কে আসবেন মা—'আসবেন'ই বলতে হয়, না মা?—ওঁরা দয়া করেই তো আসেন।"

"এখন আর শিগ্‌গির কেউ আসবেন না বাবা—একেবারে সেই শিবরাত্রি! তার আগে কিন্তু আমাদের মা-লক্ষ্মীর পুজোটা সেরে নিতে হবে বৃহস্পতিবার দেখে। পোষের পুজোটায় একটা বিঘ্ন হয়ে গেল কিনা—অবশ্যি ভাল বিঘ্ন, তোমার ভাইঝি হল যে—তুমি কাকা হয়ে গেলে!

খোকা একটু চুপ করে থেকে ভাবলে; তারপর প্রশ্ন করলে—"শিবঠাকুর বড না মা-লক্ষ্মী বড়ো মা?"

"ঠাকুর সবই সমান বাবা, বড় ছোট ভাবতে আছে কি?"

"শিবঠাকুর তো মা-লক্ষ্মীর বাবা, না মা?"

"হ্যাঁ, তিনি নিজে তো কিছু দেখেন না সব সময়। মা-সরস্বতীর হাতে বিদ্যে দেবার ভার দিয়ে রেখেছেন—মা-লক্ষ্মীর হাতে অর্থের ভার।"

"অর্থ কি মা?"

"এই টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি।"

"অনেক টাকাকড়ি মা-লক্ষ্মীর?"

"সবই তো তাঁর, শিবঠাকুর তো ভিক্ষেই করেন।"

"মা-লক্ষ্মীর হাতে সব?"

"হ্যাঁ, দেখো না?—তাই তো ওঁর ঝাঁপিতে টাকা রাখতে হয়।"

"ও বাবা, তাই?"

খুব ভাবতে লাগল খোকা।

কারণ আছে। আজ সকালে আবার পড়তে পড়তে খোকা মাষ্টারমশাই আর বাবার কথা শুনছিল।···নবীন নিতে চায়নি, মাষ্টারমশাই সেই ধানের গোলাটি রূপ-চাঁদ যোড়লের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। চার টাকায়। মাষ্টারমশাই বললেন—"বেশি লোভ আর করলাম না, ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলাম বোঝাটা।" শুনে অবধিই ভাবছে খোকা।

(পাঁচ)

দুদিন পরের কথা। লক্ষ্মী পুজোটা হয়ে গেছে।

খোকা পুকুরের ধারটায় গিয়ে সঙ্গীমহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে—এক রাশি গুলি, এক রাশি লাট্টু, খান ছয়েক ঘুড়ি—যারা যারা কথাটা ফাঁস করে দেবে না বলেছে, তাদের অকাতরে বিলুচ্ছে—কেউ-ই ফাঁস করে দেবেনা সুতরাং কেউ-ই বাদ যাচ্ছেনা।

খোকার একেবারে দরাজ হাত।

এই খানেই শেষ নয়।

বাড়িতে ওদিকে মাষ্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে খোকার মায়ের কাছে এসেছেন। তাঁর ছোট মেয়েটির হাতে একটি টাকা দেখে প্রশ্ন করে করে টের পেয়েছেন সেটি খোকার কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর বালিসের নীচে চুপি চুপি রেখে দেওয়ার জন্য। কেন ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

ন'দি, ছোড়দা, খোঁজাখুঁজি করে ডেকে নিয়ে এল খোকাকে। গুলি, লাট্টু, ঘুড়ির দানছত্রের কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

মা চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন—"তুই টাকা কোথায় পেলি—কটা টাকা? পুরুতমশাইয়ের মেয়ে ·মিনুকে দিয়েছিস—খেলনা বিলোচ্ছিস—কি কাণ্ড! টাকা এল কোথা থেকে তোর?"

খোকা নিরুত্তর।

কিন্তু সন্ধান পেতে দেরী হলনা। উলটে-পালটে ভালো করে দেখেই মা শিউরে উঠে বলে উঠলেন—"ওমা! এ যে লক্ষ্মীর ঝাঁপির টাকা! রানীর আমোলের পুরোনো টাকা—এখনও একটু একটু সিঁদুর লেগে আছে।···ও হতভাগা, কি সর্বনাশ করেছিস?"

ছুটলেন পুজোর ঘরের দিকে।

ঝাঁপির পেছনে—শ্লেট, দ্বিতীয়ভাগ, ধারাপাত, লুকিয়ে রাখবারই চেষ্টা, তবে বের করতে বেগ পেতে হয়নি।

দেরি হয়েছিল কাপড়টা ছেড়ে ভালো করে দেখতে। ছ'টি টাকা কম ঝাঁপিতে।

"ও পুরুতমশাই! একি সর্বনেশে ব্যাপার! কি হবে? একি বিদ্যে হচ্ছে ছেলের আমার?...এই ছেলের নাম সাধ করে রেখেছি আশুতোষ।"

খুব অন্যমনস্ক হয়েই পুরুতমশাই কি একটা কথা ভাবছিলেন। কথাটি বলবার আগে তাঁর দৃষ্টিটা নিজের উত্তরীয়ের একটা ছেঁড়া জায়গায় আটকে গেল একটু, তারপর চোখ তুলে একটু দেখেই বললেন—"বুঝেছি। ও ঠিকই করেছে মা, বেটার তোমার পাকা মাথা। মা-লক্ষ্মীর কাছে তাঁর বোনকে বিক্রি করেছে।...নামটা বদলে না হয় "জগৎ শেঠ" করে দেবে।...ওটা খেতাব হিসাবেও রাখা যায়।...টাকাটা ফিরিয়ে রাখো ঝাঁপিতে, কিন্তু একটি টাকা আমার চাই মা ওর জায়গায়, আমার শিষ্যের প্রথম উপার্জনের পয়মন্ত টাকা..."

নব্

কি একটা খেলনা নিয়েই ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছে, কি ভাবে জানিনা, তবে দেখছি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ঐটুকু একটা শিশু শুধু বাড়ি কেন, সমস্ত পাড়াটাকে যেন তোলপাড ক'রে তুলেছে। আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে, কর্তা স্বয়ং হয়েছেন নাতির দিকে।...এদিকে শিশুর চীৎকার, ওদিকে ওর গলা মাঝে মাঝে সপ্তমে উঠছে ঠেলে—উনি জানতে চান যে কেন খেলনা আনা হয়নি? কার গাফিলতি?...হ্যাঁ, ছেলেমানুষের আবদার আগে সামলাতে হবে—সব কাজ ছেড়ে...ওর ঢের ধৈর্য, কালও আনতে গেছে শুনে চুপ করে ছিল...কেন এলনা আজ পর্যন্ত?

জমিদারী গলা, বাড়ির সমস্ত মহলগুলো গমগম করে উঠছে। আরও একটা আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে, স্ত্রীকণ্ঠে। অতটা না হলেও বেশ জানান দেওয়া—আদর দিয়ে দিয়ে এরকম জিদ হতে দেওয়া আর ভালো নয় নাতির...যুগ পালটেছে, এসব জিদ আর চলবে? ঠিক যেটি চাইবে সেই জিনিসটি এসে পড়া চাই হাতের মুঠোর মধ্যে!...তার চেয়ে ভাল ভাল খেলনা সব দেওয়া হচ্ছে—না, আমার ঠিক সেই খেলনা চাই—বাজার তো উটকে এল—সে খেলনা যদি না পাওয়া যায় বাজারে...

"কলকাতার বাজারে বাঘের দুধ পাওয়া যায় পয়সা ফেললে।"

"তার কারণ বাঘ পাওয়া যায়; সহরে আছে, দেশেও আছে।···খেলনাটার জন্য কলুটোলা-বাধাবাজার থেকে নিয়ে চৌরঙ্গীর বড় বড় দোকান, যায় হগ সাহেবের বাজার পর্যন্ত সব চষে ফেলেছে—কোন্ জার্মেনী কোম্পানীর তৈরী জিনিস লড়াইয়ে কোম্পানী নষ্ট হয়ে গেছে, আর আসে না চালান, কোথা থেকে পাবে লোকে এ, বাঘের-দুধ তা বলো···"

কর্তা কুট চালও দিচ্ছেন মাঝে মাঝে—

আমলা মুহুরী চাকর-পেয়াদাদের হাঁক দিচ্ছেন নাম ধরে, কষে ধমক দিচ্ছেন, নাতি বুঝুক কী হুলুস্থুল কাণ্ডটা লাগিয়েছেন উনি তার জন্যে।···এতেও যদি বাগ মানে।

কিছুই খাটছেনা। ভেতরে কি কাণ্ড হচ্ছিল এতক্ষণ চোখে দেখিনি, রঙ-বেরঙের আওয়াজ থেকেই যা আন্দাজ হয়, হঠাৎ ছেলেটা যেন কার পাঁজা থেকে ছিটকে তীরের মতো বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকে বন্ধ দরজাটার ওপর আছড়ে পড়ল। সেই খেলনা চাই—থাকবে না এ বাড়িতে কখনও থাকবে না।···

এসে ধরে ফেলল সবাই। কিন্তু রাখবে কে ধরে? স্প্রিঙের দম দেওয়া খেলনার মতোই ছিটকে ছিটকে পড়ছে কোল থেকে, পাঁজা থেকে। মোটা গালচে পাতা তাই রক্ষা, তবু দেখছি মুখে হাতে পায়ে এক একটা যেন রক্তের টানা দাগ, ওলটাতে পালটাতে চিকচিক ক'রে উঠছে—কি করে ছ'ড়ে গেছে, দেওয়ালে লেগে, কি শানে আছাড় খেয়ে, কি কোনও আসবাবেই ঠোক্কর খেয়ে। নমুনা যা দেখছি তাতে এতক্ষণ যে আস্ত আছে কি করে সেইটেই আশ্চর্য।

এক প্রস্থ খেলনা এসে গেল। সম্ভবতঃ একেবারে নূতন আমদানি, কেউ বেরিয়ে গিয়েছিল, এইমাত্র খরিদ করে এসে পৌঁছোল, কটাতে কাগজ জড়ানো রয়েছে এখনও।

"এই তোমার ঘোড়া, নিজে চড়ে গিয়ে কিনে আনগে তোমার খেলনা, লাখুবাবু"···

চীৎকারের সঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, বিদ্যুৎবেগে ঘুরে উঠে কাঠের দোলনা ঘোড়াটা পাঁজিয়ে ধ'রে একটা কুশন চেয়ারের গায়ে আছাড়! কয়েকটা টুকরোয় ছিটকে পড়ল দুটোই। তারপর আর হাতের কাছে এগিয়ে দিতেও হোলনা, ডল, এয়ার-গান, বিউগল, রেলের সেট, পাম্পকরা ফুটবল—এক একটা ধরে আর আছড়ে ফেলে, দেওয়ালের গায়ে, আসবাবের গায়ে, দোরের গায়ে, জানলার গরাদের গায়ে, দুম-দাম শব্দ, তার সঙ্গে গলা ফাটানো চীৎকার। নূতন খেলনার লাট যেন ঘৃতাহুতি

হয়ে দাঁড়ালো। বাড়িটা সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে, গেটের ভেতর, পাশের গলির মধ্যে লোক জমে গেছে। বিশেষ করে ছেলে ছোকরার দল। এক উদ্ভট কাণ্ড!

ভেতর বাড়ি ওদিকে নিস্তব্ধ; শুধু মাঝেমাঝে কর্তা-গিন্নীর মধ্যে সেই উত্তর-প্রত্যুত্তর আদান-প্রদান। এ ছাড়া আর বিশেষ শব্দ নেই। মনে হয় বাড়ির সবাই এতে অভ্যস্ত, কিংবা এলে দিয়েছে, কিংবা নিরুপায়। বাইরের বাড়িতেও এক গোমস্তা চাকর ছাড়া কেউ নেই, শুধু বৈঠকখানার ভেতরের দিকে জানালায় মুখ চেপে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। মনে হয় বাড়ির মধ্যে যেন একটা অলিখিত কানুনই আছে যে লাখু চটলে যেন কেউ তার সামনে না যায়।

এদিকে তাণ্ডব সমানভাবেই চলেছে। ভাবছি এইভাবে যদি চলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

এই ভাবে আর একটা তোড় নামল।

বৈঠকখানার সামনে গাড়িবারান্দায় একটা মোটর এসে দাঁড়াল। বাড়ির বড় শেভ্রোলেটটাই। এদিকে ভেতর থেকে কর্তাও জামা জুতো পরে বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলেন। বললেন—"হয়েছে। চল্ আমার সঙ্গে, নিজেরা গিয়ে কিনে আনব যেখানে থেকে পারি। খেলনা নাকি এতবড় কলকাতার শহরটায় পাওয়া যাবে না। না পাওয়া যায় ওদিক থেকে বম্বে, সেখানে না পাওয়া যায় একেবারে বিলেত। চল, আয়।"

আরও চীৎকার, আরও আছড়ানি, কোনমতেই যাবে না—কোন খেলনাই নেবে না। রাগের সঙ্গে জুটেছে আবার অভিমান, দাদুর ডাকে। যে যাচ্ছে ধরতে তাকে আঁচড়ে কামড়ে একশা করে দিচ্ছে—নিজের অঙ্গেও কয়েকটা রক্তের দাগ নূতন করে উঠল ফুটে। কর্তা নিজেও এগিয়ে গেলেন, ঠিক আঁচড়ানি—কামড়ানি না হোক, হাত-পা ছোঁড়ার কয়েকটা ধকোল পড়লই এসে গায়ে আর আদ্দির পাঞ্জাবীটাতে যে টানা বিদারন-রেখা পড়ল সেটাকে আঁচড়ানো-কামড়ানোর বাইরে ফেলা যায়ই বা কি করে?

তবে সম্পর্কটা তো দাদু-নাতিরই; এসব নিশ্চয় অঙ্গের ভূষণ। হেসে একটা মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে বললেন—"আচ্ছা, তোকে যেতে হবে না, আমি একাই যাচ্ছি। তুই চুপ কর, আমি খেলনা নিয়ে এলুম বলে।"

তাতে আরও আপত্তি। ভেবেছিলুম গলা আর হাত-পা-ছোঁড়া চরম হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলুম আরও শক্তিধর ছোকরা! লাফিয়ে উঠে ছুটে যায়—না, যেতে দেবে না—কিছু খেলনা নেবে না—মোটর ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।

সবাই ধরে রইল কর্তা মোটরে গিয়ে ঢুকলেন, গলা বাড়িয়ে বললেন—"সামলে-সুমলে রাখো সবাই একটু।"

তা কি যায় রাখা? কর্তা যেতে আরও যেন উৎকট হয়ে উঠল। তারপর যখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছি—একটা কিছু হয়ে না পড়ে, ভিমি না যায়, সেই সময় সব ঠাণ্ডা।

আর একখানি মোটর এসে গাড়িবারান্দায় দাঁড়াল এবং একটি বছর ত্রিশের যুবা হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে নেমে এল। লাখুর বাবা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বৈঠকখানায় ঢুকে প্রশ্ন করল—"ব্যাপার কি?" তারপরেই লাখুর দিকে চেয়ে বলল—"ওঠ্।"

বাপ ঢুকতেই লাখু চুপ করে গিয়েছিল, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাপ ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"এ সব কি কাণ্ড?"

উত্তর নেই, শুধু চাপা কান্নাটা কয়েকটা দ্রুত ফোঁপানির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে আবার থেমে গেল। সোডাওয়াটারের বোতলটা খুলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিপি এঁটে দেওয়া হয়েছে!

সংক্ষিপ্ত বিচারপর্বও শেষ হয়েছে ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে রায়ও বেরিয়ে গেল। বিচারক শুধু একবার জিজ্ঞেস করে নিল, বাবা বাড়িতে আছেন কিনা, নেই শুনে চরম দণ্ড দিতে আর বাধল না, একেবারে নির্বাসন।

বলল—"বাড়িতে ডাকাত পোষা যায় না। বের করে দোর দিয়ে দাও।"

একটু ইতস্তত করবেই সবাই। নিজেই ঘুরে দোরের দিকে আঙুল বাড়াল। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছে—সেই ছেলে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বাপ নিজের হাতেই দরজাটা বন্ধ করে গটগট করে ভেতরে চলে গেল। একটা চাকর ঘরটা গুছিয়ে দিতে রয়ে গেল। বাকি সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মন্দ লাগল না। জমিদারের তিনপুরুষ—বাপ, ছেলে, নাতি। কতদিনের সঞ্চিত একটা তেজ—একটা প্রতাপ—নিঃশব্দ, আবার শব্দিল—চেয়ে চেয়ে দেখবার যোগ্য বইকি।

তারপর···

বলতে যাচ্ছিলাম—তারপর ঐ নাতিতেই এসে সমস্ত যুগটা গেল পালটে। বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তাই বা বলি কি করে? এ আবার যা প্রতাপ তা তো যুগে যুগেই নিমেষে যুগ দিয়েছে পালটে।

ঘর থেকে বেরিয়েই গাড়ি-বারান্দার ওপর যে রকটুকু সেটা ঘুরে এদিকে গলির

দিক পর্যন্ত চলে এসেছে। বেশ টানা, এদিকে হাত আড়াইয়েক চওড়া। নির্বাসন দণ্ডাদেশের পর লাখু প্রথমটা গাড়ি-বারান্দার সামনেই এসে দাঁড়াল, তারপর পা-পা করে চলে গিয়ে গলির এদিকটার রকটায় এসে দাঁড়াল।

দেখলাম রাগ যায়নি মোটেই, অভিমানও ছিলই, তার ওপর এখন আবার এই অপমান এসে যেন উগ্র ত্র্যহস্পর্শ দোষের মতো কি একটা দাঁড়িয়েছে। মুখটা রাঙ্গা টকটক করছে, বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, চাপা কোঁপানিতে শরীরটা উঠছে কেঁপে কেঁপে। একটা ভয় তো এসেছেই ছেলেমানুষের, কিন্তু সে ভয়টাকে ঠেলে চোখদুটো যেন এক একবার জ্বলে জ্বলে উঠছে—একটা যে প্রতিশোধের কঠোর সংকল্প, সেটাকে ভাষায় রূপান্তরিত করলে কতকটা যেন এই রকম দাঁড়ায়—রোস না, দাদুকে একবার আসতে দাও, তোমারও হচ্ছে।

এ ভাবটা তো আরও খারাপ; ও রকম একটা উগ্র বিক্ষোভ যদি নিজের মধ্যেই এমন করে ঘুরপাক খেতে থাকে তো শিশুর পক্ষে সে যে আরও সাংঘাতিক। একটু শঙ্কিতই হয়ে উঠেছি। তারপর মনে করছি কাউকে ডেকে না হয় বলি; এভাবে একলা দাঁড় করিয়ে না রেখে বাবুকে ব'লে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা করুক, এমন সময় মেয়েটির ওপর নজর পড়ল।

'নজর পড়ল'—বলা ঠিক হবেনা। দেখেছি আগেই, তবে যা খণ্ড প্রলয়টা গেল তাতে অতটা খেয়াল করিনি।

এই গলিটা অল্প একটু গিয়েই লাখুদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে গেছে। ঠিক মোড়ের ওপর যে ছোট্ট একতলা বাড়িটি, সেই বাড়ির মেয়ে। ওদেরও দরজার বাইরে ছোট্ট একটুখানি রক, একটু কোনাকুনি পড়ে আমার ঘরের জানলা থেকে, অল্প যে ক'দিন এসেছি এখানে তার মধ্যে বিকেলের দিকে কয়েক বারই নজরে পড়ল, মেয়েটি ইঁট দিয়ে ঘর পেতে নিজের খেলনা নিয়ে বসেছে। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি, বিকেলের পড়ন্ত রোদটা গলি বেয়ে গিয়ে পড়েছে ঘরনী থেকে ঘর-করনা-সমস্তটুকুর ওপর, নড়তে চড়তে ঝিকমিক করে উঠছে, আপিস-ফেরৎ আলস্যের ঘোরে বসে বসে দেখি।

একাই থাকে মেয়েটি, গলিটা বিরলবসতিও, তবে বার দুই-তিন চোখে পড়ল জমিদার-বাড়ির পেছন দিক দিয়ে একটি প্রায় সমবয়সী ছেলে কতকটা যেন প্রচ্ছন্ন-ভাবেই গিয়ে উপস্থিত হোল, এবং এদিকে পিঠ করেই খেলায় জমে গেল। মেয়েটিকে যেন চোখ তুলে তুলে এ বাড়ির দিকে চাইতেও দেখে থাকব মাঝে মাঝে। নিশ্চয় ওরই প্রত্যাশায়।

এ গেল ওদিককার ইতিহাস।

আজও পড়েছিল বার দুই নজর; মেয়েটি একতলা বাড়ির দরজার চৌকাঠ ঘেঁসে একটু ঘাড়টি বেঁকিয়ে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ হাতটা ঝোলানো তাতে একটা মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স, বিস্কুটের বাক্স বলে মনে হোল। রাস্তায় যে ভীড়টা জমেছিল তার মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি কিন্তু মেয়েটি। এইবার যখন সব ঠাণ্ডা, নাটকের পট পরিবর্তনের সঙ্গে রাস্তা একেবারে নির্জন, দেখি মেয়েটি চৌকাঠ ছেড়ে নেমে পড়ল; তারপর দু'একবার এদিকে ওদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়াল এদিকে।

আমার জানালাটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে একটু আত্মগোপন করে বসলাম।

মেয়েটি রকের ও-প্রান্তে এসে আবার একবার চারিদিকে একটু দেখে নিল, তারপর বাক্সটা রকের কিনারায় রেখে, বুকটা রকের পাশে চেপে হাতের চেটোয় চিবুকটা রেখে গলিটার ওপরই নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লাখু এর আগেই কখন বসে পড়েছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু মুড়ে সামনের দিকে চেয়েই বসেছিল, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে, মেয়েটি আসতে একবার ঘুরে চেয়ে নিয়ে আবার দৃষ্টি সামনে ফেলল, খানিকটা সময় এই ভাবেই গেল।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম সময়টা বৃথাই যায়নি একেবারে। লাখুর মুখের সেই থমথমে ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে, ঠিক সহজ না হোক, একটা যেন নির্লিপ্ত-তার ভাব ফুটে উঠছে, কতকটা যেন—এই যে নতুন পরিবেশটুকু সৃষ্টি হোল এর সঙ্গেও তার অসহযোগ।

মেয়েটি বাক্সর ডালাটা খুলল; যে শব্দটুকু হোল তাতে লাখু একবার ঘুরে চাইল। এবং চেয়েই রইল একটু। মেয়েটি কতকটা যেন অবহেলার সঙ্গে বাক্সর অল্প-সঞ্চয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল—কয়েকটা কাঁচের পুতুল; গোটা দুই ন্যাকড়ার, বাড়িতেই তৈরী; কাপড় চোপড় পরানো দুটো সেলুলয়েডের; একটা ভাঙ্গা তার মধ্যে। আর গাদাখানেক নানা রঙের ছোট বড় কাপড়ের টুকরো—মনে হয় দরজির দোকান থেকে সংগ্রহ ক'রে আনবার কেউ আছে; ছিট আছে, সিল্ক আছে, সাদা মখমল আছে। এইগুলো হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে, আবার হাত আলগা ক'রে ঝুরঝুর করে বাক্সয় ফেলতে লাগল নিজের মনেই; লাখুর দিকে দেখলাম মাত্র একবারটি চোখের একটুখানি কোণ তুলে চাইল। তারপর হঠাৎই সবগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাক্সর ডালাটা চেপে দিয়ে লাখুর উল্টো দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিয়ে আবার আগেকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

লাখু বললে, "উঠে আয় না নিরু। আসবি ?"

মিনিটকয়েক আগের সেই যে বজ্র-নির্ঘোষ তার সঙ্গে এ কণ্ঠস্বরের কোন সম্বন্ধই নেই। সেটা অবশ্য কিছু আশ্চর্য নয়, যে জ্বালামুখ দিয়ে অগ্নি বর্ষায় তাই থেকে আবার ঝরণাও তো নামে।

উঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো আসা চলে না। একটু দাঁড়িয়েই রইল নিরু, তারপর বাক্সটা কাঁখালে তুলে নিয়ে ফ্রক পরা ছোট্ট শরীরে সামান্য একটু দোলা দিয়ে রকের শেষের সিঁড়ি বেয়ে, আস্তে আস্তে উঠে এল। তবে একেবারে এদিকে নয়; মাঝামাঝি। লাখুও উঠে গিয়ে বসল। আমার একটু অসুবিধাই হল, তবে একেবারে সামনাসামনি হওয়ায় পাল্লাদুটো আরও একটু চেপে দিয়েও সবটুকু দেখতে পারছি।

নিরুও বসেছে। আড়ষ্ট ভাবটা আর একেবারেই নেই; ডালাটা খুলতে খুলতে হঠাৎ ভ্রূ-দুটো তুলে মুখটা একটু দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর বুঝি খেলনা হারিয়েছে ?"

লাখু বলল, "হুঁ।...দাদু আনতে গেছে। আমি নোব নাকি ভেবেছিস ?

নিরু ডালাটা পাশে রেখে নীচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা ঠেলে, তারই সঙ্গে একটু সূক্ষ্ম হাসি-মিশিয়ে মাথাটা দুলিয়ে দিলে। বোধহয় তাৎপর্যটা—এমন খাতিরও দেখেনি, এমন জিদও দেখেনি। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট করে হেসে উঠল।

লাখু দেখলই না, কিম্বা ব্যঙ্গটুকু গায়েই মাখল না। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বাক্সর মধ্যে চেয়ে ছিল, বলল—"তুই একটা চমৎকার জিনিস পেয়েছিস তো নিরু, মখমল বলে ওটাকে।"

"জানি।...দাদা এনে দিয়েছে।—তুই নিবি ?"

সামনে মেলে ধরল। আট আঙুল × আট আঙুল—এই রকম একটা টুকরো।

লাখুর চোখদুটো হঠাৎ লুব্ধ হয়ে উঠে চকচক করছে। তবুও একবার বলল—"তোর থাকবে না যে। অমন ভালো মখমলটা..."

নিরু বাড়িয়েই ধরল, বলল—"তুই নে তো। আমার কথা ভাবতে হবেনা। ...আয় খেলি একটু, অ্যাঁ ?"

কাপড়টা নিয়ে বাঁ হাতের ওপর বিছিয়ে চেয়ে রইল লাখু। কী অপূর্ব জিনিসই যে পেয়েছে। চোখ ফেরাতে পারছে না।...ওদের তো মুখ নয়, শরতের আকাশ, এই ছিল বাদলের কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা, এখন একেবারেই আলোয় ঝলমল।

বিস্মিত হতে হ'য়েছে বৈকি! কোথায় আট আঙুলের একটুকরো পরিত্যক্ত মখমল, আর কোথায় একটা এমনই দুর্লভ খেলনা যার জন্য দাদুকে হয়তো বিলাত পর্যন্ত ছুটতে হবে। তাও যেমন শোনা গেল, পেলেও পণ্ডশ্রম।

বিস্মিত হয়েছি বৈকি, তবে খুব বেশিও নয়। ওদের জগতের ধারাটাই তো মোটামুটি এই।

তারপর যেটুকুও বা বিস্ময় ছিল তাও গেল কেটে, দেখলাম রহস্যটুকু আরও গভীর—

চেয়েই ছিল লাখু। দৃষ্টিতে অসীম কৃতজ্ঞতা। একটু পরে ডান হাতটা টুকরোটুকুর ওপর ধীরে ধীরে বুলুতে বুলুতে বলল—"তুই সত্যি বেশ নিরু।"

নিরু খেলাঘর পাতছিল, প্রশংসায় কান দিল না, ঠোঁট দুটি অল্প একটু যা কুঁচকে গেল।

এর পরেহ—"তুইও আমায় লব্‌ করিস, না রে?...বিয়ে করবি তো?

বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছে সংলাপ। নিরু সেলুলয়েডের একটা পুতুল তুলে নিয়ে কাপড় পরাতে পরাতে বলল—"না ভাই, তোমরা হচ্ছ জমিদার, রাজা, আমরা গরীব..."

নিরাশার ছায়া মুখে পড়তে না পড়তে লাখুর মনে পড়ে গেছে, নিরুর পিঠে হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বলল—"নারে জমিদারী আর আমাদের নেই।"

নিরু কাপড় পরাতে পরাতেই বলল—"যাঃ, তাই না আরও কিছু।"

"মাইরি বলছি, মাইরি, মাইরি। কাল ঠাকুরমা বলছেন—কেড়ে নিয়েছে আমাদের জমিদারী।"

—মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্ষতিটা কতবড় যে লাভ, কী যে এক ঘোর সমস্যা গেছে মিটে!

এরপর আর একটু মুখটা ঝুঁকিয়ে—

"করবি তো বিয়ে এবার?"

কাপড় পরাতে পরাতেই একটা হাসিকে চেপে চেপে রাখবার চেষ্টা করছে নিরু; ওরা তো স্পষ্ট ক'রে বলতে জানেও না। মুখটা বরং একটু ঘুরিয়েই নিল উল্টো দিকে, তারপর পুতুলটা বাক্সর রেখে দিয়ে বাক্স উটকে উটকে আর এক টুকরো বের করল।

রাজা টকটকে খানিকটা সিল্ক। এবার আর নিতান্ত আট আঙুলেরও নয়, প্রায় আধ হাত চওড়া একটা লম্বাটে ফালি। যত্ন করে ভাঁজ করা ছিল, যেলে

ধরতে পড়ন্ত রোদে ঝলমল ক'রে উঠে খানিকটা যেন আলো ছড়িয়ে দিলে জায়গাটায়। লাখুর মুখটা আরও যেন শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিরু হাতটা বাড়িয়ে বলল—"তুই বরং এইটে নে তাহলে, ওটা দে আমায়।···কী চমৎকার এটা, নারে! তুই-ই নে।"

রাজকন্যা

ভেতর দিকে আর ভালো জায়গা নেই; শহরটা তাই এবার বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তর দিকে যে একটা বস্তি ছিল, বস্তির মালিক সেটা পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে জমিটা টুকরো টুকরো করে বিলি করে দিয়েছেন। বাড়িঘর উঠছে; কোনটার বনেদ পর্যন্ত উঠেছে, কোনটার আর একটু বেশী; একখানা শেষ হয়ে গেছে। দোতলা নূতন ফ্যাসানের বাড়ি। দোরগোড়ায় ভরা কলসী, কলাগাছ আর অন্য সব মাঙ্গলিক। বাড়িওলা কৃষ্ণধনবাবু নূতন গৃহপ্রবেশ করছেন।

জায়গাটা খুব ফাঁকা। শহরের দিকে একটা জলা পড়ে, কলোনিটা গড়ে উঠলে এটাকে নাকি লেক ক'রে দেওয়া হবে। পেছনের দিকটায় টানা ক্ষেত। লোকজনও নেই! বস্তির লোকেরা উঠে গেছে, এদিকে নূতন বাসিন্দাও আসেনি। সমস্তদিন একরকম খাঁ খাঁ করতে থাকে, রাত্রে একেবারে নিঝুম।

কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারটি মাঝারি গোছের। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি নিয়ে জনা দশেক। এদিকে পাচকঠাকুর, সোফার, চাকর, ঝি, আরদালী, মালী নিয়ে জনাছয়। কুকুর আছে এক জোড়া, এলসেসিয়ান। বন্দুক আছে।

আর আছে রাঘু, নাতি। লোকজন কুকুর বন্দুক থাকা সত্বেও গৃহিণী শহর ছেড়ে এই তেপান্তরে এখন এসে উঠবেন কি না ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। রাঘু সাহস দিল—"তুমি চল, কিছু ভয় নেই, এই যে আমি আছি।"

ছেলেটির মনটা অ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা একেবারে। এমনি তার কাজ হ'ল দুপুরে আর সন্ধ্যায় ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা আর বাকি সময়টা খেলনা বন্দুক নিয়ে ডাকাত আর রাক্ষসদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো; এখানে এসে—বোধহয় ঠাকুরমা তার ভরসায় এসেছে এই ধারণায়, খোঁজাখুঁজিটা আরও গেছে বেড়ে। নূতন জায়গা, সবাইকে একটু অন্যদিকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাইতে অবাধে খোঁজাখুঁজির একটু সুবিধাও

হয়েছে। জায়গাটাও এমন যে দৈত্য, ডাকাত—এদের প্রাচুর্য কল্পনা করে নিতে মোটেই বাধে না। লোকজন নেই, তার কারণ এরা সব এখানে-ওখানে যে লুকিয়ে আছে,—ঐ নূতন বাড়িটার এলোমেলো দেওয়ালের পেছনে, দূরের ঐ তেঁতুল গাছটার ঝাঁকড়া মাথার মধ্যে। আরও দূরে ঐ যে চিক-চিক্ করছে জল, ওর মধ্যে।

জলটাই সবচেয়ে বেশী ক'রে রাখুর মনকে দেয় নাড়া। কল্পনাকে তোলে জাগিয়ে। ঠাকুরমার কাছে শোনা গল্পটা ঐখানটায় এসে যেন সত্য হয়ে ওঠে। ঐখানে জলের মধ্য দিয়ে অনেক নীচে, অনেক নীচে ডুবে গেলে, দেখা যাবে প্রকাণ্ড বাড়ি, তার চারিদিকে দৈত্যরা দিচ্ছে পাহারা, তাদের চোখ এড়িয়ে সেই একটা ঘরে পৌঁছে গেলে, দেখা যাবে, রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, তার মাথার কাছে সেই সোনার কাঠি, রূপার কাঠি…

এই গল্পটাই বেশী ক'রে আজকাল শোনে ঠাকুরমার কাছে রাখু। মনে হয়, কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে কি করে ঠিক সেই জায়গাটায় এসে গেছে, এইবার একদিন নেমে গেলেই হয়। তারপর কি করে কোথা দিয়ে যেন কি সব হয়ে যাবে, দেখবে সে একেবারে দৈত্য-ঘেরা পুরীর মধ্যে রয়েছে দাঁড়িয়ে। ঠাকুরমার গল্প উঠবেই এক-দিন সত্যি হয়ে এবার।

—ঐ জলের অতলে কিম্বা ঠিক উল্‌টো দিকে ঐ ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের তলায়, দিনের বেলায়ও সেখানে দৈত্যরা অন্ধকারে ছায়া-রূপ ধরে থাকে লুকিয়ে, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে আরও দৈত্যরা ছায়া-রূপ ধরে এসে জড়ো হয়।

একদিন বিকালে হঠাৎ বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল,—রাখুকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর একটা ঘুরে বেড়ানো রোগ আছে জানে সবাই। আগেকার বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু সে অল্প পরিসর জায়গা, একটু খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিলে যেতো; চিলের ছাতের সিঁড়িতে, কিম্বা অন্য কোনও নিরিবিলি জায়গায় চুপটি করে বসে আছে, হাতে বন্দুকটা কিম্বা হয়তো পাশে রাখা, দৃষ্টি কোন্ সুদূরে। ক্রমে গা সওয়াও হয়ে গিয়েছিল, কেউ আর খুঁজতো না, খুঁজলেও জায়গাগুলো চেনা থাকায় উৎকণ্ঠিত ভাবটা কেটে গিয়েছিল একেবারে। এখানে নির্জন পল্লীতে এসে ওর ঐ যাযাবর-বৃত্তিটা যে কত বিপজ্জনক, সবাই এই যেন প্রথম উপলব্ধি করল। বেশ একটু হৈ-হৈ পড়ে গেল।

রাখুকে পাওয়া গেল ঝিলের ধারে। একটা বাবলা গাছের চারিদিকে কিছু আগাছার ঝোপ-ঝাড় হয়ে একটা আড়াল সৃষ্টি করেছে, তার ওদিকে ঝিলের সামনাসামনি হয়ে বসে আছে রাখু।

একচোট খুব বকাবকি হ'ল, বাবা-কাকাদের চাপড়টা-আসটাও পড়ল গোটা-কতক, কড়া পাহারার মধ্যে অ্যাড্ভেঞ্চার কটা দিন পঙ্গু হয়ে রইল। তারপর আবার একদিন সবার দুশ্চিন্তাটা চতুর্গুণ হয়ে এল ফিরে। এবার ঝিলে জাল পর্যন্ত টানতে হল। রাখু অদৃশ্য হয়েছে আবার।

কাহিনীর এ অংশটা রাখুর দিক থেকে বললেই বুঝতে সুবিধা হবে—

দুপুর বেলা। খাওয়া-দাওয়া করে বাবা কাকা আর দাদারা অনেক আগে বেরিয়ে গেছে—বাবা আর কাকারা চামড়ার ব্যাগ হাতে করে, দাদারা বই নিয়ে, যেমন যায় রোজ। বাড়ির আর সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছে, ঠাকুরমাও গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। অন্যদিন রাখুও পড়ে ঘুমিয়ে, আজ কি হয়েছে, ঘুমের পরী তার চোখের কাছ দিয়েও যায়নি। ঘরের মধ্যে বিলাতী খেলার সরঞ্জাম, খানিকটা নাড়া-চাড়া করল নিয়ে, তারপর জানালার ধারটিতে গিয়ে বসল।

দোতালার ঘর, নীচে অনেকদূর পর্যন্ত যায় দেখা। বাড়ি থেকে খানিকটা এগিয়ে আর একখানা যে বাড়ি তোয়ের হচ্ছে তাতে লোকজন খাটছে, তার পরেই যতদূর দৃষ্টি যায় একেবারে নির্জন। সাদা রোদ রয়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে, এত বেশী করে ঘুমন্ত পুরীর কথা মনে পড়ছে যে, রাখুর মনটা যেন আইঢাই করছে। ওর বদ্ধ ধারণা ঝিলের দিকে পা বাড়ানো যে কড়া রকমের বারণ, নৈলে এতদিন কোন-না-কোন উপায়ে আনতই ত উদ্ধার করে রাজকন্যাকে।

ভাবছিল বসে ;- ভাবতে ভাবতে বন্দিনী রাজকন্যার জন্য মনটা করুণায় ভরে উঠেছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। রাখু বসেছিল ঠিক উলটো দিকে মুখ করে ; ঝিলের দিকে চাইতে পর্যন্ত মানা করে কাকা ওদিককার জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকেও যে দেখবার কিছু নেই এমন নয় ; সেই তেঁতুল গাছটা রয়েছে নিজের গায়ে অন্ধকার জড়িয়ে। তারই গোড়ায় দৃষ্টি ফেলে বসে ছিল রাখু—এমন সময় একটি মেয়ে গাছতলার ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, তারপর কিসের জন্য বেরিয়ে আসা সেটা টের পাওয়ার আগেই তেমনি হঠাৎ আবার ঝোঁপের মধ্যে গেল সেঁদিয়ে।

এইটুকু, কিন্তু এইতেই রাখুর চিন্তার স্রোত একেবারে গেল ঘুরে। ওর মনে হল ঠাকুরমার মুখের গল্পটা আরও সত্যি হ'য়ে উঠে, একেবারে কাছাকাছি গেছে এসে। রাজকন্যাকে কেউ উদ্ধার করে এনেছে।

কিন্তু উল্লাসের চেয়ে করুণায় রাখুর মনটা গেল আরও গলে! ঐ এক নজরে যতটুকু গেল দেখতে তাতে মনে হ'ল কন্যার গয়নার ঘটা তো নেই-ই গায়ে একখানা

জামা পর্যন্ত নেই, আর তার চেয়েও যা মর্মান্তিক, ওর কোমরে নিতান্তই মলিন, ছিন্ন একখানি যেন ন্যাকড়া জড়ানো। রাজকন্যা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু একেবারে রিক্ত হয়ে। অস্থির হয়ে পড়ল রাখু। ইচ্ছা করে নেমে ছুটে যায়, জিজ্ঞেস করে —"তোমার এ দশা কে করেছে কন্যে?" কিন্তু সে নিজেই তো বন্দী। সমস্ত দুপুরটা জানালায় নিরুপায় ভাবে বসে চিন্তা করতে লাগল। নিজে বন্দী বলে আরও যেন আপন বলে মনে হচ্ছে ওকে, ক্রমে এও মনে হল যে সেও মুক্ত নয়। জলের মধ্যে ও এক দেশের দৈত্যদের কবলে ছিল, এখন অন্য দেশের দৈত্যরা ওকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে এই রকম নিঃস্ব করে দিয়ে নিজেদের পাহারায় রেখেছে আটকে, তেঁতুল গাছের অন্ধকার হয়ে সে-দৈত্যরা থাকে লুকিয়ে।

সেদিন আবার বাড়িতে একচোট সোরগোল উঠল। ঝিলের ধারের সেই ব্যাপারটার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। রাখু তার বন্দুক নিয়ে বাড়িতেই আশেপাশে থাকে, বন্দুকের শব্দ হয় মাঝে মাঝে, সবাই নিশ্চিত থাকে, নজর রাখার দরকারই হয়না; সেদিন কিন্তু হঠাৎ কাজকর্মের মধ্যে কারু কারু খেয়াল হল শব্দটা যেন অনেকক্ষণ কানে আসেনি। খোঁজ পড়ে যেতে দেখা গেল, কাছেপিঠে কোথাও নেই রাখু।

সে দিন কি হয়েছিল, তার চতুর্গুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল বাড়িতে। কর্তারা অফিস থেকে ছুটে এলেন, ছেলেরা স্কুল কলেজ থেকে। চারিদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হল, থানায় খবর দেওয়া হল, ঝিলে জাল ফেলাও হ'ল, কোন স্থানেই কোন সন্ধান না পেয়ে সবাই হাত-পা এলিয়ে দিয়েছে, কান্না-কাটিও পড়ে গেছে বাড়ির ভেতরে, এমন সময় সামনের বাড়িতে যে মজুরেরা খাটছে, তাদের একজনের মুখে খবর পাওয়া গেল যে, একটি ছেলেকে রতন বাউরির বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে; জুতো-জামা পরা, হাতে একটা বেশ বড় খেলনার বন্দুক, সঙ্গে একটা বড় কুকুর। সবার হুঁশ হল, অ্যালসেসিয়ানের একটা রয়েছে বাঁধা, আর একটা—যেটাকে নিয়ে রাখু বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে, সেটা তো নেই!

কিন্তু রতন বাউরি কে? তার বাড়িই বা কোথায়?

ওর কাছে খোঁজ পাওয়া গেল—বুড়ি রতন বাউরি দিনমজুরি করে খায়। একেবারে শেষের দিকে যে বাড়িটা উঠছে, আজকাল সেই বাড়িটাতে খাটছে। সংসারে নিজের বলতে ছোট্ট একটি নাতনী, রতনের বাড়ি ঐ তেঁতুল গাছের নীচে।

একদল ছুটল সেই দিকে। হতে-করতে এদিকে রোদও প্রায় মিলিয়ে এসেছে আকাশে।

রতন বাউরির বাড়ি বলতে—তেঁতুল গাছের ওপাশটায় ঝোপঝাড়ের মাঝে একটু জায়গা পরিষ্কার করে একখানি কুঁড়েঘর, কঞ্চি আর খড়ের ওপর মাটিলেপা দেওয়াল, চালে আছে কিছু খড় কিছু তালপাতা, আর আছে একখানা ছেঁড়া মাদুর।

নীচে এক টুকরো ছেঁড়া মাদুরে রতন বাউরির নাতনী ঘুমুচ্ছে। ফুটফুটে না হোক, ধুলো ময়লার নীচে রংটা একটু কটাই, মাথার চুলটা রুক্ষ, আর সেই জন্যেই তামাটে। কোমরে যে ছেঁড়া ন্যাকড়াটুকু রয়েছে সেটা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।··· রতনবুড়ি এখনও মজুরি খাটছে নিশ্চয়।

পাঁচরকম ডালপালা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট উঠোনটুকুর মাঝখানে প্রকাণ্ড অ্যালসেসিয়ানটা থাবা পেতে বসে আছে। ও-জাতের কুকুর একজন লোককেই চেনে, একটা হুকুমই মানে। এরা গিয়ে পড়তে একবার ঘুরে দেখে নিয়ে ল্যাজটা একটু নেড়ে আবার থাবায় মুখ চেপে বসল।

রাখুও পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে বন্দুকটা রীতিমতো ট্রিগার টেনে ধরা। গম্ভীরভাবে একেবারে তদ্‌গত হয়ে সামনে ছিল চেয়ে, এরা গিয়ে পড়তে হাত উঁচিয়ে ফিস-ফিস করে বলল্—"চুপ, রাজকন্যে ঘুমুচে!"

সবাই অবাক হয়ে রইল দাঁড়িয়ে।

রাজকন্যা ঘুমুচে। কঞ্চি-খড়ের দেওয়ালের ছেঁদা দিয়ে পড়ন্ত রোদের একটা রেখা সেঁদিয়ে গায়ের ওপর আস্তে আস্তে যাচ্ছে মিলিয়ে।

বৈদিক ও গান্ধর্ব

যা হল সেটা সম্ভব হল বিবাহটা নিতান্তই কাছাকাছি এপাড়া-ওপাড়ার মধ্যে বলেই। নইলে একজন প্রস্তাবটা করল, তাও মেয়েই, অপরজন রাজি হয়ে গেল, তার পরেই টোপর, মুকুট, মালাবদলের ব্যাপার—এরকম সচরাচর হয় না।

যে বর হ'ল, চিন্ময়, তার বাড়ি উত্তরপাড়ার দক্ষিণে, ক'নে চপলার বাড়ি দক্ষিণপাড়ার উত্তর ঘেঁষে, মাঝখান দিয়ে জেলা বোর্ডের চওড়া রাস্তাটা পূবে-পশ্চিমে বেরিয়ে গিয়ে পাড়া দুটোকে আলাদা করেছে। ঝগড়া রেষারেষি আছে, পাড়ায় মধ্যেই হচ্ছে যখন, নামের প্রভেদ তো একটু হবেই। তবে, সেটা নিতান্ত সাময়িক, দুর্গাপূজায়, কালীপূজায়; নয়তো রোজকার ব্যাপারে মিলেমিশেই আছে

ছুটো পাড়া। না হবেই বা কেন?—দক্ষিণপাড়ায় কত ঘরে উত্তরপাড়ার মেয়ে রয়েছে, তেমনি উত্তরপাড়ায় কত ঘরে দক্ষিণপাড়ার মেয়ে। এই তো চপলা গেল চিন্ময়ের বাড়ি।

আজই বিয়ে হ'য়ে এই প্রথম নয়। এদের বাড়ি আবার খুব কাছাকাছি। চিন্ময়দের বাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারেই। উঠানটায় পেয়ারা জামরুল আর একটা মাদারের গাছের ছায়া, কাছে-পিঠের ক'বাড়ির ছেলেমেয়েরা জোটে। ফলের লোভও আছে, খেলাঘর পাতারও স্থবিধা। চিন্ময়ও বাদ যায়নি এককালে।

চপলাদের এজমালি বড বাড়ি। বার-বাড়ি আর ভেতর-বাড়ির মাঝখানে একটা বেশ বড় উঠান। পালা করে ঝুলন উৎসব হয়, যাত্রার আসর বসে। বছরের বাকি সময়টা ছোট ছেলেদের ফুটবল ক্রিকেটের মাঠ। উত্তরপাড়ায় দক্ষিণপাড়ায় ম্যাচও হয়েছে। উত্তরপাড়ার চিন্ময় গোল খেলে দক্ষিণপাডার 'চপী' হাততালি দিয়ে ঝুঁটিনাডাও খেয়েছে এককালে।

অনেক আগেকার কথা।

তারপর একদিন গ্রামের স্কুলের পডা শেষ করে চিন্ময় স্থদূর পশ্চিমে চলে গেল কলেজের পড়াশোনার জন্য। মামাবাড়ি, খানিকটা স্থবিধা আছে। বাড়ি এসেছে মাঝে মাঝে, তবে অল্প দিনের জন্তে। একেবারে পডাশোনা শেষ করে যখন এল তখন চপলাদের বাডির সবার মনে হল, যে-ছেলেটা একদিন বাতাবিলেবুর ফুটবল নিয়ে উঠানেই দাপাদাপি করত তার মধ্যে বিবাহের পাত্র হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়েদের মধ্য থেকেই আরম্ভ হল, কেননা ওদের দৃষ্টি এসব দিকে বেশি প্রখর। চপলার বাবাকে বলা হ'লে তিনিও চোখ রগড়ে বললেন—"তাই তো! তোল না বোসগিন্নির কাছে কথাটা।" বোস গিন্নি হাসি-হাসি চোখ বড় করে বললেন—"আমাদের চপা? বৌ হয়ে আসবে! তা আস্থক বাপু, অষ্টপ্রহর এই বাডি নিয়ে থাকত, ইস্কুল হয়ে যেন ছেড়েই দিয়েছে! এই পেয়ারাতলায় কত খেলাঘর পেতেছে দুজনেই তো; পাতুক এবার আসল ঘর।"

চপলা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। শেষ হয়ে গেলে ভাবল, এইবার চিনুদার সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসবে। কিন্তু ও মুখো হওয়াই বন্ধ করে দিল। চিন্ময় এসেই ওর কথা তুলেছিল—সে ওদের বাড়ি গেল, কৈ চপিকে তো দেখল না!

মা বলেছিলেন—"তার পরীক্ষা। বই নিয়েই ব্যস্ত থাকে নাকি নিরিবিলি বেছে। তিন মহল বাড়ি তো!"

"ওরে বাবা! সে দিনের চপি বিদুষী হয়ে উঠেছে মস্তবড়। দেখা হলে কথা কইবে তো?"—মন্তব্য করেছিল চিন্ময়। এখন আর ওর প্রসঙ্গই তোলে না।

চেনা ঘর-বর-কনে, লাখ কথার মাত্র গোটাকতক খরচ হল। বেশি দিনও লাগল না। একদিন জেলা বোর্ডের রাস্তার এপারে-ওপারে শাঁক বাজিয়ে বিয়েটা হয়ে গেল। বোসেদের বাড়ির পেয়ারাতলার খেলাঘর চেহারা পালটে মিস্তিরদের বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠল।

অবশ্য ওদেরটাই। অনেক আগেই পেয়ারাতলা থেকে মিটে গিয়ে যেটা হয়তো মনে মনেই ছিল ওদের। তবে পেয়ারাতলা কখনও খালি হবার নয়। সে চিরন্তন। একদল গেছে, এখন আর একদল দখল করেছে এসে। চিনু-চপিদের প্রতিভূ হয়ে এসেছে তুটুন, সমী, বেলা, অম্বর আর রতন। বেলা আর অম্বর এই দিকে। বাকি ওরা তিনজন মিস্তিরবাড়ির। আরও আছে সব। তবে সবাই যে আসেই রোজ এমন নয়। খেলা রকমারি। স্কুল-পাঠশালা আছে, যাত্রা থিয়েটার আছে, পূজা আছে, পঠন আছে। আছে বিয়েও। জিনিসটার মধ্যে দর-কষাকষি, তত্ত্বতাবাস নিয়ে বেয়ানে বেয়ানে চিপটেন কাটা প্রভৃতি বৈচিত্র্য থাকায় বেশ রুচিকর। তবে বেশি হয় না। প্রথমত, ও-খেলাটা বড়রা বেশি পছন্দ করেন না, আরও তো আছে খেলা। দ্বিতীয়ত, ধারাল ঠোঁটওলা একজোড়া বেয়ান থাকা চাই, তুতি, যমুনা, আহু এই তিনজনের অন্তত দুজন নইলে জমে না। আর থাকা চাই তুটুন আর অম্বর।

বর-কনে হিসাবে তুটুন আর অম্বর আদর্শ। ফুটফুটে দেখতে, বয়সও সবার চেয়ে কম—তুটুনের বছর ছয়েকের কাছাকাছি অম্বরেরও বছর সাতের বেশী নয়। এই চেহারা আর বয়স নিয়ে আরম্ভ, তারপর অভ্যাস বশে পোক্তও হয়ে উঠেছে—শান্তশিষ্ট, অল্পভাষী, যেখানে অল্প একটু হাসবার হেসেও দেয়, বেশি কিছু বলে দিতে হয় না, যা করবার করে যায়।

অবশ্য কলের পুতুলের মতোই, নইলে বর-কনে কি জিনিস, বিয়েটাই বা আসলে কী, সে সম্বন্ধে জ্ঞানটা অত্যন্ত ধোঁয়াটে। বয়সের জন্যই। মোটামুটি একটা জ্ঞান আছে—তার মধ্যে কোনটা বিয়ে, কোনটা দুর্গা-কালীপূজা, কোনটা সাধ, কোনটা শ্রাদ্ধ, গুলিয়ে ফেলে। আলো বাজনা, লোকের যাওয়া-আসা, তারপর কলাপাতে খাওয়া, মাটির গেলাসে জল, সব মিলিয়ে সবগুলোকেই যেন এক করে রেখেছে। খাওয়া, তা-ও হয়তো ঘুমের ঘোরেই; দেখল তা-ও হয়তো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কোন রকমে একটু, খেলতে খেলতে ছুটে গিয়ে।

এইবার একটু সুযোগ হয়েছে। আর সে সুযোগও যে এমনভাবে হবে, কখনও ভাবতে পারেনি তুটুন। ক'দিন থেকেই বাড়ীতে হৈ চৈ যাচ্ছে, তার নিজের দিদিরই বিয়ে। এবার ধারণাটা অনেকটা স্পষ্ট। এ-বাড়ি ও-বাড়ির বিয়ে যেন অনেকটা খেলাঘরের মতোই, তাই বোধহয় বুঝতে অতটা বেগ পেতেও হচ্ছে না। মিলেও যাচ্ছে খেলাঘরের সঙ্গে। পরশু ওদের বাড়িতে আশীর্বাদ ছিল চিনুদার —চিনুদার সঙ্গেই চপুদিদির বিয়ে, এ-ও এক মজার কথা। কাল ছিল এদের নিজেদের বাড়িতে চপুদিদির আশীর্বাদ। দুটোই ভাল করে দেখেছে তুটুন। আজ সকালে গায়ে হলুদ। এর কাপড়ে, ওর গায়ে, তার চুলে—হলুদে হলুদে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল দুটো বাড়ি, রাস্তা পেরিয়ে ছুটে ছুটে দেখেছে তুটুন। বিয়ের চেহারাটা এবারে পূজা-সাধ-শ্রাদ্ধ থেকে বেশ আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদেরই বাড়ি তো! তারপর আবার নিজেও পড়ে গেল ওর মধ্যে!

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছিল, কদিন হুড়োহুড়ি গেছে, আজ আবার রাত জাগতে হবে, গা ঠেলে ডেকে তুলে দিল—"ওরে তুটুন, ওঠ!…ওঠ নারে তুটুন। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে ছাখো! তোর যে বিয়ে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তুটুন, জিজ্ঞেস করল—"চপুদিদি করবে না?"

ঘর ফাটিয়ে হাসি উঠল—বড়দিদি, সেজ বৌদিদি, মাহুদিদি, ও পাড়ার সিধু-পিসি। মাহুদিদি চোখ বড় বড় করে বলল—"ভেতরে ভেতরে মতলবখানা ছাখো একবার, দিদির বরের ওপরই তাগ!"

আরও কে কিসব বলল গোলমাল করে। খুব একটা হাসি উঠল। বড়দিদি কোলে তুলে নিয়েই বলল—"চল, দিদিরও হবে, তোরও হবে।"

সাবান মাখিয়ে ধুয়ে-মুছে ওপরের ঘরে নিয়ে গেল ওকে। দিদিকে সাজাচ্ছে, পাশে বসিয়ে ওকেও সাজাতে লাগল। দিদির মত করেই, চোখে কাজল, ঠোঁটে রং, মুখে খড়কে দিয়ে কনেচন্দনের ফোঁটা, পায়ে আলতা, হাতের তোলায় রং, দিদির খোঁপায় জরির ফিতে জড়ানো, ওর চুলেও জরির ফিতের ফুল। গলায় মালাও একটা।

একঘর মেয়ে, সাজাতে সাজাতে গল্পও হ'চ্ছে—"এ বেশ দিব্যিটি হল—খেলাঘরের বর কনে, তেমনি আবার নিদ-বর নিদ-কনেও পেয়ারাতলার খেলাঘর থেকে আমদানি হল…হ্যাঁ, অম্বরই তো নিদ-বর হল ওদিকে। চিনুর পিসতুতো ভাই বিকুকে ঠিক করা হয়েছিল, বাইরে থেকে আসছে তাকেই সাজিয়ে-গুজিয়ে করবে। সে কলকাতার ছেলে, এসব অত বোঝে না তো…একটু বড়-সড়ও, লজ্জায় কি ভয়ে বলা যায় না, একেবারে গা-ঢাকা দিলে—খোঁজ খোঁজ—খানা-

ডোবার জায়গা—শেষে ইস্টিশন থেকে ধরে নিয়ে এল।…ভালই হয়েছে বাপু, ছেলেটা বড়ও ছিল। মনে হয় সব যেন বোঝে, মুখ খোলা যেত না বাসরে…"

খুব হাসছে সবাই, প্রায় সব কথাতেই হাসি। মাসুদিদি সাজাতে সাজাতে মুখটা হাতের তেলোয় তুলে ধরে বলল—"হ্যাঁ রে, তুইও পালাবি না তো?"

তুটুন ঘাড় নেড়েই জানাল—না, পালাবে না।

আবার একটা ছাত-ফাটানো হাসি উঠল। তার মধ্যেই সেজ বৌদিদি বলল —"ও ঘাঘি মেয়ে, পালাবে? বলে উল্টে দিদির বরকে বেহাত করতে চায়!"

হাসি, হাসি আর হাসি।

এই হাসিই চারিদিকে ছড়াতে ছড়াতে কখন্ একসময় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। একটা গোলমাল—"ওরে, বিয়ে হয়ে গেল এবার বাসরটা ঠিক করে ফ্যাল।… বাইরে থেকে বরাসন, ফুলদানি সব নিয়ে এস।…নিদ-বর তো রয়েছে, নিদ-কনে কোথায়? সে এবার ভাগলো নাতো? ছাখ্ ছাখ্!"

ছাতের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তুটুন বেলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখছিল, বড়দিদি দাঁড করিয়ে গেছে,…রত্নুর দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে উঠতে উঠতে বলল— "সে আগে থাকতেই এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে; জাননাতো ওকে।"

হাসি, তার পেছনেই বর-কনে আর নিদবরের বেশে অম্বর। অম্বরকে সাজগোজ করা এই প্রথম দেখল তুটুন। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে, ইচ্ছে করছে গিয়ে কথা কয় ওর সঙ্গে, কারুর সঙ্গে আজ কথা কইতে পারছে না তো ভাল করে। একবার একটু কাছাকাছি হয়ে পড়ে কইতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চপুদিদির দিকে নজরটা ভাল করে যেতে থেমে গেল। এক-গলা ঘোমটা, ঘরের আর সবাই কথা কইছে, ওর মুখে একটিও কথা নেই। ক'নে হলে তাহলে নিশ্চয় কথাও বারণ, নিদ-কনেরও তাহলে নিশ্চয় তাই। অম্বর বরং ওকে দেখে একটু হাসল, তুটুন মুখ ঘুরিয়েই নিল, একটু যেন ভয়েই। এখনই হয়তো ধমক খাবে কারু কাছে।

এর পরেও দেখল তাই।

অম্বর গিয়ে চিনুদার ডানদিকে বসল, তুটুনকে বসিয়ে দেওয়া হল চপুদিদির বাঁ-দিকে। এরপর ঘরের মধ্যে কত হাসি হল, গান হল, নাচ হল, নাচল চিনুদার পিসতুতো বোন, যে কলকাতা থেকে এসেছে। সবাই কথা কইল, চিনুদাদা তো গান পর্যন্ত গাইল, কথা কইল না শুধু চপুদিদি।

তাই কথা কইতে পারল না তুটুনও।

কত রাত পর্যন্ত চলল।…আর তেমন ভাল লাগছে না তুটুনের। বড় ঘুম

পাচ্ছে···আর তত খারাপও লাগছেনা আগের মত···অনেক দূরে কোথা থেকে মিষ্টি গান, মিষ্টি বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে···বোধ হয় চিনুদাদার বাঁশি—মামাবাড়ি থেকে শিখে এসেছে—কালো ছোট্ট বাঁশি একটা···সুর বাঁশি সব মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে···ঘুমিয়ে পড়েছিল তুটুন, চপুদিদির পাশে যে রাঙা নরম বালিশটা, বসে বসে যেটাতে হাত বুলোচ্ছিল, সেইটেতে কখন্ মাথা দিয়ে। যখন ঘুম ভাঙল, দেখে ঘর প্রায় খালি, রয়েছে শুধু চিনুদাদা, চপুদিদি আর তিন জন। তার মধ্যে চিনল শুধু চিনুদাদার পিসতুতো বোনকে, যে কলকাতা থেকে এসেছে আর নেচেছিল। এরা তিনজনেই ঘুমুচ্ছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে। বাড়িতেও আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

জেগে আছে শুধু চিনুদাদা আর চপুদিদি। কথাও কইছে খুব আস্তে আস্তে তবে একেবারে ফিসফিস করেও না।···চিনুদাদা বলল—"এবারে তুমি ঘুমোও, আমি চুলে হাত বুলিয়ে দিই।"

চপুদিদি বলল—"ধ্যেৎ।"

ভয় করছে তুটুনের। বালিসের আড়াল থেকে একটু একটু দেখছিল, খুব টিপে চোখ বুজে ফেলল।

এরপর যখন আবার ঘুম ভাঙল তখন এরা দুজনেও ঘুমিয়ে পড়েছে, সমস্ত ঘরটায় একটানা নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন আর কোনও শব্দ নেই।

চিনুদাদার ওপাশে, তুটুনের মতই রাঙা নরম বালিশটায় মাথা দিয়ে অম্বরও ঘুমুচ্ছে। সেই যে খুব গোলমাল-হাসি-গানের মধ্যে তার ভাল লাগছিল না, সে ভাবটা আর নেই তুটুনের। তারপর একবার উঠে চিনুদাদা চপুদিদির কথা চুপিচুপি শুনে যে ভয় করেছিল, সে ভাবটাও আর নেই। চারিদিক চুপচাপ, বাইরে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে। বেশ চমৎকার লাগছে ঘুমন্ত চিনুদাদা আর চপুদিদিকে। যতক্ষণ জেগেছিল, দুজনকে ভাল করে দেখতেও পারেনি তো। সাজগোজ, চন্দনের ফুটকি, গলায় জরি-দেওয়া মালা—কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে, যেন চোখ ফেরাতে পারছে না তুটুন। চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিল নিশ্চয় চিনুদাদা, হাতটা চপুদিদির মাথার কাছেই বালিশের ওপর পড়ে রয়েছে ওর খোলা মুকুটের পাশে।

তারপরই অম্বরের ওপর নজরটা গিয়ে পড়ল, সে ওপাশ থেকে এপাশে ফিরে যেতেই। আরও যেন চোখ ফেরানো যায় না। ধুলো-বালি-নোংরা-গেনজি-হাফ প্যান্টে যে অম্বর পেয়ারাতলায় বর সেজে এসেছে এতদিন! যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তুটুন। কী যে মনে হচ্ছে যেন বুঝতেও পারছে না।

তারপর দেখে দেখে এক সময় আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে চিনুদাদা আর চপুদিদির বালিশের পাশ দিয়ে ওদিকে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ভয় ভয় করছে এবার, চিনুদাদা একটু নড়েও উঠল। থমকে দাঁড়াল তুটুন, একটা আঙুল কামড়ে ওর দিকে চেয়ে। তারপর আবার এগুল পা টিপে টিপে। হাঁটু গেড়ে বসল অম্বরের পাশে। তারপর বারদুই হাতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার টেনে নিয়ে শেষে কাঁধটা চেপে একটু নাড়া দিতেই অম্বর উঠে পড়ে ঘুরে চাইল। ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে চুপ করতে ইশারা করল তুটুন, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলল—"বিয়ে করবি রে অম্বু?"

সদ্য ঘুম ভেঙে একটু ধাঁধা খেয়ে গেছে। অম্বর একবার ওদের দুজনের দিকে, তারপর সমস্ত ঘরটার দিকে বিমূঢ়ভাবে চাইছিল, তুটুন আবার প্রলুব্ধ করে বলল—"সত্যিকারের বিয়ে। এই চিনুদাদা আর চপুদিদির মতন? তা হলে আয় এই পাশের ঘরে। এখানে দেখে ফেলবে সবাই।"

ভোরে একটু হৈ চৈ উঠতে যাচ্ছিল, বর কনেকে তুলতে এসে। বরের টোপর কোথায় গেল? কনের মুকুট? এ কি অলক্ষণ! ভাল ক'রে বেড়ে ওঠবার আগেই নজর পড়ে গেল পাশের ঘরে কোণের দিকটায় ওদের দুজনের ওপর। মুকুটটা তুটুনের মাথায় তখনও আটকে আছে। টোপর অম্বরের মাথা থেকে একটু দূরেই। মালা দুটোও চিনল সবাই। তুটুনেরটা অম্বরের গলায়—অম্বরেরটা তুটুনের।

দুজনে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

স্মৃতিমাত্র

পরিবারটি একটু বড়, তাই শিশু প্রায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তাকে নিয়ে আদরের কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়ে যায়। ষষ্ঠীসেটেরা, শুদ্ধি-অশুদ্ধি, এই সবের দোহাই দিয়ে বাড়ির গিন্নিরা ছোট বড় ছেলে মেয়েদের ঠেকিয়ে রাখে, বড়দের কি করে এঁটে উঠবে? ছোটকাকা ডাক্তার, তার না আছে শাস্ত্রের বালাই, না আছে শুদ্ধি-অশুদ্ধির, একটি শিশু হোল, তারপর প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত তার অতি সূক্ষ্ম দেহযন্ত্র নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল—এর বিস্ময়, এর কৌতূহল

তাকে আঁতুরঘরে টেনে নিয়ে আসে। ওর নিজের মধ্যেও চলে একটা সুখ-স্বপ্নের খেলা—এই বিস্ময়, এই কৌতূহলই গিয়ে দাঁড়ায় স্নেহে, ডাক্তারকে সরিয়ে কাকাই পূর্ণভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, স্নেহের দিক থেকে দেখতে গেলে শিশুর মায়ের পরেই নিবিড়তম সম্বন্ধ দাঁড়ায় ঐ কাকার সঙ্গে, তার বাবাও পড়ে যায় খানিকটা দূরে।

আরও সব আছে। মেজকাকার কাছে সমস্ত জীবনটাই বিস্ময়কর ব'লে একেবারেই গোড়া থেকে পরম কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এর দিকে—সুপ্ত চেতনার ঘুম ভেঙে আমাদের জগতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠা—কবে ঠোঁটের কোণে হঠাৎ একটু হাসি ফুটে সঙ্গে সঙ্গেই গেল মিলিয়ে, কবে সেটুকু একটু স্থায়িত্ব পেলে, কখন হাসিতে অশ্রুতে মাখামাখি হয়ে একটি ক্ষণিক শরৎ-মধ্যাহ্ন হল রচিত—তারপর ফুটল উষার কাকলি—জীবনকে অনুভব করছে শিশু, অনুভব করবার তন্তুগুলি ধীরে ধীরে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ছে—আলো দেখলে চোখে আলো ফোটে, অন্ধকারে আতঙ্ক; মিষ্টি ডাকে হাসি ফোটে, ধমকের ভান করলেই ঠোঁট ফোলে, ভুরু দুটি কুঁচকে ওঠে, নীল চোখ দুটি নীল পদ্মের মতোই জলে থাকে ভাসতে।...কত শিশু এল, কিন্তু দেখে দেখেও অন্ত পাওয়া যায় না রহস্যের। যেন একখানা বই, কিন্তু কী সে মায়া-রচনা, যত পড়ে ততই নূতন।

আদরের কথা হচ্ছিল। একটু একটু করে যেমন বড় হয় চারিদিককার আদর যেন উচ্ছলিত হয়ে পড়তে থাকে, যাদের শুচিবাই তফাৎ করে রেখেছিল, তারাও এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়। শিশু ধীরে ধীরে নব নব মায়া বিস্তার করতে থাকে; কবে দুটি দাঁত হোল, তার নূতন হাসি, কবে পা হোল, তাঁর আনন্দে মাতাল হয়ে চলা, তারপর ক্রমে আরও কত নূতনের মিছিল—অমোঘ আকর্ষণে সবাইকে টানে শিশুর দিকে, কাজ ভুলিয়ে দেয়, আরাম ভুলিয়ে দেয়।

ওকেই কি কম দণ্ডটা দিতে হয় এই মায়া বিস্তারের অপরাধের জন্য? এক কাকা থেকে ফুরসৎ হোল তো আর এক কাকা, কাকি শুইয়ে দিয়ে গেল তো মাসি তুলে নিলে, একজনের সঙ্গে হাসির হুল্লোড় শেষ হোল তো একজনের সখ হল বকাবকি কান্নাকাটির অভিনয় করবার; একজন লোফালুফি করে পরিশ্রান্ত করে দিয়ে যাচ্ছে, আর একজন এসে সন্ত সন্ত তার কোল থেকে নিয়ে শুরু করে দিলে আদরের নিপীড়ন। ঘুমের মধ্যে থেকেও তুলে নিয়ে আদর করবার অত্যাচার আছে, দুধের বাটি সরিয়ে নিয়ে তামাসা দেখার মতো লোকের অভাব নেই।...আদরের উপদ্রবে সারাদিনই হচ্ছে নাকাল।

তারপরেও আদরের স্রোত গড়িয়ে চলে। অর্ধস্ফুট নূতন বুলির মধ্যে পুরনো ছড়া কিম্বা চলতি গানের মধ্যে যখন নূতন সুর ঢেলে দেয় শিশু—আসরে আসরে গায়কের পড়ে ডাক, টানাটানি কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।···আদরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে লোফালুফি হয়ে এগিয়ে চলে শিশু।

কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত, তারপরেই সব যেন যায় উলটে।

মোনুর সময়টা একটা সাদা দাগ কেটে এসেছিল ঐ বহু-আকাঙ্ক্ষিত হাতে-খড়ির দিনটি। ঐটিই যেন জীবনের শেষ আনন্দের দিন, তারপরেই এল পড়া; আর সে যখন তখন যা খুশি বই নিয়ে পড়া নয় যাতে খোকার পড়া দেখবার জন্য সবাই ভিড় করে এসে জুটত। এ নূতন পড়ার সামনে আছে ঝাপসা চোখ, পেছনে মায়ের, বাবার, কাকার, দাদার রুক্ষ দৃষ্টি। কেমন করে যে গেল বদলে বুঝতে পারেনা মোনু। ঐ ছোটকাকা, অত তো ভালোবাসত, এখন পড়া নিয়ে আর সবার মতো অত কড়াকড়ি না থাকলেও আর সব নিয়ে রয়েছে, যে সবের সঙ্গে মোনুর বেশি সম্বন্ধ—রোদ, জল, মুক্ত আনন্দে একটু ছুটোছুটি, অসুখ হ'লে অসুখেরই ইচ্ছা মতো দুটো কিছু খাওয়া! ক্রমাগতই টিকটিক করবে ছোটকাকা, ওরই ছিল সবচেয়ে নেওটা, এখন ওকেই ভয় করে সব চেয়ে বেশি। মেজকাকার আছে আইন কানুনের কড়া শাসন— অতো হেসো না, অত জোরে কেশো না, পড়তে ব'সে চারিদিকে চাওয়া কেন?··· 'তুই' বললে? দাদা হয় না?—এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি?

মোনু তো বিদ্যের জন্যে আর তত লালায়িত নয়। কিন্তু কি করে বলে সে কথা? কেই বা বোঝে?

নূতনতম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়েছে, ইস্কুলের পাঁচটি মাষ্টারে। যেদিন প্রথম গেল ইস্কুলে বেশ লেগেছিল, হাতে-খড়ির দিনের মতোই। হেডমাষ্টার মশাই পিঠে হাত দিয়ে কত মিষ্টি করে কত কথা বললেন। তারপর এখন—বাড়ি যেন তবু ঢের ভালো!

ক্রমে এই জীবনই সহজ হয়ে এসেছিল; তারপর আজ ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে যেটুকু আদর ছিল এখানে-ওখানে লুকিয়ে—এর একটা কথায় ওর একটা হাসিতে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত, সেটুকুও যেন যেতে বসেছে।

কদিন হ'ল খোকা এসেছে মামার বাড়ি থেকে। মোনুর ছোট ভাই খোকা, ওতো মামার বাড়িতেই জন্মালো, কত মন কেমন করছিল মোনুর খোকার জন্যে; একে তো কখনও দেখেনি, তার ওপর খোকা জন্মেই মোনুকে দাদা করে

দিয়েছে! কত যে মন কেমন করছিল ছোট ভাই খোকার জন্যে!

আর কী চমৎকার যে হ'য়েছে খোকা! রাঙা রাঙা ঠোঁটের মাঝখানটিতে চারটি দাঁত, ওপরে দুটি নীচে দুটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো কালো চুল, ছোট কাকার ঘরে টাঙানো বিস্কুট হাতে করা খোকার মতোই মোটা সোঁটা, ধবধবে, নরম তুলতুলে। ঘাঁটতে যে কী ভাল লাগে! মা বলেছে এবার তো এখানে এল, এইবার মোন্নুকে দাদা বলবে।

যত ঘাঁটতে ইচ্ছে করে ততই ঘাঁটতে পায় কৈ মোন্নু? একে তো বেচারার বাড়ির মাষ্টার মশাই থেকে, স্কুল থেকে ফুরসৎ নেই, যদি বা হোল খোকা নেই খালি—হয় ছোটকাকার কোলে, না হয় বড়দার কাঁধে। হয় ছোটদি দিচ্ছে দোল, না হয়, কাকিমা করছেন লোফালুফি। ছোটদের কারুর কোলে থাকলে আরও পাঁচজন ছোটর মত মোন্নুরও হয় একটু সুবিধা। কেউ হাতটা টিপল, কেউ পা'টা, কেউ চুলে হাত বুলল, কেউ নরম পেটের ওপর; মোন্নুর থাকে সাদা ঝিকঝিকে দাঁত দুটির ওপর নজর। কিন্তু হ'লে কি হবে, অত ভিড় পড়ে যায় বলেই বড়-দের কেউ এসে নেয় কেড়ে—

"শেষ করলে ছেলেটাকে···থাবলে খুবলে সাবাড় করে দিলি তোরা, দে আমায়···"

মোন্নুর সবচেয়ে সুবিধা হয় খোকা যখন থাকে মায়ের কোলে। মা অনেক কথা বলেন মোন্নুকে পাশে বসিয়ে—খোকা কথা কইতে শিখেই আগে কেমন মোন্নুকে 'দাদা' বলতে সুরু করবে; মোন্নুই তো খোকার ঠিক ওপরে, মোন্নুই তো সবচেয়ে কাছের দাদা। খোকাকে একবার মোন্নুর কোলেও তুলে দেয় মা। কিন্তু মা বেচারিই বা পায় কতটুকু খোকাকে?—সেই তো কখন্ একটু দুধ খাওয়াবার সময় কি কোলের ওপর শুইয়ে কখন্ একটু কাজল পরাবে, পাউডার মাখাবে খোকাকে। তাতেও তো টানা-টানি কাড়াকাড়ি, দিদিদের কেউ এসে বলবে—"তোমার কর্ম নয় কাকিমা, দাও আমায়, কি চমৎকার ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছি দেখো!"

এক এক সময় রাগ হয় মোন্নুর, এক এক সময়ে আবার কেন যে কান্না ঠেলে আসে ঠিক বুঝতে পারেনা। ওর মনে হয় খোকার ওপরও ওর রাগ হয়েছে। যেমন খুব ভালোবাসে তেমনি আবার একেবারেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে না ইচ্ছেটা যে ঠিক কি করে ভালো ক'রে বুঝতে পারেনা মোন্নু। কেবলই মনে হয় ও কেন সর্বদা সবার কোলে গিয়ে ওরকম করে খিলখিলিয়ে হাসবে? না হাসলে, না কথা কইলে মুখে আঙুল দিলে কুটুস ক'রে কামড়ে হেসে না গড়িয়ে গেলে তো ওকে কেউ নিয়ে

অত কাড়াকাড়ি করতে যায় না। তাহলে তো সারাক্ষণ মোন্নুর কোলেই থাকতে পায়। আড়াল থেকে দেখে মোন্নু, কিছু করতে পারে না, কিছু বলতে পারে না ব'লে কান্নায় ওর গলাটা টনটন করতে থাকে। এই সময় যদি মায়ের কাছে চলে যায় খোকা, মা ডাকে "মোন্নু আয়, তোর ভাইটিকে নিবি"—মোন্নু যায় না—রাগে আর ক্ষিদে গলাটা তার আরও টনটন করতে থাকে।—নেবে না তো অমন ছোট ভাইকে, দাদাও বলতে দেবেনা কখনও।···

শুধু খোকার ওপরই হয় না রাগ, আর সবার ওপরও হয়, খুব বেশি ক'রে ; সব চেয়ে বেশি ক'রে হয় ছোটকাকার ওপর। আর কেউ ডাকলে যদিও বা কথা কয়, ছোটকাকা ডাকলে কোন মতেই যাবে না, একটিও কথা কইবে না।

যাবে না, কথা কইবে না বলেই দোরের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোটকাকা রোগীদের দেখছে, কি সব লিখছে। আবার দেখছে, আবার কি সব লিখছে। দেখে, কিন্তু ডাকে না মোন্নুকে।···ভালই হোল, ডাকলে কি যেত মোন্নু?···ফিরে আসে, শুধু প্রথম দু'চার পা ফিরে আসবার সময় কেমন লজ্জা লজ্জা করে, তারপর কাকা যখন আর দেখতে পায় না, তখন লজ্জাটা আর থাকে না। তার জায়গায় গলাটা শুধু আবার সেইরকম টনটন ক'রে ওঠে।

আজ ছিল ছুটির দিন। ক'দিন থেকে মোন্নু চেয়ে কাটাচ্ছিল এই দিনটির পানে—বাড়ির মাষ্টারমশাই, স্কুলের মাষ্টারমশাইরাও নেই কেউ, বেশি গাছপালা থাকে না ব'লে খেলার মাঠটা যেমন আলো-আলো দেখায়, ছুটির দিনগুলোও মোন্নুর ঠিক সেইরকম মনে হয়। কিন্তু আজ কি হয়েছে, সমস্ত দিনটাই নিজে যেন মাষ্টারমশাই সেজে এসেছে।···সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে গেল, সে-সময় আর কারুর ঘুম ভাঙেনি। এই সময়টা রোজই একবার করে ঘুম ভাঙে, কেননা খোকা উঠে খেলা করে। অন্য অন্যদিন উঠলেই পড়ার কথা মনে হয় বলে মোন্নু আবার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, আজ খোকার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খেলা করল, খোকা দু'দিন থেকে দাদার একটা 'দা' বলতে আরম্ভ করেছে, সেইটেকে দুটো 'দা'-য়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে মোন্নু।

আবার কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল, মেজকাকার গলার আওয়াজে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। চেঁচাচ্ছেন—"স্কুল নেই বলে আজ আর উঠতে হবে না? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ কটা বেজেছে···সাতটা বেজে গেল এখনও বাবুর ঘুম। এইটুকু ছেলে এত আয়েসী। মায়েও দেখবে না, বাপেও খোঁজ রাখবে না, বিদ্যা যা হবে বুঝতে পারা যাচ্ছে।···বলি ওঠো দয়া করে।"

অন্যদিনের মতো আজ ইচ্ছে করে ঘুমোয়নি মোমু, কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল জানেও না। কিন্তু সে কথা বলে কাকে? মেজকাকার কাছে আগে যেমন সব কথা বলা চলত তেমনি আজকাল একটি কথাও বলা যায় না।...উঠেই শাস্তি হোল দেরী করে ঘুমিয়ে থাকবার জন্যে আজ সকালে পুরো ছুটি নয়, চারপাতা হাতের লেখা ক'রে দেখাতে হবে। কোলে খোকা ছিল, আদর করতে করতে চলে গেলেন মেজকাকা।

খাবার একটু আগেই, একটু খেলেটেলে বাড়ি ঢুকবে, ছোটকাকা খোকাকে আদর করতে করতে বেরিয়ে আসছেন। একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কানটা ধরলেন।—

"হুড়োহুড়ি ক'রে মুখ যে রাঙা হয়ে উঠেছে; এটা কী খেলবার সময়?"

মোমু বললে—"ওরাও খেলছিল সবাই।"

কানটা নেড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন ছোটকাকা—"বেশ ক'রেছে ওরা। আবার নালিশ! ওরা পাঁচদিন আগে জ্বর থেকে ওঠেনি। যাও, ঢকঢক করে জল খাও, তারপর আবার পড়ো!...ওরাও খেলছিল!"

কানটা আরও দুবার ভালো করে নেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মা যেন তোয়ের হ'য়েই ছিলেন, ভেতরে পা দিতেই হাতটা ধরে উঠোনের মাঝখানে টেনে নিয়ে গেলেন, চড় তুলে বললেন—"দিই বসিয়ে? কোথায় ঘুরছিলি এতক্ষণ টো টো করে?...স্কুল নেই বলে আজ নাওয়া-খাওয়া করতে হবে না, না?"

জ্যাঠাইমা বললেন—"হ্যাঁ, মেরে ফেলো সবাই মিলে তোরাই এক ছেলে মানুষ করতে শিখেছিস্ তো, আর কেউ তো শেখেনি..."

"ও আমাকে আজ সকালবেলা বকুনি খাইয়েছে, দিদি। আমি সেই থেকে ওকে খুঁজছি।

"তা খুঁজবি। যে বকলে তার তো কিছু করা যাবে না। কী, না, একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে, ছুটির দিন সব ছেলেই করে গড়িমসি একটু।...নিয়ে আয় তেলের বাটিটা, নেয়ে খেয়ে নে, নয় তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খা মার।"

মায়ের হিড়িকটা কমের ওপর দিয়েই কেটে গেল। কিন্তু মা একটু বললেও যে কত বেশি কষ্ট হয় তা তো বোঝেন না। জ্যেঠাইমা যদি অমন করে ডেকে না নিতেন তো কখনই আজ নাইত না খেত না মোমু।

এরপর আর একবার ছোটকাকা, এবার কবে পেটের অসুখ হয়েছিল তাই নিয়ে;

তারপর বিকেলবেলা নতুনদা।

নতুনদার ছিল নিজের কাজ, এক গ্লাস খাবার জল আনতে বলেছিল। নতুনদার জল আনতে হয় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তারপর পরিষ্কার গামছায় হাত পুঁছে। মোহু ভেতরে গিয়ে দেখে সবাই খিড়কির দোর দিয়ে খেলতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াতে বললে, রাস্তা দিয়ে একলা গেলে আবার মেজকাকা বড্ড রেগে যান। কে দাঁড়াবে? সাবান খুঁজে পেতে হাতটা পর্যন্ত ধুয়েছিল, তারপর ওরা অনেক দূরে চলে গেল বলে আর দাঁড়াতে পারল না মোহু।

সন্ধ্যার একটু আগে নতুনদাও যখন খেলা থেকে ফিরল, ডেকে পাঠাল মোহুকে।

"তোমায় না তখন এক গ্লাস জল আনতে বলেছিলাম? এনেছিলে?"

মোহু বলল—"আমি যখন সাবান দিয়ে হাত পর্যন্ত ধুয়েছিলাম, তারপর ওরা কেউ দাঁড়াল না।"

"দাঁড়াল না মানে?—অন্ধকার রাত্তির ছিল?"

"খেলতে চলে গেল সবাই।"

"একজনের খেলা বড়, না, একজনের তেষ্টা বড়?"

নতুনদা কানটা মুচড়ে ধরল।

"কথার ওপর কথা তো বেশ কইতে শিখেছ!

"একজনের তেষ্টা বড় তো জলটা দিয়ে যেতে কি হয়েছিল? তেষ্টায় যে মানুষে অজ্ঞান হয়ে যায়, সেটা জানা আছে বাবুর?"

হাতের পাকটা শেষ হতে নাহতেই এক চড়। সঙ্গে সঙ্গেই আবার কানটা ধরে—"চললে তো নালিস করতে ছোটকাকার কাছে?"

মোহু ঘাড় নেড়ে বললে—"না।"

মোহু গিয়ে সদর দরজার চৌকির ওপর চুপ করে বসে রইল। সকাল থেকে একটি একটি কথা মনে হচ্ছে আর সেইরকম করে গলা টনটন করে উঠছে। কেউ ওকে দেখতে পারে না, মা থেকে নিয়ে নতুনদা পর্যন্ত, কেউ নয়।...রাস্তা দিয়ে একটা কাবুলিওয়ালা যাচ্ছে, কাঁধে একটা ঝোলা। ও এসে মোহুকে ঐতে পুরে নিয়ে চলে যায় তো বেশ হয়। 'কোথায় গেল মোহু? কোথায় গেল মোহু?' বলে কান্নাকাটি পড়ে যায় বাড়িতে। যাক না নিয়ে, মোহু একটুও চেঁচাবে না।

কাবুলিওয়ালাটা এধারেই আসছে। মোহু তাড়াতাড়ি উঠে ভেতর দিয়ে গিয়ে জানালার খড়খড়ির একটা পাস্ একটুখানি তুলে দেখলে—মা ছোটকাকা, বড়দা,

নতুনদা, সেজদি—খোকা মায়ের কোলে, ছোটকাকা আদর করছে, এরা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে, হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে খোকাকে নতুন জামা পরে, ইচ্ছে করছে সেও ভেতরে চলে যায়। কিন্তু কেমন একটু লজ্জালজ্জা করছে; আর একটু একটু সেই রকম কান্নার মতো হয়ে আসতে, আর গেল না। ছোটকাকা আদর ক'রে চলে যেতে বড়দা মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে লুফে লুফে একটু খেলা করলে। সেও চলে গেল, তারপর সেজদিদি, তারপর নতুনদাদা। ওরা সবাই যখন চলে গেল, মা একলাই খোকাকে কোলে পেয়ে আদর করতে লাগলেন। কাজল পরালেন, টিপ পরালেন। মোন্নু দেখেছে, খোকাকে যখন সবাই মিলে আদর করে আর তারপর মা একলা পান, তিনি আরও বেশি বেশি ক'রে আদর করেন, মুখের দিকে বেশি বেশি ক'রে চেয়ে থাকেন, বেশি বেশি ক'রে চুমো খান।...মোন্নুর যে কি রকম বোধ হতে লাগল, বুঝতে পারলো না। কাজল আর টিপ পরিয়ে মা যখন পাউডারের ডিবেটা খুলছেন, মোন্নু খড়খড়িটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে সেই রকম চুপিচুপি সরে এল। একবার [illegible] হল—সেই যেমন বসেছিলুম সদরে গিয়েই বসি। তারপর খোকাকে ভয়ানক দেখতে ইচ্ছে হোল, ভেতরে গিয়ে—নিজেদের ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

মা যে দ্যাখে সেটা মোন্নু চাইছিল কি চাইছিল না ঠিক বুঝতে পারছিল না। মা কিন্তু দেখেই ফেললেন—সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে বললেন—"এই মোন্নু যে, কোথায় ছিলি? এদিকে আয়।"

মোন্নুর সেই গলার টনটনে ভাবটা বেড়ে গেল, কিন্তু এদিকে খোকার কাছে দাঁড়াতে মা যেই তার নাম করে খোকাকে আদর করতে লাগলেন অমনি কমেও গেল সেটা। মা বলতে লাগলেন—"খোকার দাদা এ[illegible]—খোকাকে সবচেয়ে ভালবাসে খোকার মোন্নু দাদা—বড় হয়ে রোজগার করে খোকাকে আরও কত নতুন জামা কিনে দেবে—জামা, জুতো, কাপড়...না রে মোন্নু?"

মোন্নু এগিয়ে গিয়ে খোকার গায়ে হাত দিল, আদর করল। তারপর মা খোকাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে দুলে দুলে আদর করতে লাগলেন।

মোন্নুর আবার কি রকম কি রকম করে উঠতে লাগল মনটা—একটু লজ্জা-লজ্জা, আর সেই রকম গলার ভেতর একটু একটু টনটনানি।...সামনে থেকে আস্তে আস্তে মায়ের পিঠের কাছটায় স[illegible] গেল।...সকাল থেকে সবার অনাদরের সঙ্গে, কতদিন আগের ভুলে যাওয়া কত আদরের টুকরো-টাকরা যেন আবছায়া

স্বপ্নের মত একটু একটু মনে পড়ছে—এত আবছায়া যে, বিশ্বাসই হয় না—তার সঙ্গে আবার মায়ের এখনকার আদর। একটা প্রশ্ন ঠেলে আসছে, কিন্তু সেটাকে ঠিক রূপ দিতে পাচ্ছে না মোন্নু; তারপর দু'বার ঢোঁক গিলে মায়ের পিঠের কাছ থেকেই আস্তে আস্তে ডাকলে—"মা।"

খোকাকে আদর করতে করতেই মা উত্তর দিলেন—"কিরে মোন্নু?" গলার সেই টনটনানিটা আর একটু বেড়েছে, আরও দু'বার ঢোঁক গিলে সেটা যেই কমল. মোন্নু জিজ্ঞাসা করল.—"আমাকেও এইরকম ক'রে ভালোবাসতে?"

"ওমা! বাসতুম না? এই রকম করে বুকে চেপে…"—খোকাকেই দোল দিতে দিতে উত্তর দিচ্ছেন মা।

"সব্বাই মিলে?—তুমি, ছোট কাকা……"

গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতে মা ঘুরে দেখলেন, তারপরেই আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—"ওমা, তুই যে কাঁদছিস!……কাঁদছিস কেন মোন্নু?…ভালোবাসতুম? …সে কিরে মোন্নু! দেখো কাণ্ড! চুপ কর, ওকি!…"

—খোকাকে রেখে দিয়েছে মা; মোন্নু পিঠ থেকে লুটিয়ে মায়ের খালি কোলে গুঁজড়ে একেবারে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

গলার সেই টনটনানিটা কমে এসেছে, কিন্তু লজ্জা—তার সঙ্গে আরও কত সব কি যে এসে জুটেছে, মুখটা তুলতে কোনও মতেই দিচ্ছে না মোন্নুকে।

গিন্নী

মেয়ে দেখতে আসছেন পাত্রের জ্যাঠামশাই এবার।

এটা নিয়ে তিনবার হবে। প্রথমে দেখে গেছেন পাত্রের বাবা এবং মামা। বাবা মনে হলো একটু সাদাসিদে ঢিলেঢালা মানুষ, নিতান্ত নাকি ছেলের বাপ তাই এসেছেন। মামা কিন্তু এক্‌স্‌পার্ট মেয়েদেখিয়ে। সাধারণ প্রশ্ন এমনি যা সব, তা তো হোলই, তারপর অঙ্গাদি পরীক্ষাতেও বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। বাঁ হাতে ওর ডান হাতটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঙুলগুলি পরীক্ষা করলেন, পরে বাঁ হাতেরগুলিও। একটু ঘষে ঘষেই হাতের উলটো পিঠ, মণিবন্ধ পরীক্ষা করলেন, ত্বকের মসৃণতা দেখবার ছলেই অবশ্য, কিন্তু যারা বোঝবার তারা বুঝল, রং পাউডার

মাখানো হয়েছে কিনা তারই যাচাই। আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিল, পাদুটি জড়ো করিয়ে পা দেখলেন, আঙুল দেখলেন। খোঁপা বাঁধা ছিল, ভেতরে পাঠিয়ে খুলিয়ে আনিয়ে চুল দেখলেন। হেঁটেই এসেছে, তবু বিদায় দেওয়ার সময় বললেন—'অত লজ্জা করে হাঁটছ কেন মা যেমন চলা ফেরা করো বাড়িতে, সেই ভাবে যাও, লজ্জা কিসের?''

মেয়ে অবশ্য আরও জড়োসড়োই হয়ে গেল খানিকটা, তবে আর টুকলেন না। বারবার তো হল দেখা; চুল খুলিয়ে আনার মধ্যে চুলও ছিল, চালও ছিল। যারা বোঝবার তারা বুঝল, এলো চুলে এলে খোঁপা বাঁধিয়ে আনাতেন।

খলিফা লোক।

এরপর দেখে গেল পাত্র স্বয়ং এবং তার বন্ধু।

পাত্রটি বাপের মতো অতটা ঢিলেঢালা আর নির্বিরোধী হয়তো নয়, তবে জিজ্ঞাসাবাদের দিকে একেবারেই গেলনা। তার কারণ এও হতে পারে যে, তার সমস্ত সময়টা নির্লিপ্তভাবে কিছু-না-দেখার ভান করে যতটা দেখা যায়, সেই চেষ্টাতেই গেল কেটে। তবে বন্ধুটি খুব চৌকশ। পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করল, হাতের লেখা দেখল, হাতের কাজ আনিয়ে দেখল, ভেতরে পাঠিয়ে গান শুনে নিল, তারপর আবার এসে যখন বসল, বেশ একটু বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করল—'আবার ফিরে এলেন যে, এবার আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন?''

পাত্র হয়তো রসিকতাটুকু পছন্দ করল, তাকেও একটু হেসে উঠতে হোল, আর নিরীহ রসিকতাই তো। তবু কাকা সরে গেলেন, মুখ-আলগা আজকালকার ছেলে তো, একটু যাবেই জিভ ফসকে এরকম। সামনে না আসাই ভালো। মেয়েও হেসে ফেলেছিল, কোনও রকমে উঠে জড়িতপদে তাড়াতাড়ি চলে গেল। ছেলেটি হাল্কা আসরে একবার সবার দিকে চেয়ে নিয়ে হাত জোড় করে বলল—'আমায় মাফ করবেন, ছেলের ফরমাস ছিল হাসিটুকু পর্যন্ত দেখতে তাই...'

পাত্র কাঁকালে চিমটি কেটে ধরায়—'উঃ, রাস্কেল'! ব'লে চুপ করে গেল।

এবার আসছেন জ্যাঠামশায়। আসুন, মেয়ে থাকলে দেখানোর বিড়ম্বনা মাথা পেতে সহ্য করতেই হয়। কিন্তু এবার সবাই একটু বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, অত যে খুঁটিয়ে দেখা হল দু'দফা, তার নাকি কোনও মূল্য নেই, সব নির্ভর করছে জ্যাঠামশাই কী রায় দেন, তার ওপর। তিনি ছিলেন না, এসেছেন, এবার আসবেন।

মেয়ে-দেখার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আজকালকার অভিভাবকেরা এতটা

পছন্দ করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু আলাদা ব্যাপার হয়েছে। ছেলেটি খুবই ভালো, পরীক্ষা দিয়ে এবার ডেপুটি হয়েছে। এদিকে অভিভাবকদের শুধু ভালো মেয়ে দরকার, যতটা সম্ভব সুন্দরী, তারপর যতটুকু সম্ভব শিক্ষিতা। অন্যদিকে একেবারেই লক্ষ্য নেই।

সেটা যে নেই, তা খুব জানা কথা বলেই কন্যার অভিভাবকেরা অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছেন, এক শুধু মেয়ের জোরে। এমন কিছু দূরের ব্যাপার নয়, রিষড়া-শ্রীরামপুর তাও মাইল দুয়েকের মধ্যে দু'পক্ষের বাড়ি। খোঁজ নেওয়া সহজ, পাওয়াও গেছে অনেকখানি. তার মধ্যে এটা পাকাপাকি রকমই জানা গেছে যে, ঐ যে অন্য কিছুর দিকে লক্ষ্য নেই। সেটা শুধু মুখের কথাই নয়, সত্যিই দেখে শুনে গৃহস্থের বাড়ি থেকেই মেয়ে এনেছেন ওঁরা; যাদের এমনি ওঁদের বাড়ির ছেলের নাগাল পাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু খুঁটিয়ে দেখা শোনার পরও তিনি আসছেন কি করতে সেইটেই আন্দাজ করতে না পেরে সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ওঁদের দেখাশোনার একটা যেন বেশ প্ল্যান আছে, দু'ব্যাচ যেন দুরকম উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, ওরা যা জানতে চেয়েছিল, এরা সেদিকটা বাদ দিয়ে গেছে। এরা যেদিকটা ধরেছে ওরা সেদিক দিয়েই যায়নি। কিন্তু আর বাকিটা কি আছে যে, জ্যাঠামশাই ধরবেন? তাঁর প্রশ্ন কি ধরণের হবে? মেয়েকে সেই মতো প্রস্তুত থাকতে হবে তো! মেয়েরা আজকাল এসব পছন্দ করে না, কলেজের মেয়েরা তো নয়ই। কেউ কেউ বিদ্রোহই ঘোষণা ক'রে বসে বেশি বাড়াবাড়ি হলে। অন্তত আপত্তি অভিমান—এটুকু তো থাকেই। দু'দফা হল, আর কেন? অঞ্জলি তা করেনি। অবশ্য ওপরে ওপরে 'বেঁধে মারে সয় ভালো'—ভাবটা বজায় রাখতে হয়েছে, কিন্তু ভিতরে প্রস্তুতিটা অন্যরকম—যতবার চায়, যাক না পরীক্ষা ক'রে যত রকমে পারে।

পাত্র হেমন্তের মতো ও-ও তো না-দেখবার ভান করে চক্ষুময় হয়ে দেখছে, বড় ভালো লেগেছে। জ্যাঠামশাইয়ের চিন্তাটা ওর কারুর থেকেই কম নয়, পণ্ড ক'রে দেবে নাকি সব স্বপ্ন?

অনেক চেষ্টায় কিছু কিছু আঁচ পাওয়া গেছে। কথাটা যদি সত্যি হয় তো যেমন লঘু, তেমনি নিরীহ, চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। জ্যাঠামশাই হচ্ছেন পাঞ্জাব-প্রবাসী সেকেলে বাঙ্গালী। দেশ বিভাগের পর মীরাটে এসে থাকেন। তারপর অবসর গ্রহণ ক'রে এইমাত্র কিছুদিন হোল দেশে এসে বসেছেন।

এসেই এই ফ্যাচাংটুকু তুলেছেন।

তবে এমন বিশেষ কিছু নয়।

জ্যাঠামশাই একটু ভোজনবিলাসী, ওদিককার জলে এটা করেই দেয়। এসে একটু নিরাশ হয়েছেন। তিনটি বউ এসেছে বাড়িতে, এম-এ আছে, বি-এ আছে, রূপসী তো বটেই, গানও জানে, সূচীশিল্প তো আছেই। কিন্তু অবসরভোগীর যা একটিমাত্র সাধ ছিল জীবনে তা ভালো করে পূরণের কোনও আশা নেই। হেঁসেলে সব গুলিই চলতি ভাষায় 'মা জম্মুনী একেবারে।' তাই ঐ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

এ আর এমন কী কঠিন শর্ত? গৃহস্থ ঘরের মেয়ের পড়া বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত। অঞ্জলির অবশ্য এবার বি-এ দেওয়ার বছর, তবে ওকে রান্নাঘরের দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যতটা সম্ভব ঐ দিকেই থাক আপাতত। বাইরে বাইরে মুখ ভার করতে হয় একটু, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর চেয়েও খাটাচ্ছে নিজেকে অঞ্জলি। আর সবার পক্ষে না হোক, ওর পক্ষে তো রীতিমতোই কঠিন। পাঞ্জাব-ফেরা বাঙ্গালী, সে শুক্তো, শাকের-ঘণ্টোর জন্যেই এসে বসেছে শ্রীরামপুরে। একখানি গুপ্ত খাতা আস্তে আস্তে বোঝাই হয়ে উঠেছে। তাতে শুক্তো-শাকের ঘণ্টোর ফরমুলা তো আছেই, তাছাড়া আছে—ডিমের কাশ্মিরী পরোটা। চারটি ডিম, একপোয়া গমের ময়দা, একপোয়া ছোলার ছাতু, একপোয়া ঘি, পনেরটি ছোট এলাচ, পনেরটি কাবাব-চিনি ইত্যাদি।

ভেটকি মাছের কোফতা-কারী—এক সের ভেটকি মাছ, চারটি ডিম, এক পোয়া পেঁয়াজ, চারটি রসুন, পাঁচটি কাচা লঙ্কা, এক ছটাক টমেটোর রস, পরিমাণ মত গুঁড়া লঙ্কা ইত্যাদি ইত্যাদি। মোগলাই মোরগ-মোসল্লম (অন্য পাখিরও হয়), একটি পাখির ওপরকার সব পরিষ্কার করে নিয়ে পেট চিরে ভেতরটাও পরিষ্কার করে নিয়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পুরে দিয়ে আগাগোড়া সেলাই করে দিতে হবে—পরিমাণ মতো পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজ থেকে সংগ্রহ করেছে। কলেজের দুটি অন্তরঙ্গ সাথী সাহায্যও করছে; এ বিপদ তো সবারই জীবনে আসতে পারে।

পাসের পড়া শিকেয় উঠেছে। তবে মেহনত হ'চ্ছে পাশের পড়ার চেয়ে কিছু কম নয়। পরীক্ষার মুখে যে-পাশের পড়া।

পরীক্ষা তো এসেই গেল। এ আর এক পরীক্ষা!

জ্যাঠামশাই এসে পড়লেন!

ছ'ফুট দীর্ঘ মানুষ, তেমনি ওসারও। এতখানি ঘোরালেন মুখ, ইয়া বুকের ছাতি, মোটা হাড়কাঠ, টকটকে রং, ষাট-বাষট্টি বছর বয়স হবে, একটি কাঁচা চুল

নেই মাথায় তবু চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সাজানো নকল দাঁত নয়, কষের দিকে থাক না থাক, সামনে দুসারি ঝকঝক করছে; একটু এবড়ো-খেবড়ো কিন্তু মনে হয় বেশ শক্তই। একজোড়া বেশ পুষ্ট গোঁফ, মাথায় চুলের মতোই সাদা ধবধবে।

দেখলে গা ছমছম করে, অবশ্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, সেকথা ভেবে।

ওরা সব দুজন দুজন করে এসেছিল, জ্যাঠামশাই নামলেন একা, দেহের মতোই ওঁর যেন দোসর নেই কেউ সংসারে। নামলেনও যে, ট্যাক্সিটা একবার খানিকটা বসে গিয়ে স্প্রিঙে লাফিয়ে উঠে বার দুই তিন দুলে গেল, যেন বাঁচল। সবাই সসম্ভ্রমে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসাল।

নিতান্ত স্বাভাবিক কৌতূহলে অঞ্জলি ওপর ঘরের জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখল, তারপর দেরাজ থেকে খাতাটা বের করে ঝুঁকে পড়ল। শাক-শুক্ত বা ছাপার কাগজের শৌখীন কিছু নয়, একেবারে কালিয়া-দোর্মা-কোর্মা-কাবাবের পাতার ওপর। পরীক্ষায় বসবার আগে ঝালিয়ে নিচ্ছে একবার। কি যে হবে! কী যে আছে কপালে।···

মানুষটি যেমন সুগুরু, তেমনি ভেতরে সুগম্ভীর। প্রথম সাক্ষাতের দু-একটি কথা-বার্তায় কণ্ঠস্বরের যা নমুনা পাওয়া গেল, তাতে আর কেউ কথা বাড়াবার সাহস করল না। সবাই তটস্থ হয়ে রইল, ঘরটা থমথম করতে লাগল।

নিতান্ত যে কথা কেন না এমন নয়, একবার বললেন—

—"বড্ড গরম এখানে। অসহ্য।"

ঘরের সবাই বলে উঠল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু তবু আমাদের ওদিককার মতন নয়।"

সবাই বলল—"তা কি হতে পারে?"

একটু চুপচাপের পর প্রশ্ন করলেন—"দেরি আছে কি বেশি?"

প্রায় সকলেই ঘর খালি করে দেখতে ছুটল ভেতরে। বেরিয়ে এল তিনটি ছেলে, একজন বলল—"দিদির বড্ড মাথা ধরেছে—বলছে।"

প্রশ্ন হোল—"মাথা ব্যথা? কেন?

আন্দাজটা বলবে কিনা একটু থতমত খেয়ে গেছে, কাকা বেরিয়ে এলেন, বললেন —"এই হোল ব'লে।"

মুখটা একটু ভার ভার, বোধহয় ধমক-ধামক দিতে হয়েছে ভাইঝিকে।

একটু যেন বাড়লও কথা জ্যাঠামশাইয়ের, বললেন—"বেশি সাজানো হচ্ছে?

কি দরকার? দেখে তো গেছে সবাই, আমি শুধু আমার দরকার মতন…”

মনে হলো একটু যেন হাসিই আসছিল, এমন সময় মেয়ের বড ভাই এসে খবর দিল, তোয়ের। কাকা জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ভেতরের দিকে এগুলেন। সবাই পেছনে পেছনে চলল। বাড়ির বারান্দায় গালিচা পেতে দেওয়া হয়েছে, সামনে একটা আসন। জ্যাঠামশাই গিয়ে বসলেন গালিচায়, অঞ্জলিকে নিয়ে আসা হোল। যথারীতি প্রণাম করে বসল সে। পায়ের তলায় হাতটা যেন আগের চেয়ে একটু চেপে বুলিয়ে, একটু একটু কাঁপছেও।

সিঁথির ওপর হাতটা একটু ভালোভাবেই চেপে নীরবে আশীর্বাদ করলেন জ্যাঠামশাই, বললেন—“খাসা মেয়ে, বাঃ! আচ্ছা বলতো মা, নিম-ঝোল আর মোচার ঘণ্টো কি করে রাঁধবে—কি কি মশলা, কি কি তার পরিমাণ?”

পরীক্ষার্থীদের ভাষায় একেবারে ‘আন্‌-ইম্‌পরটেন্ট্‌’ প্রশ্ন। বুকটা ধড়াস করে উঠল অঞ্জলির। নিম-ঝোল তো ছোঁওয়াও হয়নি, ঘণ্টো সম্বন্ধে যা-ও শুনেছে, তাও গেল গুলিয়ে। দুবার ঢোঁক গিলল, তারপর ঘাড হেঁট করে বসে রইল।

জ্যাঠামশাই বললেন—“এই তো নয়। আমি বুড়োমানুষ, কোথায় তাডাতাডি ছুটে এলাম—সারা জীবনটা গোস্ত-পরোটা খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে, এবার বাংলাদেশে গিয়ে মায়েদের হাতে…”

সবাই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে, এত ক’রে শেষকালে নেহাৎ যোগ-বিয়োগে ফেল করবে! কাকা দুটো হাত একত্র করে বললেন,—“আজ্ঞে না, ঘণ্টো-শুক্তো-নিম-ঝোল তো একরকম রোজই রাঁধতে হচ্ছে; ও জানে সব। বলো ভয় কিসের?

একেবারে নিস্তব্ধ সব, একটা ছুঁচ পডলে শোনা যায়! পাশের ঘরে মেয়েরা রয়েছে, একটু-আধটু যা চুড়ির ঠুন্‌ঠুন শব্দ হচ্ছিল, তাও গেছে থেমে, হঠাৎ পরদা ঠেলে ছোট্ট একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, বলল—“মাগো, পিছি দানেনা, আমি দানি, বাত রেঁদেচি, ঘন্তো রেঁদেচি, বাবা খেয়েছে…

একটা ডুরে সাড়ি পরানো, ভালো করে আঁচড়ানো চুলের ওপর বেড় দিয়ে রাঙা ফিতে বাঁধা, পায়ে আলতা, দুহাতে দুটি ছোট ছোট খুরি। একটিতে কাদায় মাখানো কি পাতা। একটিতে ছাই। ভাত আবার সাদা হওয়া চাই তো!

সবাই একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—“তুই এসেছিস। আঃ, এটাকে যে একটু ধ’রে রাখবে!…কোত্থেকে জুটলি তুই?”

কাকা নিজেই ধরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, জ্যাঠামশাই হাত তুলে বাধা

দিলেন, বললেন—"ছেড়ে দিন ওকে। এসতো এদিকে; পিসী বুঝি কিছু জানেনা ?"

বেশ সপ্রতিভভাবে মাথা নাড়ল—না।

"তুমি বুঝি সব জান ?—ঘন্টো, শুক্তো, ডালনা, চচ্চড়ি।"

"ছ—ব জানি।"

"আমায় পারবে তো রেঁধে দিতে ?"

"হুঁ…।",

"তাহলে চলো যাই, আর কি…"

কোলে তুলে নিয়ে উঠে পড়লেন। কাকা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"আজ্ঞে, অঞ্জু জানে সব, কি রকম নার্ভাস্ হয়ে পড়েছে…যদি আরও কিছু জিজ্ঞেস করেন…"

"আর কেন মশাই ? এমন পাকা রাঁধুনি আমার গিন্নী পেলাম, মা রাঁধতে জানে কি না জানে, সে খোঁজে আর কি দরকার ?"

পাঞ্জাবী হাসি পড়ল ফেটে। গিন্নীকে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে এগুলেন।

ফুলের কৌতো

বাড়িতে যাদের মতের মূল্য আছে তাদের কারুরই অমত নেই; মেয়ের বিয়েও যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই ভালো! লাভ তো ভারি, পরের জিনিষ ঘরের পয়সা দিয়ে পুষে মরো!

অবশ্য, এটুকু আদরের অবহেলাভরেই বলা, সত্যিকাব অবহেলার সময় হয়নি এখনও দাখুর। সে হয় মেয়ে এগারো পেরিয়ে যখন বারোয় পড়েছে—বারো ছাড়িয়ে তেরোয় গিয়ে পড়ল—বিয়ের বয়স উৎরে যাচ্ছে, চাওয়া যায় না মেয়ের দিকে, বাপ-মায়ের চোখে ঘুম নেই, মুখে অন্ন ওঠেনা; তেরো ছাড়িয়ে চৌদ্দ, সমাজ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে, শত্রুর মুখে হাসি হয়ে উঠছে স্পষ্ট।

দাখুর সে-সবের এখনও ঢের দেরী, তবু যে বিদায়ের কথা উঠছে তার কারণ সম্বন্ধটা এসেছে ছেলের পক্ষ থেকেই, আর তাও কিছু নশো পঞ্চাশ ক্রোশ দূরের নয়। ভৈরব গাঙ্গুলীর বাড়ি থেকে খান আটেক বাড়ি পরেই বটু কাব্যচুঞ্চুর চতুষ্পাঠী, মাঝখানে একটা পুকুর, তার পরেই বসতবাটিটা। জগদ্ধাত্রী পুজোর নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দাখু কি করে নজরে পড়ে যায় বটুকনাথের, আর নজরে পড়বার

মতনটিই তো; টুকটুকে মেয়েটি, নাকে নোলকটি দুলদুল করছে, বয়স বোধহয় ছটা বছরও হয়েছে কিনা—

এ যুগের তোমরা দেখছি আঁৎকে উঠলে! না, ভয় নেই, তোমাদের যুগের কথা নয়, কথাটা সেই ঠানদিদির আমলের। আসলে দাখু-ঠানদিদির নিজের গল্প; নাতনিদের বলেন, ঘিরে বসে সবাই, কেউ দশ, কেউ তেরো, কেউ উনিশ, কেউ বাইশ, কেউ স্কুলে, কেউ কলেজে; কারুর বিয়ের কথা এগিয়েছে খানিকটা, কারুর এবার সুরু হবে, কেউ বই আর স্কিপিং রোপের মাঝখানে বিয়ের কথা ভাববার সময় পায় না এখনও···। তোমাদের যুগের কথা হচ্ছে না।

বটুকনাথ দেখলেন টুকটুকে মেয়েটি, নাকে নোলক দুলদুল করছে, বছর ছয়েকের-ও হয়েছে কি না হয়েছে। লাগল বড্ড ভালো, তার ওপর খেলাঘরের বউ সেজেছে, মাথায় কাপড় দিয়ে একটু ঘোমটার মতন করে কপালের ওপর টানা, যেমন দেখতে হয়েছে চমৎকার তেমনি বেশ একটু কৌতুকও জাগিয়েছে। কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার নাম কি মা?"

ভালো কথাও ফোটেনি, উত্তর হলো—"দাখু!"

মুঠোখানেক বড়ো যে মেয়েটি সে এগিয়ে এসে পরিচয় দিলে। সে খেলাঘরের শাশুড়ি। বললে—"বউমার ভালো নামও আছে গো, দাখ্যায়িনী।

বটুকনাথ হেসে বসলেন—"বাঃ···, দিব্বি নামটি তো। কার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেচ বউটি? তোমার বেহাইয়ের নাম কি?"

অত কি বোঝবার ক্ষমতা হয়েছে? মেয়েটি হাঁ করে চেয়ে রইল। বটুকনাথ বললেন—"ওর বাবা তোমার বেহাই হয় না? তার নাম জিজ্ঞেস করছি।"

"ভৈরব কাকা।"

"বাঃ, দিব্বি বউ!"

সংসারে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, মেয়েটি ঘুরে যেতে যেতে বললে—"তোমরা পাঁচজনে বলো।···মুখ দেখা হলে তুমিও চলে এ'সো বউমা, বউভাতের যত ঝঞ্ঝাট সারতে হবে।"

কাব্যচুঞ্চু কবি মানুষই, ঘটনাটুকু বোধহয় কোন একটা ভাবের লহর তুলে থাকবে মনে।···আরও কারণ ছিল, নিজের মেয়েটির বিয়ে দিয়ে বাড়ি এখন একদিক দিয়ে যেন খালি; নিজে, গৃহিণী, আর দুটি ছেলে।···মেয়ের জায়গাটি যদি করেই নেওয়া যায় পূরণ, দোষ কি? ভৈরব স্বঘর না হয় একটু নীচু, তা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। আর সত্যই রত্ন, ছেলের বউ করে ঘরে তোলবার যোগ্য। কে জানে,

বয়স দেখতে গেলে, ওদিকে কখন কার নজরে যাবে পড়ে, যাবে হাতছাড়া হয়ে।

কিন্তু একেবারে ভিতরের কথা নিশ্চয় ঐ—অর্থাৎ খেলাঘর দেখে খেলাঘর পাতবার সাধ হয়েছে বটুকনাথের, যুক্তির অভাব হচ্ছেনা, বিরুদ্ধ যুক্তি কিছু টিকতেও পাচ্ছেনা।...শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ির মধ্যে বেড়ে উঠছে বউ...ঐটুকু বউ, ঐ আধো আধো কথা; ঐ ঘোমটা, হয় তো আরও একটু টানা...কাব্যচুঞ্চুর সামনে সমস্ত চিত্রটি রঙে রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, সামলানো যায় না লোভ।

সেই দিনই নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা শেষ হওয়ার পর ভৈরব গাঙ্গুলীকে একটু একান্তে ডেকে বললেন, "উটি তোমার মেয়ে দেখলুম না? পাশেই বসেছিল তোমার... ওর কুষ্টিটা করিয়েছ।"

শুনলেন, হয়নি করানো তখনও।

বললেন—"করিয়ে নাও; মেয়েটির লক্ষণ যেন ভাল মনে হচ্ছে। জন্মলগ্নটা দিয়ে যেও আমায়।"

আসল কথাটা আর আগে ভাঙ্গলেন না। কে না জানে মিলের উপরই তো সব।

ভালোই মিল হলো।

আগে গৃহিণীর কাছে কথাটা ভাঙ্গলেন। অপছন্দ না হলেও একটু বিস্মিত হলেন তিনি, অন্তত উত্তরে একটু গৃহিণীত্বের ছাপ দিলেনই রেখে—

"ঐ তোমার ছেলে—মোটে চোদ্দ বছর বয়স, তাও হয়নি পুরো—পড়ছে—এর মধ্যেই বিয়ে—একটু ভেবে চিন্তে..."

উত্তর হলো—"শুধু ছেলের কথাই ভাবব চিরকাল?"

গৃহিনী আর বিস্মিত ভাবেই চেয়ে রইলেন মুখের দিকে।

"আমারও তো বয়স হয়ে এসেছে, দেখে শুনে একটা বেহান করতে ইচ্ছে করে না? ভৈরব আমার চেয়ে অনেক ছোট।"

গৃহিনী একটু মুখের পানে চেয়ে থেকে হাসলেন, বললেন—"তার মানে আমার বয়সের কথা হচ্ছে?"

ওদিকে পাকা করে ভৈরব গাঙ্গুলীকে ডেকে তার কাছে কথাটা পাড়লেন বটুকনাথ।

সেই আলোচনায় এখন মুখর হয়ে উঠেছে গাঙ্গুলীবাড়ি। আনন্দমুখর। ঠাকুরমা আদরের অবহেলায় বলছেন—"যাদের ধন তারা যত শিগ্‌গির পারে নিয়ে যাক, কেন খরচপত্র করে পুষে মরি?"

মা নাকী কান্নার সুরে বলছে—"কিন্তু মা, এখনও তো ওর জিভের আড় ভাঙেনি।"

"আর ভেঙেও কাজ নেই মা, এরই মধ্যে তো বউ সেজে নিজের শ্বশুরবাড়ি কেঁদে এল তোমার মেয়ে।...জিভের আড় ভাঙলে না জানি আরও কি করবেন।"

বটুকনাথের পুত্র হরনাথ বাপের চতুষ্পাঠীরই ছাত্র, কাব্য পড়ছে আর মুগ্ধবোধ; বয়স, মা যেমন বললে—চোদ্দ বৎসর পুরো হয়নি এখনও। বেশ মেধাবী ছাত্র, মুগ্ধবোধ প্রায় শেষ করে এনেছে, বাপের ইচ্ছা এরপর একেবারে কাশী পাঠিয়ে দেবেন পাণিনি: অধ্যয়ন করবার জন্যে, সেখানে সুবিধাও আছে একটু।

ছেলের কিন্তু ঝোঁকটা কাব্যের দিকেই, নিশ্চয়ই বাপের বিদ্যার অধিকার সূত্রেই। চতুষ্পাঠীতে যা পাঠ্য তারও অধিক এদিক-ওদিক থেকে পড়ে ফেলেছে কিছু কিছু, ছন্দ নিয়েও মাঝে মাঝে মক্স করতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে বিবাহের কথাটা উঠল।

সে-যুগের কথা, বিবাহের কথা উঠলেই ছেলেরা কেরিয়ারের কথা ভেবে শিউরে উঠত না। বয়সের কথাও ভাবত না।

কোন কথাই ভাবত না সে যুগের ছেলেরা। হরনাথও ভাবলে না, কিছু বললে না। গৃহিণী হয়তো সে-যুগের নূতন আধুনিকতার সুর তুলেই কর্তাকে একবার বললেন ছেলের অভিমতটা একটু জেনে নিলে হত। কর্তা উত্তর করলেন—"চোদ্দ বছর বয়সটা বিবাহ দেবার পক্ষে যথেষ্ট হলেও মতামত দেবার পক্ষে যথেষ্ট হতে হবে, এমন উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে—তাহলে বছর পুরতে না পুরতে লোকে যে অন্নপ্রাশন দিচ্ছে ছেলের, তারও তো মতামত নিতে হয়, খাবে কি না-খাবে—কি তার পছন্দ, কি পাক করে দিতে হবে তার পাতে।"

ওসব মত নেওয়া-না-নেওয়ার কথা ঐখানে চাপা পড়ে গেল। তবুও ছেলের মনের ভাবটা কি সে সম্বন্ধে একটা কৌতূহল থেকেই যায় বাপ-মায়ের মনে। হরনাথ বাইরে বাইরে একটা ঔদাসীন্যের ভাব ফুটিয়ে রেখে সেটাকে আর বেশি এগুতে দিলে না। এদিকে অধ্যয়নের দিকটা দিলে বাড়িয়ে। যার জন্যে বাপ-মায়ের মনে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, বিবাহের প্রস্তাবে ছেলের যদি আপত্তি থাকেই তো তা এত সামান্য যে, তার জন্য মাথা ঘামাবার সময় দিতে চায় না নিজেকে। এর থেকে এই ধারণা দাঁড়ানোই স্বাভাবিক যে আপত্তিটা হয় তো বা কচিমেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবেই। যদি তাই হয় তো কেউ তো আর সে মেয়েকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে না সদ্য সদ্য। বধূ কচি বলেই ওর মনটা ক্রমে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, এই পড়াশুনার স্পৃহাটা যাবে বেড়ে, এক ধরনের শাপে বর।

ওঁরা নিশ্চিন্ত হলেন।

এরপর একদিন সামান্য একটি ঘটনায় আরও গেলেন নিশ্চিন্ত হয়ে।

হরনাথ যে অধ্যয়নটা শুধু বাড়িয়ে দিল তাই নয়, যাতে মনোযোগটা গম্ভীর হয় সেইজন্যে নিরিবিলিও খুঁজতে লাগল বেশি করে। একটা পাকারকম ঠিক করে ফেললে চিলে কোঠার ঘরটা, তা ভিন্ন গলা ছেড়ে পড়বার তার যে অভ্যাসটা ছিল এর আগে, সেটাও দিলে ছেড়ে। নীরবে নিরিবিলিতে তপশ্চর্য্যার মতো করেই হরনাথ বিদ্যার্জনে আত্মনিয়োগ করে দিলে।

এইভাবে কয়েক দিন কাটল। শ্রাবণ মাসটায় বিবাহের কটা দিন আছে, কিন্তু একেবারেই সামনে, অত তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজন কি? এরপর অগ্রহায়ণটাই প্রশস্ত, ধীরে সুস্থে কথা এগুতে লাগল।

পূর্ণিমার জন্য চতুষ্পাঠী বন্ধ ছিল। দুপুর বেলায় বটুকনাথ নিজের ঘরে শুয়ে শুয়েই ভট্টিকাব্যটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, একস্থানে ব্যাকরণের কি একটা বিষয় নিয়ে সংশয় উদয় হলো মনে। চতুষ্পাঠিতে থাকতে কারুর একটা বই টেনে নিয়ে মিটিয়ে নেন সংশয়, ছোটছেলে সোমনাথকে ডেকে বললেন—"তোর দাদার কাছে মুগ্ধবোধটা চেয়ে নিয়ে আয় তো।"

সোমনাথকে স্কুলেই দিয়েছেন, দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় নেই। একটু পরে যে বইখানি হাতে এনে দিল তার মলাট উল্টে মুখের পানে চেয়ে রইলেন বটুকনাথ, প্রশ্ন করলেন—"হর দিলে তোকে এই বই?"

উত্তর হলো—"না, আমি নিজে নিয়ে এলাম।"

"কোথা থেকে?"

"দাদার বালিসের নিচে থেকে।"

"কোথায়?"

"চিল কুটরিতে।"

"সে ঘুমুচ্ছে?"

"না, দাদা নেই তো।"

"হুঁ।"

শব্দটুকুতে একটা নাতিদীর্ঘ টান দিয়ে বটুকনাথ ধীরে ধীরে বইটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

একটু পরে বললেন—"তোর গর্ভধারিণীকে ডেকে দে···তোর আর এসে কাজ নেই।"

গৃহিনী এলে গাম্ভীর্যের ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল বটুকনাথের মুখে, বললেন—"ছেলের মত নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছিলে, এই নাও।"

বইয়ের একটা জায়গা উল্টে মেলে ধরলেন। বেশ দাগ কেটে কেটে পড়া। গৃহিণী একটু কৃত্রিম অভিমান ভরেই বললেন—"সব তো বুঝি! শুনতেই কাব্যচুঞ্চুর ইস্তিরি। ব্যাপারখানা কি?"

"শকুন্তলা নাটক।...সোম গিয়ে হরর বালিসের তলা থেকে নিয়ে এল। চিলে কোঠা থেকে—মুগ্ধবোধ ব্যাকারণ খানা আনতে বলেছিলাম।"

কাব্যচুঞ্চুর গৃহিণী, অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও শকুন্তলা বোঝেন বৈকি! স্বামীর সামনে একটু একটু সলজ্জ হাসি ফুটল, মুখে বললেন—"আ...ভালোই তো।...হ্যাঁ আমারও প্রমাণ জোগাড় হয়েছে—তুমি ছিলে না বলা হয়নি। ভৈরবের বড় মেয়েটি এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। একটা ছুতোনাতা করে হরকে দেখতে চায়—কাল নেমন্তন্ন করেছিল। তা হয় তো দিব্বি গেল...একেবারে লাফিয়ে না হোক...কোনরকম গুঁই-গাঁই করলে নাতো। এখন নিশ্চিন্দি হয়ে কথা চালাতে পারি আমরা..."

"তুমি উল্টো বললে যে..."

স্ত্রী একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন মুখের পানে।

"আর নিশ্চিন্দি হওয়া চলে কি?...দাগ কাটা দেখে যেমন বুঝেছি, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রায় শেষ হয়ে এলো; তৃতীয় অঙ্কে প্রবেশ করার আগেই একটা বিহিত হয়ে যাওয়া ভাল নয়কি?—আগে ভেবেছিলাম অঘ্রান, এখন দেখছি শ্রাবণে শেষ করে দিলেই যেন ভালো।...না হলে বুঝছই তো, এখন অধ্যয়ন চিলে কোঠায় উঠেছে এরপর চিলে কোঠার শিকেই উঠবে।

দুজনে হাসতে হাসতে দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

তৃতীয় অঙ্কে যে প্রবেশ হয়নি, একথাও জোর করে বলা যায় না, না হয় বই-খানারই তৃতীয় অঙ্ক হয়নি পড়া।

কাল নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল হরনাথ। সাত আটখানা বাড়ি পরেই গাঙ্গুলীবাড়ি। শুধু এক পাড়া নয়, একেবারেই প্রতিবেশী, কতবার গেছে কত নিমন্ত্রণ খেয়েছে তার কি হিসেব আছে? কিন্তু আজকের যাওয়া, আজকের খাওয়া, এ যেন এক অন্য ধরনেরই ব্যাপার; যাওয়ার পা উঠছিল না, কিন্তু তবুও কত মধুর। দাক্ষায়ণীর দিদি কাত্যায়নীকেও তো কতবার দেখেছে এর আগে; ওর চেয়ে বড়, গ্রাম সম্পর্কে দিদি। কতবার কতরকম কথা হয়েছে, কিন্তু আজকের কথার মতো এত মিষ্টি লেগেছে তার কথা কখনও, এমন তো মনে পড়ে না হরনাথের। অথচ আজ কথা হয়েছেই বা কতটুকু? আর যেটুকু হয়েছে তাও ঠিক আলাপের মত নয়—কাতু গেছে বলে হরনাথ গেছে শুনে...বোনকে আমার পছন্দ হয়েছে তো ভাই?...আর চতুষ্পাঠীতে

পড়বে কি, আমার বোনের জন্তে নিজেই একটা চতুষ্পাঠী খোল···না ভাই খাও, কিছু বলব না, এই মুখ বুজলুম; অত লজ্জায় কি খাওয়া হয়?"···

—সবই অল্প, অসম্পূর্ণ; কিন্তু একদিক দিয়ে কি করে যেন নিজে হতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শুধু একটা জায়গায় অসম্পূর্ণতা থেকেই গেল।···একটি ছোট্ট, ফুটফুটে মেয়ে, ডুরে সাড়ি পরে এই বাড়িতে কোথাও ঘুরঘুর ক'রে নিজের খেলা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি পড়েই এসে সামনে, চোখ তুলে চাওয়া যাবে না; পড়ুক না এসে একবার, কেন আসছে না একবারটি পথ ভুলেও?···

দাখুর কথা দিদিও ভেবেছে। খাওয়া হয়ে গেলে পান দিতে দিতে কতকটা নিজের মনেই বললে—"দিব্যি হলো একরকম, শুধু দাখু থাকলেই আর এ খুঁৎ-খুঁতুনিটা থাকত না আমার।

পাশের বাড়ির সৌদামিনী বললে—"কেন, দাখু তো দত্তদের পোড়োবাড়িতে দিব্যি খেলছে দেখলাম ওদের যামিনীর সঙ্গে। বললাম ওকে ছেড়ে দে, ওর বরের নেমন্তন্ন রয়েছে ওদের বাড়িতে আজ, তা বললে—'সে ভাবনা ভাবতে হবে না, তুমি যাও এখানেও ওর বরের অভাব নেই, নোরু হরদা সেজে টোলে পড়তে গেছে, এই এল বলে।···কী ডেঁপো মেয়ে যামিনীটা বাবা!"

বাড়িতে একটু হাসি ছলকে উঠলই। কাতু হরনাথকে বললে—"নাও ফ্যাসাদ, সভাসুদ্ধু চারিদিকেই নল, এখন আসল নল কি করে দময়ন্তীকে উদ্ধার করবে তার রাস্তা বের করো।"

কোনরকমে পানটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো হরনাথ।

দত্তদের পোড়ো বাড়িটা বেশী দূরে নয়, তবে জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। বেশ বড় বাড়ি ছিল, এখন তার চণ্ডীমণ্ডপটা পড়ে গিয়ে মাত্র দুখানা দেওয়াল আছে দাঁড়িয়ে। এর মাঝে ফুলকারি করা সিমেণ্টের খেলাঘর পাতবার খুব সুবিধে এখানে।

জায়গাটার আর একটা সুবিধা এই যে, বেশিদূর না হলেও গ্রামটা এইখানে এসে হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেছে। ঐ পরিষ্কার জায়গাটুকু হালকা আগাছার জঙ্গলে ঘেরা; এর পরেই এই জঙ্গলটা ঘন হতে হতে মাঠ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। গ্রাম থেকে একটা হাঁটাপথ বেরিয়ে দত্তদের চণ্ডীমণ্ডপ বাড়ি আর মজাপুকুর ডাইনে রেখে বন চিরে চলে গেছে। লোক-চলাচল খুব কম, একটা পুরানো কয়েৎ বেলের গাছ থাকাতে পাড়ার ছেলেদের কিছু গতিবিধি আছে, আর ছোট ছেলে মেয়েদের ঐ চাতালটুকুর ওপর লোভ।

হরনাথ পানটা মুখে দিয়ে ফিরছিল। পা-দুটো এখনও ভারি। গাঙ্গুলীবাড়ির সমস্ত ব্যাপারটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে যেন বাঁচে, কিন্তু পারছে না যে তার জন্যে কোনও কষ্টও নেই; আর সৌদামিনীর ঐ কথাটুকু কানে যেন লেগে রয়েছে—"কেন, দাখুতো দত্তদের পোড়োবাড়িতে দিব্যি খেলছে দেখলাম।"

গোটা-তিনেক বাড়ি পেরুতেই গাঙ্গুলীদের বাড়িটা আড়াল পড়ে গেল; একবার ঘুরে দেখে নিলে হরনাথ। সামনেই সেই হাঁটা পথটা দেখেই কেমন একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ওটা যেন একটা আগল, পেরিয়ে যাওয়া শক্ত; অথচ আর খান চারেক বাড়ি পেরুলেই নিজেদের বাড়িটা এসে পড়ছে।...তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'ভুক্তা শতপদং গচ্ছেৎ'—খাওয়াটা একটু বেশি হয়েছে, এদিক দিয়ে খানিকটা ঘুরে গেলেই পরিপাকটা শাস্ত্রমতো হবে ভালো। আর একবার পেছন দিকটা দেখে নিয়ে ঢুকেই পড়ল হাঁটাপথটায়।

এরপর বেশ গোড়া বেঁধেই ব্যাপারটা শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্কের মতো হয়ে গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশ ঘেঁষেই রাস্তাটা। এতটা এসে এখন শেষ রক্ষা কি করে হয় ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল হরনাথ, গতি মন্থর হয়ে এসেছে, এমন সময় যামিনীর কথা কানে গেল—"আঃ, হরদা যে কখন আসবেন। টোল আর শেষ হয়না বাপুর।"

বাকিটা কাজের মধ্যে মনে মনে গরগরানি।

কথাটা যে পেশাঘরে তার প্রতিভূ নোরুর সম্বন্ধে বলা, হরনাথ একথাটুকু যে বুঝলে না এমন নয়। তবে যেই কর্জ নিক্, নামটা যখন আইনত তারই, সে সুযোগটা হাতছাড়া করলে না; চণ্ডীমণ্ডপের একটা দেওয়াল ঘুরেই সামনে এসে দাঁড়াল, প্রশ্ন করলে—"আমায় ডাকছিলে?"

একটা নাটকীয় পরিস্থিতিই গেল দাঁড়িয়ে। মনে হয় যেন জামাইষষ্ঠীর প্রচুর আয়োজন চলছিল, যামিনী তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁ করে চেয়ে রইল। দাখু ছিল বসে। বিস্ময়ের চোটে বোধ হয় সে আর দাঁড়াতেই পারলে না।

একটু সামলে নেবার অবস্থা হলে যামিনী বললে—"ন', আমি নোরুকে ডাকছিলাম, তোমাকে নয়তো।"

হর একবার আড়চোখে দাখুর দিকে চেয়ে নিলে; একটু যেন ভীত, নাকের নোলকটা অল্প অল্প দুলছে।

বললে—"ও! হরদা শুনলাম কিনা, ভাবলাম আমাকেই বুঝি কে ডাকছে... হয়তো ভয় পেয়েছে, জঙ্গুলে জায়গা তো।...তা নোরু গেছে কোথায়?"

চুপ করে রইল যামিনী।

হরনাথ ওকে বলল—"টোলের কথা বলছিলে কিনা···টোল তো আজ বন্ধ, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

এবার উত্তর দিলে দাখুই। ভাবলে কথাটা ফাঁস করে দিলে বিপদটা যদি কেটে যায় বললে—" না গো, টোল, মানে কৎবেলের গাছ।" এবার যামিনী কথাটুকু পূরণ করে দিলে—"চাটনী হবে কিনা।" হরনাথ যামিনীর কথাটা শুনে নিয়ে দাখুকেই প্রশ্নটা করলে —"কখন আসবে ?"

তারপর কথাটা একটু বাড়াবার জন্যেই হোক বা হঠাৎ একটা শিভ্যালরির ভাব মনে এসে যাওয়ার জন্যেই হোক, বললে—"আমি না হয় একবার দেখি, কি বলো ? বনবাদাড় কিনা ?—একলাটি গেছে······' যামিনীর মুখের দিকে চাইলে , দুজনেই সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল।

নোরুকে কৎবেলের গাছে দেখা গেল না। সম্ভবতঃ সে দেখেছে এবং আসল হরনাথ এসে পড়ায় বিপদ দেখে জামাইষষ্ঠীর মায়া ত্যাগ করে সরে পড়েছে। হরনাথ একটু ভাবলে ; তারপর নিজেই উঠে পড়ল গাছে।

দুটি পাকা বেল এনে হাজির করলে। দুটোই যামিনীকে দিতে যাচ্ছিল, তারপর কি ভেবে একটা দাখুর দিকে বাড়িয়ে বললে—"না হয় তুমিও একটা নাও।" দাখুর দৃষ্টিতে আর সে ভয়ের ভাবটা নেই, বললে—"তুমি খেলবে ?"

যামিনী দুপা এগিয়ে সামনে দাঁড়াল, একটু হেসে বললে—"দ্যা, হবদা কখনও খেলেন ? ···এমন বোকা দাখুটা।"

হরনাথ একটু কি ভেবে নিলে, তারপর বললে—"না হয় খেলতাম, কিন্তু আজ আর হবে না।······তোমরা রোজ এখানে আস নাকি খেলতে ?"

যামিনী বললে—"হ্যাঁ ; আমি, দাখু, নোরু, কালী···"

"অত হলে আর আমার দরকার কি ?······তোমরা দুজন হলে না হয় আসি—তখন মনে হবে তো, আহা, বেচারিদের খেলার জুটি নেই, যাই না হয় একটু।"

এর উত্তর শক্ত, যামিনী চুপ করে রইল।

হরনাথ একটু ভেবে বললে—"আমি এখান দিয়ে তো প্রায়ই যাই, যেদিন দেখব বড্ড-একলা রয়েছ, এসে পড়ব, অ্যাঁ ?"

দুজনেই ঘাড় কাত করলে, দাখু বললে—"বেছ্।" খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এল হরনাথ, বললে—হ্যাঁ, একটা কথা তো বলাই হয়নি। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বোল না আমি এসেছিলাম আর কৎবেল পেড়ে দিয়েছি। বকবে তোমাদের—এমন কি মারধোরও করতে পারে, বলবে দেখেছ, বুড়ো ছেলেকে ধরে কৎবেল পাড়িয়েছে—পাড়ায়

কারুর মানসম্ভ্রম থাকতে দেবে না মেয়ে ছুটো। তার চেয়ে বলবে নোরু পেড়ে দিয়েছে, নোরুই খেলছিল।...এদিকে নোরুতো আমিই, বেশ মজা হবে না?"

একটু হাসলে, এই কৌতুক-প্রবঞ্চনাটুকু ওদের মনেও সুড়সুড়ি দিয়েছে, ওরাও হেসে মাথা নাড়লে।

সঙ্কোচটুকু একেবারেই গেছে কেটে, হাসির ওপরই আবার গম্ভীর হয়ে গেল যামিনী। আবার সেই গিন্নিবান্নি, সময় বুঝে ব্যবস্থা করতে জানে, বললে—"হ্যাঁ, আর লোকেও তো বলবে—ওমা, কি ঘেন্নার কথা, বিয়ে হয়নি তার আগেই বরের সঙ্গে ঘরকন্না লাগিয়ে দিয়েছে।"

এরপর হর আর দাঁড়াল না।

শ্রাবণে বিবাহ দেওয়াই সাব্যস্ত হল।

প্রথমতঃ, চাক্ষুষই প্রমাণ তো পাওয়া গেল যে, বিবাহের চেয়ে পূর্বরাগের সময়টাই অধ্যয়নের পক্ষে বেশি ক্ষতিকর, সুতরাং ওটাকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনাই শ্রেয়ঃ।

দ্বিতীয়তঃ, মেয়েটিকে যথাসম্ভব শীঘ্র ঘরে এনে ফেলাই বটুকনাথের অন্তরের ইচ্ছা, কথাবার্তা ওঠার পর থেকেই ও যেন কেমন করে আপন হয়ে গেছে, যতই দিন যাচ্ছে বুকের স্নেহ যেন ওকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলছে। বিবাহের পরই যে ওকে বাপের ঘর ছেড়ে চলে আসতে হবে এমন নয়, তবু নিজের ঘরেরটি হয়ে থাক্—যখন খুশি নিয়ে এলেন। সকালে, দুপুরে, যতক্ষণ খুশি রাখলেন—সমস্ত দিনটাই বা দুদিন চারদিন...

ছেলের বিবাহ দেওয়া প্রৌঢ়ত্বের একরকম খেলা। দাখুর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অর্থাৎ একটি পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েকে বউ করে আনা—এ খেলাটা আরও যেন বেশি করে খেলার মতো। বটুকনাথের তর সইছে না।

এদিকে হরনাথও পূর্বরাগের এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুকে কাজে লাগাতে কসুর করছে না। দত্তদের পোড়ো ভিটেয় রোজ যাওয়া চলে না, তবু ও ইতিমধ্যে গেছে বারদুই, এর ওপর যোগাযোগ রক্ষার অন্য উপায়ও বের করেছে। যামিনী হয়েছে দূতী অনসূয়াই বলো বা প্রিয়ংবদাই বলো। খবর নিয়ে আসে সত্যিই দাখু বলেছে হরনাথকে খুব ভালবাসে...

ওমা, বলেছে বৈকি। হরনাথকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না।...যদি হরনাথ ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয় সবাই তাহলে?...তাহলে...তাহলে...

হরনাথই উত্তরটা জুগিয়ে দেয় "একরকম তাহলে আত্মহত্যা করে বসবে না তো?"

—"ওমা, করবে না আত্মহত্যা?—বলেনি সে কথা?—ঐটুকু মেয়ে। কি করতে হয় না করতে হয় সব জানে।" 'হরনাথ যদি বিশ্বাস না করে তো করবে কি যামিনী?'

চতুষ্পাঠীর ছুটি থাকলেই চিলে কোঠার ঘরে জোটে, গল্প হয়,...হরদাদার কিছু ভাববার

দরকার নেই—পাড়ার সবাই বলছে বটে কচি মেয়ে, কচি মেয়ে—তা বিয়ের আগেই এমন তোয়ের করে দেবে যামিনী যে তখন দেখবে সবাই।…যামিনীর নিজের বয়স আট বছর, বলে—"তুমি চোখ-কান বুজে করে ফেল বিয়ে হরদা, আমি রয়েছি কিনা।"

ফরমাস নিয়ে আসে দাখুর। তাতে কাঁচের পুতুল, ল্যাবেঞ্চুস যে না থাকে এমন নয়, তবে আধুনিক নববধূর চিঠির কাগজ, খাম, কলম, এসেন্স, মাথার চিরুনি এসব তো থাকেই তা ভিন্ন চাবির রিং থেকে আরম্ভ করে গিন্নিবান্নিদের প্রয়োজনীও কোন জিনিসও বাদ যায় না। ফরমাসগুলো সব দাখুরই কিনা ঠিক বোঝা যায় না, দুএকটাতে হরনাথের একটু খুঁৎখুঁতানিও থাকে—সেগুলো গৃহিণীপনার একেবারে পাকা লক্ষণ; কিন্তু যামিনীকে ক্ষুন্ন করতে সাহস পায় না, এদিক-ওদিক থেকে নানা কৌশলে পয়সা সংগ্রহ করে সাধ্যমতো যোগানি দিয়ে যায়।

এই করে চলেছে। ফল এই হচ্ছে যে, বিয়ের চিন্তাটা খুব আনন্দজনক হলেও, বিয়ে করে একটা কচি মেয়েই ঘরে আনছে, কি আধুনিকা নববধূ, কি একেবারে পরিপক্ক একটি গৃহিণীই, সেটা ঠিকমত ঠাহর করতে না পেরে দিনদিনই একটা ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে হরনাথ। এইভাবে একদিন শ্রাবণ মাস এসে পড়ল, লগ্ন দিনও কাছিয়ে এল, তারপর একদিন ধুমধাম করে বিবাহও হয়ে গেল।

যদিও সেই ধাঁধার ঘোরটা কাটেনি, তবু হরনাথের মনের ভাবটা অনেকখানিই যায় বোঝা। তেরো-চোদ্দ বছরে বিবাহ সেকালে এমন কিছু একটা অসাধারণ জিনিস নয়, অনেকেই করেছে, তারও হচ্ছে, আর চাপা একটা সহজ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করছে সে।

দাখুর ভাবটা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে না; হয়তো যামিনী খেলাঘরে রোজ এই জিনিসটারই মহলা দিয়ে অনেকটা গা-সওয়া করে এনেছে; আর সত্যই তো দুপা গেলেই শ্বশুরবাড়ি, বর কিনা হরদা, এই সেদিন পর্যন্ত খেলাঘরেই হল দেখা, কোথাও এমন কিছু নেই যার জন্যে বিহ্বল করে দেবে ওকে। যদি বা কোথাও কিছু থাকেই বিহ্বলতার তো, প্রতিমুহূর্তেই তা চাপা পড়ে যাচ্ছে কাপড়, জামা, গয়না, শাঁক, ঘণ্টা আর ভোজের হট্টগোলের মধ্যে।

বাসরে অল্প সময়েই ঘোমটার মধ্যে ঢুলে পড়ে সারারাত অকাতরে নিদ্রা গেছে।

বিয়ের কনে অষ্টপ্রহর আঁচলে চোখের জলই মুছবে, অবশ্য এই নিয়ম যে এক্ষেত্রে খাটবার নয় সবাই জানে, তবু বিয়েবাড়ির মুখ, জেনেও সবাই বলে দাখুর মাকে—"ও কোকিলের ছা-ই পোষা গো, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছুতেই পর হয়ে গেল মেয়ে!"

দাখুর মা চোখ মোছেন আর বলেন—"আহা, তা হোক, কাঁদছে না, ভালোই, বড়

মেয়ে কাঁদে সে আলাদা, কচি মেয়ে কাঁদলে ওকে কি সামলান যাবে ?"

যামিনীর কৃতিত্ব আছে বৈকি, পালকিতে ওঠবার সময় পিসির কোলে চড়ে দিব্যি গিয়ে উঠল দাখু। বেশি কাঁদছে সবাই, তা ভিন্ন কাঁদবার সবাই একত্র হয়েছে—মা, ঠাকুমা, পিসি, খুড়িমা, দিদি, একবার ঠোঁটটা থরথরিয়ে উঠল দাখুর, কিন্তু সামলেও গেল সঙ্গে সঙ্গে।...বোঝাবার লোকও রয়েছে তো ?—কান্না কিসের ? যখন খুশি চলে আসছে —দিদি, পিসি সবাই যাবে—ওরা পালকিতে তারা নয় হেঁটে।

সাম্‌লে গেল ঝোঁকটা।

আবার কিন্তু ঠোঁট থরথরিয়ে ওঠে। ঠাকুরমা-সম্পর্কের একজন বললে—"বর না ভেবে, না হয় মনে কর না সেই হরদার সঙ্গেই যাচ্ছিস, তাহলে তো আর শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া হল না।"

ঠাট্টা না বুঝুক, হাসি যে উঠল একটু তাইতেই এবারটাও গেল সামলে। একজন আরও একটু বুদ্ধি করে বললে—"বাঃ, সব দিয়েছ, ওর পুতুলের বাক্সটা দেওয়া হয়েছে ? ওর নিজের জিনসটাই আটকে রেখেছেন সবাই !"

একজন ছুটে গিয়ে সেটা নিয়ে এসে হাতে দিলে বাক্সটা।

ভৈরব গাঙ্গুলী বললেন—"নাও, পালকি তোল এবার !"

তুলে উঠল পালকি।

দাখু আর পারছে না। একটা কান্না ঠেলে উঠছে, কিন্তু ক্রমাগতই বাধা পেয়ে যেন গলার নীচে চলে যাচ্ছে।...ঠিক বুঝতে পারছে না, তবে যেন ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে কি করে কাঁদতে হয়। কোথায় চলল ? এত কাছে তো সবাই কাঁদেই বা কেন ?

কি মনে হল, হঠাৎ খেলবার বাক্সটার ডালা খুলে ফেললে তারপর একবার দেখে নিয়ে বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে ছ'বছরের কচি মেয়ের মতোই ডুকরে আবদারের কান্না কেঁদে উঠল...

আবদারের একটিমাত্র কথা—কান্নার মধ্যে ভাল করে বোঝাও যায় না—"আমাল—তু'ল কো'তা ?"

সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল—"কি বল্—কি কোথায় ?—তুল ?—তুল ?—কি বল্—এখুনি এনে দিচ্ছি"...একজন বুদ্ধি করে বললে—"যামিনী কোথায় ? তাকে ডাকো না, সেই খেলাঘরে থাকত।

যামিনী আগেভাগেই ও বাড়িতে চলে গেছে, শাঁক বাজিয়ে বউ তুলবে। একজন ছুটল ডেকে আনতে।

কান্না কিন্তু আর থামে না এদিকে।

পালকি আবার নাবানো হয়েছে। ছত্রাকার হয়ে নীচে পড়ে রয়েছে—কাঁচের পুতুল চিরুনি, ফিতে, চাবির রিং, দোয়াত, কলম, আরও কত কি…

পালকির মধ্যে থেকে আড়চোখে দেখলে একবার হরনাথ। সবাই আছে, নেই শুধু একটা জিনিষ।

একটা রূপার ছোট্ট কৌটো। বড় সাধ ছিল বাপের মতো যখন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হবে, তখন সেটা নস্যাধার করবে হরনাথ। তারপর যামিনীর নজরে পড়ায় সে সেটা চেয়ে নিয়ে আসে, বধূকে পাকা গিন্নী করে পাঠিয়ে দেবে বলে।

কি ভাবে করবে সেদিন ভাঙে নি যামিনী। তবে আজ আসল কথাটা বুঝে নিতে দেরি হল না হরনাথের। উৎকট কান্নার মধ্যে আর একবার উঠানের দিকে চেয়ে একটু বিরক্ত ভাবেই মুখটা কুঁচকে বলল—"গুলের কৌটো চাইছে…নেশা ধরেছে গিন্নীদের মতন!"

ঘুরিয়ে নিলে মাথাটা…

মৌনা

বার দুই দুর্গা ঠাকুর দেখা হয়ে গেল শ্রাবণীর। প্রথম যখন দেখল তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর যাচ্ছে। তা হলেও মনে আছে বেশ। ও সেই ধরনের মেয়ে যাদের, যা দেখে বা শোনে, খুব মনে থাকে। শুধু তাই নয়, যা দেখে না যা শোনে না তার কথাও ঝুড়ি ঝুড়ি বলে যেতে পারে। সবাই বলে পাকা গিন্নী। শ্রাবণী ঠিক ভেবে পায়না কেন বলে। ওর নিজের ধারণা, ও হতে চায় গিন্নীদের মতো; খুব চেষ্টাও করে, কিন্তু হতে পারে কৈ?

চেষ্টা ও অনেকদিন থেকেই করছে। এই ঠাকুর দেখার কথাই ধরা যাক না কেন; এখনও তো বাড়িতে সবাই সেই কথা নিয়ে গল্প করে, নতুন যদি কেউ এল বাড়িতে, তাকে শোনায়। তারা আশ্চর্য হয়ে যায়। কেউ কেউ কোলে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"হাঁ শ্রাবণী, তোমায় দুর্গা ঠাকুর এইরকম করে সব বলেছিলেন?" আগে খুব গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাত শ্রাবণী, বলত, "হ্যাঁ বলেছিলেনই তো। যেতে জিজ্ঞেস করলেন সে কেমন আছে, সবাই তাকে আদর করে কিনা, তার খেলা ঘরে কি কি পুতুল আছে, তার মেয়ের বিয়ের কি হোল? হ্যাঁ, দিদির কথাও করেছিলেন জিজ্ঞেস। দিদি যে পরে

বাবা কাকাদের সঙ্গে যাবে বলে ওদের সঙ্গে গেলই না। শ্রাবণীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বলেই তো ও এসে বলল, সেখানে কী খোঁজানটাই খুঁজছেন ওকে মা-দুর্গা! মা-দুর্গা যে খুব ভালো, খুব ভালবাসেন সবাইকে, শ্রাবণীকে সব চেয়ে বেশী। শ্রাবণীর দিদি বলে সুপাকেও খুব বেশী। তাইতো ও যায়নি দেখে অত খোঁজাখুঁজি করেছিলেন। তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন শ্রাবণীকে। মা দুর্গা তো পূজো ছেড়ে নিজে আসতে পারেন না···

চেষ্টা করে বেচারী পাকা গিন্নীদের মতো করে বলতে; মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

ওর কাটেও বেশিরভাগ সময় বড়দের মধ্যেই। ওর নিজের দিক থেকে ধরতে গেলে, তাদের কাছেই ও নিজের মনের খোরাক পায় বেশী, ভাবারও যোগান পায় তাদের কাছেই। কাটে বেশি এই জন্যেও যে তারা আর সবাইকে ছেড়ে ওকে ডেকে নেয় বেশি। কথা বলবার বয়স হলেও, ওর জিভের আড় ভাঙেনি এখনও। জিভের ডগায় এদিকে দুনিয়ার খবর—বড়দের কাছ থেকে সংগ্রহ করা, তার ওপর নিজের মতামত আছে—ট'কার-ড'কার-বহুল উচ্চারণে যখন আওড়ে যায় সব লাগে বড় ভালো। "মা-ডুগ্‌গা বললেন—"শাবনি টোর ডিডি ঠুপা কোটায়? টাকে পাটিয়ে ডিবি ঠিগগীর···"

বড়দের কাছ থেকে থেকেই ওর কাছে দুনিয়ার যত খবর। সবাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। শ্রাবণী গিন্নীদের মতোই ঠোঁট জড়ো করে বলে—"চালের ডর আড়াই টাকা, মাছের ডর চার টাকা, লোকে টাবে কি?" বাবা কাকাদের অনুকরণে অফিসের কথা আওড়ায়, দাদা দিদিদের অনুকরণে, স্কুল-কলেজের। কোলে টেনে নিয়ে শোননা কত শুনবে। একটি সবাক গেজেট। দক্ষিণা মাত্র দু'টো টফি বা বিস্কুট।

এ বছরের পূজোও এসে গেল। কত যে স্বপ্ন দেখেছে শ্রাবণী, মাদুর্গা এসে পড়লেন—তারপর যেই ঘুম ভেঙে যাওয়া, কোথাও কিছু নেই। এত রাগ ধরত শ্রাবণীর! তার ওপর আজ সকালে স্বপ্ন দেখছে না তো?—ভয়ে ভয়ে মনে করতে গিয়ে ছাখে, না, সত্যিই মা দুর্গা এসে গেছেন। আর বছরের একটু একটু মনে-পড়া মা দুর্গা এসে গেছেন। আরও কত স্পষ্ট। মা-দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অসুর, সিংগি—সবাই। কাকীমা চিনিয়ে চিনিয়ে দিত সব মনে পড়ে গেল ওর। আর বছরের চেয়ে এবছর বড়ও হয়েছে শ্রাবণী; এইবার মা-সরস্বতী যখন একলা পূজো নিতে আসবেন, শ্রাবণীর হাতে-খড়িটা দিয়ে দেবেন। ওর খুব ইচ্ছে ছিল, এবারেই দিয়ে যান, বড় হয়েছে, তবু দিদির সঙ্গে বইখাতা

নিয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। ব'লে দেখবে, যদি রাজি হন।

তাই ঠিক করেই এসেছিল, তারপর, জিজ্ঞেস করবে কি, এখানে এসে ও যত? দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। প্রথমটা তো পুজো দেখেই। আর বছরেও, যখন ও এত বড় হয়নি, এই রকমই হয়েছিল নাকি? আর-বছর এ-বছর মিলিয়ে কি গোলমাল হয়ে গেছে, ঠিক মনে করতে পারছে না শ্রাবণী। আর বছরেরটা বাড়ির লক্ষ্মী পুজো, সত্যনারায়ণ পুজোর সঙ্গে কি করে যেন মিশে গিয়েছিল আস্তে আস্তে; এখন এ যা দেখছে যেন দেখে শেষ করে উঠতে পারছে না। কী চেহারা মা দুর্গার, আর অন্য সব ঠাকুরদের! কী সাজগোজ! কী গয়না! কত ফুল! কত পেসাদ বড় বড় থালায়। কী ধূপ-ধুনোর গন্ধ ঘরময়! মা-সরস্বতীকে বলবে কি, ঠাকুমা-মা-কাকিমা আর কত সব মেয়েদের সঙ্গে বসে ও যেন দেখে দেখে ফুরিয়ে উঠতে পারছে না।

তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করতে করতে পুরুতমশাই উঠে দাঁড়াতে আর সবাইয়ের সঙ্গে শ্রাবণীও উঠে দাঁড়াল। তারপর আরও কত পুজোর ঘটা। আর-ও কত রকম বাজনার সঙ্গে কত আলো জ্বেলে পুরুতমশাই মা-দুর্গার চারদিকে ঘোরাতে লাগলেন, আরও কত কি সব দিয়ে। শেষ হয়ে গেলে হাতে ফুল নিয়ে পুরুতমশাইয়ের কাছে শুনে শুনে শ্রাবণীও "ঠব্বমন্দল মন্দল্যে" বলে ঠাকুরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। তারপর আবার মন্ত্র পড়িয়ে পুরুতমশাই বললেন, "এবার যার যা চাই-বার ঠাকুরের কাছে চেয়ে নাও মনে মনে।"

এতক্ষণ বেশ চলছিল, এইখানে এসেই ধাঁধায় পড়ে গেল শ্রাবণী। ওর চাই-বার আছে বৈকি, বাড়ি থেকেই স্থির করে এসেছিল, মা সরস্বতীকে বলবে, তিনি কবে আসবেন, কবে না, তার চেয়ে এইবারে যদি হাতেখড়িটা দিয়ে যান তো ভালো হয়; ওর বই খাতা শ্লেট অনেক জমা হয়েছে; তবু দিদির সঙ্গে স্কুলে যেতে পারছে না, বললও তো মনে মনে; কিন্তু মা সরস্বতী তো কিছু বললেন না। মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হোল, যেন একটু একটু হাসছেন, কিন্তু কথা কয়ে না বললে ও বুঝবে কি করে? রাজি হন তো ওকে আবার উপোস করে থাকতে হবে তো।

এতক্ষণে ওর একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে খুব আশ্চর্য লাগছে। পুজোর গোলমালের মধ্যে খেয়াল হয়নি,—এত ফুল দেওয়া হোল, পুজো করা হোল, কত কি হোল, কোনও ঠাকুরই একটা কোনও কথা বলেননি। ভীষণ আশ্চর্য লাগছে শ্রাবণীর। একটু যেন ভয় ভয়ও করছে। ঠাকুর নিয়ে অত কথা ভাবতে

নেই যে বলেন মা—ঠাকুরের এটাও তার মধ্যে পড়ে যায় না তো? ভয়ে ভয়েই ক'বার চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখল—সব ঠাকুরেরই দিকে, যেমন এসে দেখেছিল, সব ঠাকুরই একভাবে দাঁড়িয়ে, যার যা হাতে ছিল তাই নিয়ে, মুখে একটু করে হাসি। সবার সঙ্গে ওখান থেকে চলে আসবার সময়ও একবার ঘুরে দেখল, সেই এক ভাব। বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে।

তাছাড়া একটা মস্তবড় ভাবনাতেও যে পড়ে গেছে শ্রাবণী। ও যে সবাইকে আর বছর বলেছিল যে মা-দুর্গা ওকে অত কথা বললেন, এখনও ডেকে ডেকে শোনে সবাই, আর বছর কথা বলেছিলেন বলেই না বলেছিল, তা না হলে ওকি জানে না, ওঁদের নামে মিছে কথা বলতে নেই? অবিশ্যি, এখন মনে পড়ছে না কি ভাবে ডেকে কিভাবে বলেছিলেন; অতদিনের কথা, কি করে মনে থাকবে? তবে বলেছিলেন তো নিশ্চয়, এবারে তা হলে কি হোল?

আরও ভাবনা, বাড়ি গিয়ে তাহলে বলবে কি? গেলেই তো ওকে ঘিরে ধরবে সবাই।

অত দেরীও হোল না। কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন "আজ শ্রাবণী যে বড় চুপচাপ? মা কি বললেন রে শ্রাবণী তোকে?"

স্বপা রাগাবার জন্যেই বলল—"মা-দুর্গা এবার ওর সঙ্গে কথাই কননি, রাগ হয়েছে তাই।"

শ্রাবণী ঘুরে চোখ পাকিয়ে বলল—"টুই চুপ কর্।"

তা দিক ধমক, কিন্তু কত কি যে মনে হচ্ছে। যেন কান্না ঠেলে আসছে এক একবার ঠাকুরের ওপর অভিমানে। না, আর কোন-মতেই আসবে না শ্রাবণী; কোনমতেই না। কি হোল এবার যে কোনও কথাই কইলেন না? কী তাহলে বলবে গিয়ে বাড়িতে?

এর পরই হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল, শ্রাবণী বুঝতে পারছেনা, মা-দুর্গাই সব ঠিক করিয়ে দিলেন ওর রাগ অভিমান দেখে, না, আপনা আপনিই ঠিক হয়ে গেল?

মন্দির থেকে বাড়ি আসতে আসতে ঠাকুমা প্রিয়নাথের খাবারের দোকানের সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে বললেন—"ও প্রিয়নাথ, কালকের জন্যেও দু'সের সন্দেশ রাখবে, কিন্তু আজ একি সন্দেশ দিয়েছ বাছা, মার্বেল গুলির মতন, মার সামনে ধরে দিতে যে লজ্জা করে।"

প্রিয়নাথ বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে বলল—"কি করব মা? উনিই যে এই অবস্থা করেছেন, বাজারে চিনি নেই দুধের এই অবস্থা।"

ঠাকুমা বললেন—"তা বটে। তবু কাল অষ্টমী, দেখো ওরই মধ্যে একটু।"

পেয়ে গেল শ্রাবণী, এবারে জিজ্ঞেস করুক না কে কত কয়বে। প্রথমেই বড় বোন স্বপাকে একটা খোঁচা দিয়ে নিল সন্ত সন্ত। ভারী মুখটা আরও গোল করে বলল—"টুই কী জানিস মা-ডুগ্‌গার কটা?"

"জানিনাই তো, শিখব তোর কাছে।" স্বপা দুষ্টুমি করে হাসল।

"ঠিকবিই টো"—মুঁখ গোঁজ করে উত্তর দিল শ্রাবণী। তারপর সমস্ত রাস্তা একটা কথাও বলেনি।

স্বপাই নেমে হৈ হৈ করতে করতে বাড়িতে ঢুকল—"সবাই এসোগো, মা-দুর্গার সঙ্গে শ্রাবণীর এবারে কি কথা হয়েছে শুনে যাও।"

সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে উঠানে—"কি বললেন রে মা-দুর্গা এবারে? কি বললেন রে শ্রাবণী? এবারে কার খোঁজ করলেন রে?

সবার মুখে আগে যা শুনেছে, এখুনি যা কানে গেল প্রিয়নাথের দোকানে, সব মিলিয়ে সমস্যা পূরণ হয়ে গেছে শ্রাবণীর।

হাত দুটো ঘুরিয়ে বলল—"কটাই কইলেন না এবার।"

"কেন রে?...কি ব্যাপার?...সেবারে অত কথা হোল তোর সঙ্গে"...সবাই জড়াজড়ি করে প্রশ্ন করে উঠল।

"টিনি ডিটে পারেন না—চাল টিন টাকা—মাছ সাড়ে টিন টাকা—টার ওপর বাপের বাড়ি এলেন সব্বাইকে নিয়ে......"

সবার একজোট দমকা হাসির মধ্যে বাকি কথা চাপা পড়ে গেল। তারপর কপট বিস্ময়ে—"হ্যারে, সত্যি কোন কথা কইলেন না? তোকে আর বারে অত কথা বললেন, এবার সত্যি দেখলি চুপ করে আছেন?"

না কথা কইবার রহস্যটি মিটে গিয়ে শ্রাবণী ভাষায় ভঙ্গীতে আবার পুরো-পুরি সেই পাকা গিন্নীটি, চোখ ঘুরিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল—"ডেকলুমই তো, লজ্জায় মাটা টুলটেই পারলেন না টো কটা কইবেন কি?"

কিংসের পার্ট

সবাই আশঙ্কা করছে, রেবা সোনার মেডেলটা বুঝি পেয়েও পেলে না।

বছর পাঁচেকের মেয়ে, এখনও খুব ভালো করে সব কথা উচ্চারণও করতে পারে না, কিন্তু কী অপূর্ব যে নাচ শিখেছে!

আজ ইউনিয়ন ক্লাবের থিয়েটার আছে পূজা উপলক্ষ্যে, রেবার নাচ আছে একটা। এই অধিকারে বাবার সঙ্গে রেবা স্টেজ, গ্রীনরুম সব ঘুরে ঘুরে দেখলে খুব। একেবারেই একটা নূতন জগৎ ওর দৃষ্টিতে। সাজপোষাক, জ্যেঠামশাইয়ের মতো দাড়ি গোঁফ, গুরুমশাইয়ের মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মায়ের মতো, দিদির মতো বড় বড় চুল, খোঁপা সব টাঙানো রয়েছে। বাবা বললেন, সবাই ঐগুলো পরে পার্ট করবে। রেবার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে; ভালো ক'রে জিজ্ঞেস করবে বাবাকে, তার আগেই একজন এসে কোলে করে নিয়ে গেল। ফুটফুটে ছোট মেয়েটি, সাজিয়ে-গুজিয়ে কাজল-পাউডার দিয়ে আরও চমৎকার দেখতে হয়েছে, ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

কাড়াকাড়ি করছেও অদ্ভুত রকম সব লোকে। একজনের লম্বা রাঙা দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা দড়ির মতো চুল, হাঁটু পর্যন্ত চারিদিকে ঝুলছে। একটা টুলের ওপর বসে সিগারেট খাচ্ছিল, বললে—"এখানে এসো তো খুকী,...একবার এখানে নিয়ে আয় তো রে ওকে, দেখি!"

যে নিয়েছিল তার বেশ রাজার মতো চেহারা আর পোষাক, বললে—"তোমার যা চেহারা বদিদা, আঁতকে উঠবে।"

তখনই লোকটা চুল দাড়ি সব টপ টপ ক'রে খুলে ফেলে কোলে জড়ো ক'রে রাখল; রোগা, নেড়া, হেসে বললে—"এবার হয়েছে?...এসো তো মা, এই দেখোনা, তোমার বাবার মতনই মানুষ।"

তবুও কেমন ভয় করে, আগেকার লোকটার সঙ্গে পা টিপে টিপে গেল। লোকটা একটা হাত ধরে নিজের কোলে বসিয়ে নিলে, দাড়ি চুল নীচে রেখে দিলে।

রাজার মত লোকটি বললে—"চমৎকার মেয়েটি, না? এইবারে ওর বাবা বদলি হ'য়ে এসেছে, পোস্টঅফিসের লোক। আর চমৎকার ওর নাচ, দেখবে'খন।"

রোগা লোকটা পকেট থেকে পয়সা বের করে রাজার হাতে দিয়ে বললে—"দুটো রসগোল্লা আনিয়ে দে দীনুর দোকান থেকে। তোমার কি নাম মা?"

হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরলে।

"রেবা ব্যানার্জি।"

"বাঃ, খাসা নাম। আমায় একটু নাচ দেখাবে না?" রেবার আর ভয় নেই, তবে লজ্জা তো আছে, চুপ করে রইল।

"রসগোল্লা দিলেও দেখাবে না?"

রেবা ঘাড় নেড়ে জানালে দেখাবে।

রসগোল্লা খাবার পর কিন্তু তাকে আর নাচতে হোল না। ঐ লোকটাই বললে—"নাঃ, তোমায় নাচতে হবে না, ভয় নেই।"

রাজার মতো লোকটার দিকে চেয়ে বলল—"এক্ষুনি সবাই জড়ো হয়ে যাবে।" রেবাকে বলল—"একদিন্ আমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখাবে তো?…বেশ। আমার চুল দাড়ি কিছুই থাকবে না সেখানে, ভয় নেই।"

হাসতে হাসতে আদর করে রাজার কাছে দিয়ে দিল।

সে বললে—"চল্ তোকে আরও সব দেখিয়ে আনি। আমায় কিন্তু একদিন নয়, রোজ নাচ দেখাতে হবে। বেশ তো?"

রেবা ঘাড় নেড়ে জানালো, দেখাবে।

…রাজা যেন আরও ভালো!

সবাই কি ক'রছে! দুজন নাপতে দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে দুজনের। তারপর একটা বড় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জন কয়েক লোক। দু'তিন জনের মার মতো, দিদির মতো শাড়ি কাপড় দুই-ই পরা মাথার চুল কিন্তু বাবার মতো ছোট ছোট। দু'তিন জনের আবার বাবার মতো কাপড়ও, শুধু জামা মার আর দিদির মতো।

সবাই মুখে হাতে সাদা সাদা কি মাখছে। একজন ঠোঁটেও রং মাখছে। একজন মেয়েকে একটি লোক ধরে সাজাচ্ছে—ভুরু কালো করে দিলে, চোখে কাজল পরিয়ে দিলে, গালে আরও রং দিয়ে দিলে, তারপর—একবার এদিকে ঘুরিয়ে একবার ওদিকে ঘুরিয়ে মুখটা দেখে নিয়ে বললে—"ফিনিস্, যাও।"

আর একজনকে বললে—"এবার তুমি এসো।"

বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে রেবার। এতবড় মেয়ের গালে রং, চোখে কাজল কখনও দেখেনি রেবা, রাজা ওকে নিয়ে একটু সরে এলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল "কার্ দিদি ও?

রাজা বলল—"কারুর দিদি নয়, ও পার্ট করবে কিনা তাই সেজেছে।"

ছোট জায়গা থেকে এই প্রথম বড় সহরে এসেছে, কিছুই বোঝে না রেবা, হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে রইল। রাজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বললে—"আজ থিয়েটারে ও রাণীর পার্ট করবে…ও করবে দাসীর পার্ট…ও করবে রাণীর মেয়ের পার্ট…"

"ফিনিছ্ কি?"

"ফিনিস্ মানে সব ঠিক হয়ে গেছে। এই যেমন দেখোনা, আমারও ফিনিস্।" মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে হাসল।

সত্যিই! এতক্ষণ ভালো করে দেখে নি রেবা, মুখে রংই তো, চোখে কাজলও রাজার, শুধু অত বেশি নয়।

জিগ্যেস করল—"তুমিও পাট কলবে?"

"হ্যাঁ।······তুমিও তো করবে, পরীর পার্ট, না? তাইতে কেমন নাচবে···"

ঠিক বুঝছে না রেবা, তবে নাচবে তো বটেই, মাথাটা নেড়ে জানাল—"হ্যাঁ"

ঢং করে একটা জোরে আওয়াজ হ'তে সবার মধ্যে তাড়াহুড়া ছুটাছুটি পড়ে গেল। রাজা বলল—"চলো ওদিকে, তোমার বাবাও আছে। আর একটা ঢং ক'রে আওয়াজ হলেই তোমায় ঐ ঐখানে গিয়ে নাচতে হবে, ভয় করবে না তো?

ভয় আর তেমন করছে না রেবার। বেশ লাগছে; যেন বড় খেলাঘর। অত-বড় চুল-দাড়িওলা লোকও যখন রসগোল্লা দেয় তখন নিশ্চয় ভয়ের কিছুই নেই।

ঘাড় নেড়ে জানালে······না, ভয় তার করবে না।

রাজা জানিয়ে দিলে—"তোমার বাবাও সামনেই থাকবে।"

"তুমি?"

—বেশ ভাব হয়ে গেছে। রাজা একটু বুকে চেপে ধরে বললে—"হ্যাঁ, আমি তো থাকবই। বাঃ, তোমার নাচ দেখব না? খুব ভালো করে নাচবে; কত কি দেবে সবাই তোমায়। নাচবে তো?" রেবা ঘাড় কাৎ করে জানাল নাচবে।

অদ্ভুত নাচলে ঐটুকু একটা মেয়ে। একেবারেই নূতন জায়গা, নূতন পরিবেশ, প্রথমটা একটু জড়তা ছিল, তারপর ওর ভেতরকার ছন্দই যেন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ওর ছোট্ট দেহখানির সমস্তটুকুকে আচ্ছন্ন করে ফেললে; আর সব ভুলেই ও নিজের আনন্দে তন্ময় হয়ে চলল নেচে। একটি যেন ফুলঝুরি, তার ভেতর থেকে চঞ্চল আলোর স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সবাইকে করেও তুললে তন্ময়; দু'দু'বার 'এনকোর' পড়ল, অবশ্য শেষ হোল একেবারেই। বেরিয়ে এলে আবার একচোট আদরের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তারপর নাটকটা আরম্ভ হবার আগে ম্যানেজার ওকে সঙ্গে করে স্টেজে দাঁড়িয়ে জানালেন, সিভিল সার্জেনের বিশেষ অনুরোধে রেবার নাচ আর একবার অভিনয়ের মাঝামাঝি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তিনি রেবাকে একটি সোনার মেডেল দেবেন বলে ঘোষণা করে দিতে অনুমতি করেছেন।

সিভিল সার্জেন বাঙ্গালী।

যশের তাৎপর্য বোঝার বয়স নয় রেবার, নগদ যেটুকু আদর পাচ্ছে তাই ওর যথেষ্ট। বরং সেদিকে ওর বেশি মন নেই; ওর সমস্ত চেতনাটিকে অভিভূত করে

রেখেছে এই পার্ট করার ব্যাপারটা। ও রাজাকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে ক্রমাগতই গ্রীনরুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।—যেখানে মুখে ঠোঁটে হাতে পায়ে সবাই রং মাখছে চোখে কাজল টানছে; চুল সামলে, শাড়ি সামলে আবার হন্ হন্ করতে করতে ও যেখানে নেচেছিল সেইখানে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'একবার ওদিকেও গেল রেবা, সেখানে গিয়ে ওরা চেঁচামেচি করছে, হাসছে, কাঁদছে,—আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা সব।

রাজাকে জিগ্যেস করছে—"ওটা কিসের পাট?"

উত্তরে বিশেষ কিছু পরিষ্কার হচ্ছে না ব'লে প্রশ্নেরও অন্ত নেই।

এর মধ্যে সিভিল সার্জেনের আর্দালি এসে খবর দিলে—যে মেয়েটি নেচেছে তাকে তিনি একবার দেখতে চাইছেন; একটা বিরতি চলছে তখন, রেবার বাবা ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন।

প্রেক্ষাগৃহের একদিকে দু'সারি চেয়ার পাতা, সামনের দিকে যে কয়জন বসে আছেন, প্রায় সব কোট প্যাণ্ট পরা। তারই মধ্যে মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও আছেন। তাদেরই সামনে দিয়ে চলল রেবা, আগে আগে আর্দালি, পেছনে বাবা—চলতে চলতেও আদর, প্রশংসা—"এই মেয়েটিই নাচল না?···বাঃ, চমৎকার!··· দেখি মা তোমার একটু", "বাঃ তুমিই নাচছিলে?···কোথায় শিখলে মশাই এমন নাচ এতটুকু মেয়ে।···আর শিখলেই বা কবে?···"

মাঝবয়সী একজন স্ত্রীলোক খানিকটা আটকেই রাখলেন, একরাশ প্রশ্ন করে ওর বাবাকে তাদের বাড়ি নিয়ে আসতে বললেন একদিন।

আর খানচারেক চেয়ার পরেই সিভিল সার্জেন বসে, আর্দালি সেইখানে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি রেবাকে কোলে টেনে নিলেন; ওঁর স্ত্রী তখনও আসেন নি, পাশের চেয়ারটা খালি ছিল, রেবার বাবাকে তারই ওপর বসতে বললেন।

সায়েবদের মতো লাল চেহারা। রেবা প্রথমটা ঘাবড়েই গিয়েছিল, তারপর মিষ্টি মিষ্টি বাংলা কথায় তার ভয়টা গেল ভেঙে।

"তোমার নামটি কি বলো তো।"

"সিমোতি রেবা ব্যানালজি।"

সিভিল সার্জেন রেবার বাবার দিকে চেয়ে বললেন—"এখনও যে ভালো কথা ফোটেনি মশাই, এর মধ্যে এমন নাচ শিখলে কোথায়?···হ্যাঁ গো, রেবা ব্যানালজি, কোথায় শিখলে তুমি এমন নাচ?"

"খাছি ছিকিয়েচে।"

ওর বাবা একটু হেসে বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর মামার বাড়ীতে চর্চা আছে একটু। সেইখানেই কিছুদিন ছিল। সেই যা শিখেছে, একটু একটু প্রাকটিস করে···এসব জায়গায় সুবিধেই বা কোথায় বলুন? বিশেষ ক'রে এতদিন যে পাড়াগাঁয়ে পড়ে ছিলুম!"

"না, একটা পার্টস—আর রেবার পার্টস্, নষ্ট হতে দেবেন না।···গান গাইতে পার খুকুমণি?

চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরলেন নিজের দিকে। রেবা উত্তর করলে—"পালি।"

ওর বাবা হেসে বললেন—"ঐ রকম ভাষায়।"

"তা হোক, ওর ভাষাই তো ওর গানের আসল জিনিস।···

···তুমি এইবার যে নাচবে সিমোন্তি রেবা ব্যানালজি তার সঙ্গে গাইতেও হবে, কেমন?

রেবা ঘাড় নেড়ে বললে—"আচ্ছা।···আমি পাটও কলব।···এই দেখো না—ফিনিছ্ হয়েচি

সিভিল সার্জেন হেসে উঠলেন, বললেন—"অ্যাম্‌বিশন্ কম নয়তো! তা করবে পার্ট, এইবার যা নাচবে গাইবে সব সরস্বতীর পার্টে কেমন, হোল তো? খুব ভাল করে নাচবে গাইবে, তা'হলে দুটো সোনার মেডেল—একটা নাচের, একটা গানের।···আর সরস্বতী সাজবারও মেয়ে আপনার!···হ্যাঁ, ওটা কি বললে—ফিনিছ্ হয়েছি!"

ওর বাবা টীকা ক'রে বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সিভিল সার্জেনের স্ত্রী এসে উপস্থিত হওয়ায় যেমন একদিক দিয়ে বাধা পড়ল, তেমনি আবার বোধ হয় প্রয়োজনও হোল না।

বেশ একটু মোটাসোটাই, যেমন হওয়া উচিত, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে, হয়তো একটু বেশিই, মুখটা গোল, রং ফরসাই মনে হয়, বাঁ হাতের মণিবন্ধের ওপর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝোলানো, ডান হাতে রুমাল, চোখে চশমা।···সামান্য কেউ একজন যে নয় এই জ্ঞানটিতে সমস্ত শরীর যেন কানায় কানায় ভরা রয়েছে। রেবার বাবা সরে দাঁড়িয়েছিলেনই, সেই চেয়ারটি ভরে বসলেন ভদ্রমহিলা। খানিকটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, আসেপাশের সবাই যেন একটু তটস্থ হয়ে পড়ল, ঐ একটি মানুষ এসে বসাতেই জায়গাটিতে বেশ একটু পরিবর্তন হয়ে গেল।

সিভিল সার্জেন বললেন—"তুমি দেরী করে ফেললে,—একটা জিনিস মিস্ করেছ, এই মেয়েটির নাচ, কী চমৎকার যে নাচল!"

"তাই নাকি?" বলে রেবার মাথায় হাত দিলেন, "দেখতেও চমৎকার তো।"

—টোনটি খাঁটি মেমসাহেবের মতো।

সিভিল সার্জেন বললেন—"এই এঁর মেয়ে।"

মেমসাহেব যেভাবে রেবার বাপের চেহারা আর পোষাকের ওপর অপাঙ্গে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন, মনে হোল যেন নিরাশ হয়েছেন; তাঁকে এমন মেয়ের জন্য কিছু অভিনন্দিত-ও না করে, স্বামীর দিকেই চেয়ে বললেন—"তো আমি আর দেখতে পাব না?" ... কি গো খুকুমণি, আমায় দেখাবে না নাচ?"

সিভিল সার্জেন হাসতে হাসতে বললেন—"খুকু, বলো একটা মেডেল দিলে নাচব।"

তারপর স্ত্রীর পানে চেয়ে বললেন—"ও ইতিমধ্যেই একটা সোনার মেডেল আর্ন (earn) করেছে।"

"তাই নাকি?...কি, আর একটা মেডেল পেলে নাচবে তো?"

কাছাকাছি সবাই একটু গলাটা বাড়িয়ে কথাবার্তাটা শুনছে, ওদিকে স্টেজের পর্দা এখনও ওঠেনি।

রেবা অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

"কি গো নাচবে না, আর একটা মেডেল পেলে?"

রেবা তবুও অবাক।...সেইরকম রং মাখানো মুখে, গালেও সেইরকম, ঠোঁটেও সেইরকম, চোখেও যেন মনে হচ্ছে সেইরকম কাজল আছে একটু একটু...ঠিক বুঝতে পারছে না রেবা, তারপর একবার কি ভেবে স্টেজটার পানে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে স্তিমিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"তোমাল ফিনিছ্?"

ওর ভাবগতিক দেখে সবাই একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, প্রশ্নটাও একেবারে নূতন, সিভিল সার্জেনই প্রশ্ন করলেন "ফিনিছ্ কি?...ইনি বলছেন, আবার নাচলে তোমায় আর একটা মেডেল দেবেন।

...'ফিনিছ্' কি বলোতো?"

রেবার বাপ বুঝেছেন, শঙ্কিতও হয়ে পড়েছেন, বললেন—"আমি তাহলে ওকে নিয়ে যাই এখন...দেখি, পারিতো এই সিনের আগেই না হয় নামিয়ে দোব।...আয় রেবা।"

রেবা সিভিল সার্জেনের স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে আছে, সেইদিকেই আঙুল বাড়িয়ে বলল—"ঐ তো ফিনিছ্...তোমাল কিছেল পাট?...

ওর বাপ সিভিল সার্জেনের আলগা হাত থেকে ওকে টেনে নিয়েছে; পর্দাও উঠে গেছে ওদিকে, পেক্ষাগৃহের মধ্যে যে একটা গোলমাল ছিল সেটাও গেছে থেমে। শুধু বাপের পাশে পাশে চেয়ারের সারির সামনে দিয়ে যেতে রেবার প্রশ্নটা যাচ্ছে শোনা—"ওল্ কিছেল পাট?...হ্যাঁ বাবা, বলোনা ও ফিনিছ্ হয়েচে—এবাল কিছেল পাট কলবে?..."

ঝিমিমনির বেড়াল

একটা ছোটখাট আলাদা বাড়ি হলেই ছিল ভালো, কিন্তু তা পাওয়া গেল না। অগত্যা এই ব্যবস্থাই করতে হ'ল।

একটা মাঝারি গোছের একতলা বাড়ি;এক পাশে টানা পাঁচিল দিয়ে তারই পাশে ছোট ছোট দুটো ঘর, খানিকটা রক আর খানিকটা উঠোন আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, একজনের বেশ চলে যায়। অপর অংশটায় গৃহস্বামী নিজে থাকেন তাঁর ছোট পরিবার নিয়ে। বিদেশে চাকরি করতে আসা, আত্মীয়-স্বজন না থাক, একটা পরিবারের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকাও একটা ভরসার কথা। অফিসের লোকের কাছে, আর খানিকটা এদিক-ওদিকেও খবর নিয়ে জানল, পরিবারটি ভদ্র।

নতুন চাকরি নিয়ে এখানে এসেছে সরোজ। পরিচয়াদি হয়নি এখনও। দশটা-পাঁচটা অফিস বাদে, সকালে কিছু অফিসের ফাইল, বিকালে একটু ঘুরে আসা, তারপর বাকি সময়টা বই। রান্নার পাট অফিসের পিওনের হাতে; সেরে-সুরে সরোজের সঙ্গেই অফিসে চলে যায়। আবার সঙ্গেই আসে। একটা ছোকরা চাকর এনেছে বাড়ি থেকে, চলে গেলে বাড়িতে থাকে। তারপর পাশে তো লোক রয়েছেই।

মন্দ লাগছে না একরকম। বাড়ির জন্য মনটা মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়ে একটু, কিন্তু উপায়ই বা কি? এ তবু একটা পরিবারের সঙ্গে এক ছাতের নীচে রয়েছে জীবনের নিত্য-স্রোতের একটা মৃদু কলধ্বনি নিয়ত এসে কানে পৌঁছুচ্ছে, আলাদা হয়ে থাকলে সে তো আরও হ'ত দুঃসহ।

কেটে যায় একরকম। শুধু এক-একদিন বিকেল-বেলাটা বড় কষ্টকর হয়ে ওঠে। বর্ষাকাল। সকালে কিম্বা রাত্রে বৃষ্টি নামলে মন্দ লাগে না; সকালে থাকে অফিসের কাজ একটু-আধটু। রাত্রে থাকে বই; নিজেকে নিয়ে বেশ নিবিড় হয়ে বসা যায়। বিকালে কিছু থাকে না হাতে; বই পড়বার সময় নয়, অফিস থেকে সদ্য ফিরে আর ফাইলের দিকে চাইতেই ইচ্ছে করে না। বৃষ্টি নামলে পাশের বাড়ির কলধ্বনিও যায় লুপ্ত হয়ে; নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ, নিরুপায় বলে মনে হয় তখন।

এখানে আসবার সপ্তাহখানেক পরে একটি বিকালের কথা। দিনটা আবার রবিবার। অফিসটুকুও নেই, একমাত্র নিজেকে নেড়ে-চেড়ে আর কত বৈচিত্র্য আনা যায়? বিকালটির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, আজ বেশ বড় ক'রে একটা চক্কোর দিয়ে আসবে, তারপর রোদটা নরম হ'য়ে আসতে বেরিয়ে পড়বার জন্য পাঞ্জাবী আর ছড়িটা আলনা থেকে পেড়ে

নিতে যাবে। জানলা দিয়ে নজর পড়ল পশ্চিম আকাশে তুমুল সমারোহ। মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন আর বিদ্রোহী হয়ে উঠল—যেন অলক্ষ্যে কার একটা অহেতুক বিরূপতা! সরোজেরও জিদ দাঁড়িয়ে গেল একটা, বেরুবেই।

আর একবার মেঘের দিকে চেয়ে নিয়ে চ্যালেঞ্জ হিসাবেই পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নিল, তারপর ছাতাটা নিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়াল সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে এক দৌড়ে উঠান পেরিয়ে রক ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং চকিতে একটু এদিক-ওদিক দেখেই টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে গুটিয়ে-সুটিয়ে দরজার দিকে ফিরে বসল।

চমৎকার বেড়ালটি, দেখে মনে হয় কাবুলী, মোটা-সোটা গায়ে সাদা-কালোর বড় বড় ছোপ, লম্বা লম্বা চুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

যেমন নির্ভয়ে এসেছে, বোধ হয় গায়ে হাত বুলোতেও দেবে। হাত বাড়াতে গেছে এমন সময় আর একটা দৃশ্য! একটি বছর আটেকের ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠানে এসে পড়ল এবং চকিতদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে—"তবে রে শয়তানী!"—বলে বেড়ালটির মতনই এক লাফে রক পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে পাঁজিয়ে ধরল। বলল—"এইবার।"

সরোজের সঙ্গে কোন কথা নেই, নিয়ে ঘুরে বেরিয়েই যাচ্ছিল, সরোজ প্রশ্ন করল—"তোমাদের বেড়াল?"

কথা যখন কইল তখন একনাগাড়ে অনেকখানিই ক'রে গেল ছেলেটি—"হ্যাঁ, দিদিমণির বেড়াল। দেখুন না, যত আগলে আগলে রাখছি সবাই মিলে—আপনি নোতুন ভাড়াটে জ্বালাতন করবে ত—তা ক্রমাগত পালিয়ে আসবার ফিকির। কেন জানেনত? এ বাড়িতে কাকীমার কাছে বড় আস্কারা পেত যে! আপনার আগে ওঁরাই ছিলেন তো, মহেন্দ্রকাকা, কাকীমা, টুনী আর সতু—খুব ভাব ছিল ওঁদের সঙ্গে, টুনীর সঙ্গে আমার আরও ভাব ছিল।"

জানাই, তবু প্রশ্ন করল সরোজ—"তোমাদের এই পাশের বাড়ি?"

কেন যে অদ্ভুত লাগল প্রশ্নটা, ছেলেটি একটু হেসেই মুখের ওপর চোখ তুলে উত্তর দিল—"তবে আর কোন্ বাড়ি হবে?"

তারপর বাইরের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—"যাই, বৃষ্টি এলো বলে।… চল্।"

বুকে চেপে আবার ঘুরতেই সরোজ পিঠে হাত দিয়ে রুখে দিল, বলল—"পাশের বাড়ি যখন, তখন আর ভাবনা কিসের? থাকো না একটু।"

কথা দিয়েই আটকে রাখবার জন্যে বলল—"দরকার কি তোমাদের শয়তানীকে

আটকে রাখায় ? আসতে দিও ; আমিও বেড়াল খুব ভালবাসি ; জ্বালাতন হব না।'

"ভয়ঙ্কর চোর, আপনি জানেন না তাই ! উপোষ করিয়ে মারবে। দুধ, মাছ যেখানে রাখুন, খুঁজে বের করবেই।...শেকল খুলতে যায়। দিশী বেড়াল নয় তো। কত রকম ফন্দি জানে ! শুধু, দিদিমণির আদরের। আমরা সবাই ত 'শয়তানী' নাম রেখেছি।"

বলার ভঙ্গিতে সরোজ একটু হেসে ফেললে, বলল—"তা হোক গে, সাবধান থাকব। তোমাদেরও তো উপোস করিয়ে রাখছে না রোজ। আর, তুমিও আস না কেন ?—কে কে আছে তোমাদের বাড়িতে ?"

"আছি, আমি, বাবা, মা, দিদিমণি—দিদিমণি কিন্তু..."

হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় ছড়-ছড় করে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের ওদিক থেকে একটি মিষ্টি গলায়—

"খোকা ! পেলে বেড়ালটাকে ! তা'হলে চলে এসো, বিষ্টি নামল যে, হুঁস নেই ?"

খোকা বেড়ালটাকে আবার বুকে চেপে ধরে বলল—"যাই এখন।"

আবার আসবে ?'

"আচ্ছা।"—বক থেকে ঘুরে বলল খোকা।

"বেড়ালটাকেও আটকিয়ো না আর।"

দোরের কাছে চলে গেছে, একটা সুবিধা হ'ল যে কথাটা বেশ চেঁচিয়েই বলতে হ'ল সরোজকে ; দেয়ালের এ-দিকেই থেকে যাবে না।

"ভয়ানক চোর কিন্তু, তা বলে দিচ্ছি।" মুখ ফিরিয়ে আর একবার সাবধান করে দিয়ে বেরিয়ে গেল খোকা।

বৃষ্টি বেশ জোরই নামল। নামুক যত জোরে পারে। যতক্ষণ পারে, আজ আর সরোজের একা-একা বোধ হচ্ছে না।

দু'টো দিন আবার 'শয়তানীর' দেখা নেই। খোকাবও নয়। এক-একবার মনে হয় চাকরটাকে পাঠিয়ে ডেকে নেয়। কিন্তু মাঝখানে "দিদিমণির বেডাল থেকে" কি একটা যে হয়েছে, এত সহজ একটা ব্যাপারেও অলক্ষ্যে সঙ্কোচ এসে যায়, হয়ে ওঠে না।। সর্বদা যে ওদিকেই মনটা রয়েছে এমনও নয়, কাজ, অফিস, বিকালে একটু বেড়িয়ে আসে, রাত্রে বই—বাঁধা রুটিন ধরে দিন যাচ্ছিল কেটে। তৃতীয় দিন বিকালে আবার আকাশটা যেন বিরূপ হ'য়ে উঠল। বেশি নয়, মনে হ'ল যেন পরিষ্কারই হয়ে যাবে, কিন্তু তিনদিন আগেকার স্মৃতিটাকে হঠাৎ এত স্পষ্ট ক'রে দিল যে, সরোজ বেশ একটু দোমনা হয়ে

পড়ল।...ডেকেই পাঠাবে না কি ছেলেটিকে? ক্ষতিটা কি? আসে না, ছেলেমানুষের একটা স্বাভাবিক কুণ্ঠা রয়েছে বলেই, সেটা ত কাটিয়ে দেওয়াই উচিত, তবু যা হোক একজন কথা কওয়ার সঙ্গী পাওয়া যায়, এইরকম বাতুলে দিনে। আর, এক বাড়িতেই রয়েছে, অথচ শুধু ভাড়া ঠিক করা নিয়ে সেই যে কর্তার সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল, তারপর পরিবারটির সঙ্গে বরাবর একটা অপরিচয়ের বাধা থেকে যাবে, এটাও কেমন যেন বোধ হ'তে লাগল সরোজের। একটু অগ্র-পশ্চাৎ করল, তারপর চাকরটাকে পাঠিয়ে দিল খোকাকে ডেকে আনতে, বলবে একটু কাজ আছে।

পাঠিয়ে একটু উৎকর্ণই হয়ে রইল। একটু পরে সেদিনকার সেই কণ্ঠের আওয়াজ—"খোকা, তুমি কোথায়?"

ওদিকে কোথা থেকে উত্তর এল—"এই যে!"

"এদিকে এসো!"

এর পর বেশ একটু চাপা গলাই। সরোজ নেহাৎ রকে বেরিয়ে দেওয়ালের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাই শুনতে পেল।

"নোতুন ভাড়াটেবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। যাও, কিন্তু জ্বালাতন করবে না। বাবা এলে বলে দোব তা'হলে। 'আর মেলা বকবে না, বড্ড বাচাল তুমি।"

খোকা যখন এল, সরোজ তখন ঘরের মধ্যেই একটা কাগজ পড়ছে মনোযোগ দিয়ে।

প্রশ্ন করল—"আমায় কাজের জন্যে ডেকেছেন? কি কাজ?"

কাজ আর কি?—হঠাৎ কি রকম মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সরোজের, প্রশ্ন করল—"কি কাজ করতে পার তুমি?"

খোকা কৌতুক-ভরা হাসি-হাসি চোখ দুটো তুলে ধরল, বলল—'বা—রে! ডেকে এখন কি কাজ করতে পারো?"

কথাটা ঘুরিয়ে নিল সরোজ। বলল—"বলছিলাম...আপনি কেন? তুমি। আর তোমাদের শয়তানী?"

খোকা চৌকাঠ টপকে ভেতরে চলে এল, একবার বাইরের দিকে ঘুরে চেয়ে নিয়ে আর এক পা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল—"বেঁধে রেখেছিল।"

সরোজও মুখটা একটু বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল—"তোমায়?"

হেসে ফেলল খোকা। সেই রকম গলায় বলল—"আমায় নয়, শয়তানীকে।"

সরোজও আবার সেই রকম গলায় বলল—"খুলে দিও।"

এরকম মনের মতো পরামর্শ, আর, এভাবে দেওয়ায় খোকা খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে; বাইরের দিকে আর একবার দেখে গলাটা আরও নামিয়ে বলল—"দিয়ে

এসেছি খুলে। দেখুন না, কোথায় কি আছে একেবারে ঘরগুলোতে ঘুরে দেখে নেবে তারপর...”

সরোজের দৃষ্টি অনুকরণ ক'রে উঠানের দিকে চেয়েই—“ঐ এসে গেছে”। ব'লে আর ফিসফিসিনি নয়; গলা ছেড়েই চেঁচিয়ে উঠল খোকা।

এবার তো তাড়া খেয়ে নয়, লেজটি সোজা ক'রে তুলে শরীর দোলাতে দোলাতে মন্থরগতিতে চলে আসছে শয়তানী, খোকাই লাফিয়ে গিয়ে পাঁজায় ক'রে নিয়ে এল। সরোজের সামনে বাড়িয়ে ধ'রে বলল—“তুলোর বস্তা। দেখুন না হাত দিয়ে, কিছু বলবে না। কোল-ক্যাংলা, দিদিমণির কোলে-কোলেই তো ঘোরে।”

সরোজ হাত বাড়িয়ে নিতেই যাচ্ছিল, তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা সঙ্কোচ এসে পড়ায় বিরত হয়ে পিঠের ওপর হাতটা টেনে দিতে একটা ঘড়-ঘড় শব্দ উঠল শয়তানীর বুকের মধ্যে থেকে। খোকা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শব্দটার নকল করে বলল—“ঘরর্ ঘরর্—ওটা কি জানেন? বলছে—তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল, এবার খেতে দাও।”

সরোজ বলল—“নৈলে চুরি করব।”

দু'জনেই হেসে উঠলো এমন সময় ওদিক থেকে আবার সেই কণ্ঠে—

“খোকা! বেড়ালটা আবার পালিয়েছে, কে খুলে দিলে ওকে?”

সরোজ বলল—“বলে এসো এখানেই আছে, আমি নিয়ে আসব।”

নিজেও উঠে পড়ল। রকের ধারে দেয়ালের কাছ থেকে কথাটা বলে যখন ফিরে এল খোকা, দেখে সরোজ একটা ছোট ডেকচি কাত ক'রে দুধ ঢালছে একটা প্লেটে। চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করল—“দুধ দিয়েছেন শয়তানীকে! নিজের খাবার দুধ থেকে?”

“নতুন ভাব হ'ল...নয়তো যদি চুরি করে খায় তখন দুধও থাকবে না, ভাবও থাকবে না, নয় কি?”

শয়তানী অনুমতির অপেক্ষা না করে কোল থেকে নেমে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। খোকা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। সরোজের কথায় শুধু ঠোঁট কুঁচকে একটু হাসল, তারপরে শয়তানীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মাথা নীচু করে তার পরিতৃপ্ত আহার লক্ষ্য করে যেতে লাগল।

অভিভূত হয়ে পড়েছে ব'লেই ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ মনে পড়ে যেতে সেই রকম অন্তরঙ্গতার সুরে বলল—“এক্ষুনি কি শুনে এলুম দেওয়ালের ওদিকে, বলুন ত?”

“তুমি শুনলে, আমি কি করে বলব?’

খোকা আর একটু গলাটা নামিয়ে নিল—

"মা বলছে—'থাক না বাপু! ছেলেটি যদি ভালোবাসে বেড়াল, না জ্বালাতন হয়, তো তোর অত মাথাব্যথা কেন? ও বলেছে—'আমি আর ঢুকতেই দোব না পোড়ারমুখীকে, দেখি, জ্বালাতন হন কিনা।'…শুনলাম আমি, হ্যাঁ!"

"ভালোই তো। তোমাকেও না ঢুকতে দেয় তোমার দিদি, আরো ভালো হয়, আমরা তিনজনে বেশ থাকি, তুমি, আমি আর শয়তানী। কি বলো?,'

"উঃ, তা' হলে যা মজা হয়!…"

চাকরটা একটা বিস্কুটের টিন কাটতে কাটতে উপস্থিত হ'ল। খোকা কতকটা উৎফুল্ল, কতকটা বিস্মিত হ'য়ে উঠল, প্রশ্ন করল—"আবার বিস্কুটও খাবে?"

সরোজ একটা প্লেটে খান আষ্টেক রেখে ওর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল—"ওকে জিগ্যেস করতে হবে পছন্দ কিনা, তোমায় তো জিগ্যেস করতে হবে না, খাও।"

প্রবল আপত্তি তুলল খোকা, লুব্ধদৃষ্টিতে প্লেটটার দিক থেকে শরীরটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে বলল—"না কক্ষনো না। আমায় হ্যাংলা বলবে দিদি।"

"তাই জন্যেই তো আরও দিচ্ছি আমি, হ্যাংলা ভাইকেও আর বাড়ি ঢুকতে দেবে না। তিনজনে বেশ থাকব আমরা—আমি, তুমি আর শয়তানী।"

তাই প্রায় দাঁড়াল, যদিও বাড়ি ঢুকতে না দেওয়ার জন্য নয়। আরও দুটো দিন ওদিকে একটু কাড়াকাড়ি চলল, তারপর যেন এলে গিয়ে রাগ ঢিলে দিয়ে দিল। খোকার তবুও ইস্কুল আছে, তার জন্য পড়াশুনা আছে, শয়তানী তো একেবারে এ-বাড়ির বেড়াল হয়ে গেল। অবশ্য অমনি নয়—আলাদা দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, একসঙ্গে ঘন করে জ্বাল দেওয়া। মাছ তো আছেই, মুড়ো থাকলে সেটা শয়তানীর, যদি বাজারেই কোনদিন মাছ না রইল তো চাকরটাকে পাশের ডোবা থেকে পুঁটুলে ছিপে ধরতে হয় গোটাকতক শয়তানীর জন্য। চা বিস্কুট দু'বেলা।

খোকা চোখ বড় বড় করে—"উস!" করে একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ ক'রে ব'লে—"এত আদর, চা-বিস্কুট! কাকীমার কাছেও এত আদর পায়নি কখনও, দিদিমণির কাছেও নয়!"

বেড়ালটাকে মাঝে রেখে দু'বাড়ির মধ্যে অন্য দিক দিয়েও আড়ষ্ট ভাবটা অনেকখানি কেটে এসেছে। মন্তব্য হয় মাঝে মাঝে, এদিকে পৌঁছোয়, ওদিকেও নিশ্চয়ই পৌঁছে দেয় খোকা, একটা সূক্ষ্ম আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে বাড়ির দুটো অংশ যেন আস্তে আস্তে এক হয়ে আসছে।

সরোজ প্রসঙ্গটা থামতে দেয় না, বলে—"এমন আর কি আদর দেখলে, একটা

পোষা বেড়াল…"

খোকা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে—"চা-বিস্কুট। বাস রে!…নবাব একেবারে শয়তানী!…বাদশাজাদী।"

গলাটা খাটো করে নিয়ে মাথাটা দুলিয়ে ফিসফিস করে বলে—"কে বলে জানেন বাদশাজাদী?"

সরোজ স্বর অনুকরণ করে আন্দাজটা ইচ্ছে করেই উল্টে দিয়ে বলে—"মা নিশ্চয়।"

"বয়ে গেছে মার।"

তারপর এমন রূঢ় মন্তব্য কে করতে পারে, ঠোঁটের কোণে একটু হাসিতে, চোখের একটু ইশারায় সে সম্বন্ধে যেন মন জানাজানি হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে, এইভাবে প্রশ্ন করে—"আর কি বলে বলুন তো?"

"কি করে বলব?"—সকৌতুক হাসির মধ্যে দিয়ে বলে সরোজ।

বলে—"বোকাকে ঠকিয়ে খেয়ে নিতে দে খুব।…আপনি বলবেন না কাউকে যেন।"

সরোজ বলে—"অত বোকামি করি?…'বোকাকে' নিয়ে আর কিছু কথা হয় নাকি?—ভালো-মন্দ?"

"ভালো! সেই পাত্তোর কিনা! নাক সিঁটকেই আছে তো।"

একবার বাইরের দিকে চেয়ে নেয় খোকা, যার প্রসঙ্গ চলছে বোধ হয় তার মতো করেই নাকটা সিঁটকে নেয়, বলে—"ম্যাগ্‌গো! বেটাছেলে কোথায় ভালো একটা কুকুর পুষবে—ঝাঁউ ঝাঁউ করে বাড়ি মাতিয়ে ডাকবে, না, মেয়েদের মতন মেনী বেড়াল কোলে…মিউ-মিউ-মিউ।…দু'চক্ষের বিষ!"

আড়াআড়িটাও কম উপভোগ্য হয়ে ওঠে না, বিকেলে অফিস থেকে উঠোনে পা দিয়েই সরোজ হাঁক দেয়—"খোকা, শয়তানীকে নিয়ে এসো, চা-বিস্কুট খাওয়ার সময় হয়ে গেছে ওর।"

ওদিকে নিশ্চয় একজনের মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সরোজ একটা দুষ্টু হাসি ঠোঁটে করে বোধ হয় দেয়ালের দিকে একটু কান পেতেই আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরে ওঠে।

অন্য দিকও আছে। ও-বাড়ি থেকে ডিস্‌পারিটা আসটা আসছেই দু'বেলা। একটা নতুন কিছু হ'ল তো, তাও। নতুন কিছু করবার জন্য কি তাগিদও জাগছে,

দেওয়ালের ওদিকে কারুর মনে?

প্রতিদানে এদিক থেকে কি দেওয়া যায়?

সরোজ প্রশ্ন করে—"খোকা···ইয়ে, বলছিলাম—মা বই-টই পড়েন নাকি?"

খোকা একটু মাথা দুলিয়ে বলে—"পড়েন। এখন মহাভারত পড়ছেন।"

এর পর আসল উদ্দেশ্যটা কি করে প্রকাশ করা যায়, এই চিন্তা করছে সরোজ, খোকা দিদির কথা তুললেই যেমন গলা খাটো করে নেয়, সেইভাবে বলল—"দিদি জিজ্ঞেস করছিল—খোকা নতুন ভাড়াটে তোমার সরোজদা বই-টই পড়েন না?"

"তুমি কি বললে?"—একটা অবলম্বন পেয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্নটা করল সরোজ।

"বললাম, 'পড়েন ইংরিজী বই। শুনে সেই রকম নাক সিঁটকোয়—ম্যাগ্‌গো; বেড়াল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁর আবার ইংরিজী বই না হলে চলবে না। কত দেখব!"

এমনভাবে নাকটা কুঁচকে নকল করে বলে যে, বিরূপ মন্তব্য হলেও একটু হেসে উঠতে হয় সরোজকে। তারপর বলে—"কেন, তুমি আমায় বাংলা বই পড়তে দেখোনি?—দেখোনি নিশ্চয়, বাংলাই বেশী পড়ি আমি, অনেক রাত পর্যন্ত।"

লাইব্রেরীর গ্রাহক হয়েছে। পড়ার শখ আছে, সুতরাং কিছু আনিয়েও নিয়েছে বাংলা বই।

বই মাঝে ক'রে দু' বাড়ির, কিম্বা, আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, দু'জনের সম্বন্ধটা আরও নিবিড় হয়ে উঠছে।

কিন্তু ওদিককার ভাবটা সত্যই কি তাই? কেমন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ ওঠে মনে, খোকা যখন নাক তুলে ওদিককার মতটা জানায়—"খোকা নতুন ভাড়াটে তোমার সরোজদার সব ভালো, শুধু বেড়াল ঘাঁটাটা ছাড়তে বোল দিকিনি। ···ম্যাগ্‌গো! ব্যাটাছেলে হয়ে পারেন কি করে? আমারই গা ঘিন-ঘিন করে।

দোমনা হয় এক একবার। আবার মনকে প্রবোধ দেয় ওটা নিশ্চয়ই মনের কথা নয়, একটা ভান করা মেয়েছেলের। যেটা সবচেয়ে বেশী চায় সেইটে নিয়েই সব-চেয়ে বেশী নাক সিঁটকোয়, না?—

তা ভিন্ন শয়তানীকে নিয়েই তো সব, এমনই কী চমৎকারটি তার ওপর একজনের ভালোবাসাটাই ভালোবেসে ফেলেছে সরোজ তো, সে মুখে যাই বলুক না কেন, ছাড়ে কি ক'রে?

মুড়ো খাওয়ার, ঘন দুধ, চা-বিস্কুট। বুকে চেপে চেপে ধরে। খোকার সাম-

নেই। বলুক তো, তারপর একদিন এর ফয়সালা হয়েই যাবে।

মাসখানেক কেটে গেল। ছু'দিন নিমন্ত্রণও খেয়ে এল সরোজ। মা বসে খাওয়া-লেন, পরিবেশন করল মেয়ে।

তারপর একদিন ফয়সালাটাও হঠাৎ হ'য়ে গেল—

একটা ফটো নিচ্ছিল সরোজ। কোথায় একটা বাধা রয়েছে বলে আরও যেন ভালোবেসে ফেলেছে বেড়ালটাকে। দুধের প্লেটের সামনে বসিয়ে একটা পোজ নেওয়া হয়ে গেছে, আর একটার যোগাড় করছে, খোকা এসে উপস্থিত হ'ল।

"ফটো নিচ্ছ সরোজদা? শয়তানীর?" উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠলো।

সরোজ গোটা দুই 'পোজ' তুলে বলল—"এবার তুমি বোস চেয়ারটাতে শয়তানীকে কোলে নিয়ে। বেশ চমৎকার হবে।"

ঠিকঠাক করে দু'তিন রকমে বসিয়ে ফটো তোলা হয়ে গেল। খোকা একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

"এবার দিদিমণির কোলে দিয়ে একটা…হ্যাঁ সরোজদা—নিশ্চয়ই তুলতে হবে, কোন মতেই শুনব না আমি—কোন মতেই না—তুলতেই হবে…"

প্রবল বেগে মাথা দোলাতে লাগল, কোন আপত্তিই শুনবে না।

আপত্তি তেমন কিছু করেনি সরোজ, শুধু কিসের ঘোরে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একটু হেসে বলল—"সে কি করে হবে?…ইয়ে, তোমার মা রাজী হবেন?"

"হবেন না! ইস্!…দেখো মার ফটোও তোলাব, শয়তানীকে কোলে করে… !"

ঘোরটা যেন কেটেও কাটতে চাইছেনা।…আশা, না, দুরাশা?

সরোজ কতকটা দুরাশার নিরুৎসাহ কণ্ঠেই বলল —"তা বেশ, জিজ্ঞেস করো মাকে।"

দেরি সয় আর? খোকা কয়েকটা লাফে বেরিয়ে গেল। সরোজ এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। একটু পরে হাততালি দিতে দিতে ছুটে এল খোকা—"রাজী রাজী— !—রাজী !—রাজী !—রাজী !—রাজী !…"

শুনেছে সরোজ, শুধু যার ফটো তার মুখেই দুটো উল্লসিত কথা শুনতে পাবে ভেবেছিল।…সে এতক্ষণ নিশ্চয় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে পরখ ক'রে দেখছে, কি পোজে ফটোটা তুললে কি রকম দেখতে হবে।

এ-ক্যামেরাটা বড্ড ছোট, মাত্র ইঞ্চি দুয়েকের একটা ফটো ওঠে। ভালো ক্যামেরাটা দেশের বাড়িতে আছে। তা হোক, আর কি খরচের কথা ভাবা যায়।

সন্ধ্যার পরই বাজারে গিয়ে একটা ভালো দেখে ক্যামেরা কিনে নিয়ে এল সরোজ। …একটা বিশেষ প্রয়োজনে, একটা বিশেষ দিনে কেনা হয়েছিল বলে জীবনের একটা বিশেষ সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

"একটা ভালো ক্যামেরা কিনে আনলাম খোকা, ওটা বড্ড এতটুকু তো।…

দু'বাড়িতে একটা যেন সব জানাজানি হয়ে যাচ্ছে কি করে। খোকার উৎসাহ আর কল্পনাশক্তি যেমন বয়সের তুলনায় একটু বেশি, তাতে যা সব এদিকে হয়, চার গুণ হয়ে দেখা দেয় ওদিকে।

"বলছিলাম—নতুন ক্যামেরাও একটা কিনলাম খোকা।…ইয়ে তুমি একটু খুঁৎখুঁত করছিলে।"

"তা, তোলাটা হবে কবে?" খোকা তো আজ হলে কাল চায় না।

"কিন্তু সে তো হতে পারে না"—সরোজ বলল—"তোমার বাবা না বললে তো হবে না।"

"খোকা! শিগগির এসো একবার।…এলে?"—দিদির গলা। সেদিন কথাটা ঐ পর্যন্তই রয়ে গেল। খোকা আর আসতে পারেনি। বাইরে কি কাজ ছিল।

শুক্রবার আফিসের ছুটি ছিল, দরখাস্ত দিয়ে একটা দিন জুড়ে নিয়ে শুক্র, শনি, রবি তিনদিন বাড়িতে কাটিয়ে ফিরে এসেছে সরোজ।

ফটোগুলো তোলা হয়ে গিয়েছিল। তিনটে, খোকার কোলে বেড়াল, ওর দিদি শৈলর কোলে বেড়াল, ওর মার কোলে বেড়াল। শৈল ঘটা ক'রে সাজেনি, একটু যেন গুটিসুটি মেরেও যাচ্ছিল, সরোজকে কয়েকবার দূর থেকে ব'লেও ঠিক করে দিতে হচ্ছিল।

মা যে রাজী হতে চাইছিলেন না, সেটা যেন নিতান্ত মৌখিক,—যেন সরোজ একটু বলুক, জিদ করুক। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে ওঁর দৃষ্টি যে চকিতে কয়েকবার ওর ওপর এসে পড়ল—যেন নিজের মায়ের মতোই—তাতে সরোজকেও একটু সংকুচিত করেই তুলছিল।

শুধু খোকার বাবারটা তোলা হয়নি। তিনি আফিসের কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন, এবার একদিন তুলবে। অবশ্য বেড়াল-কোলে নয়। চারজন নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো।

এবার বাড়ি গিয়েও একটু হৈ-চৈ তুলে এসেছে সরোজ। আকস্মিকভাবেই বলতে হবে। ফটো-তিনটে কি করে অসাবধানতার জন্যে ওর ঘরের টেবিলে

একটা প্যাডের মধ্যে থেকে গিয়েছিল, ছোট বোন ছায়ার সব ওট্‌কানো অভ্যাস আছে, বের করে নিয়ে—"কী সুন্দর, ছাখো।" বলে ওদের বড় বোনকে দেখায়। তারপর থেকেই হৈ-চৈটুকু আরম্ভ হয়। সরোজেরও টান পড়ে প্রশ্নে প্রশ্নে। অবহেলা-ভরে, নির্লিপ্ততার ভাব দেখিয়ে উত্তর দিয়ে এসেছে।

ও আফিস থেকে এলেই আজকাল খোকাও খেলা ছেড়ে চ'লে আসে। কথা হয় নানা রকম। আজ এটা সেটার পর গ্রুপ ফটো নিয়ে কথা আরম্ভ হয়েছে, খোকা হঠাৎ একটু সরে এসে গা ঘেঁসে ব'সে বলল—বেশ গলাটা নামিয়েই —"একটা কথা বলব সরোজদা?—কাউকে—কাউকে—এক্কেবারে কাউকে বলবে না?"

"কথাটা কি আগে তাই বল।"

"ফটো তোলার কথায় বাবা মাকে বললেন—'বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে—ছেলে যেমন, ওঁদের খাঁই মেটাতে পারবে?' খাঁই কাকে বলে সরোজদা?"

সরোজ হঠাৎ চুপ করে গিয়ে জানলার বাইরে চেয়ে রইল। তারপর খোকার তাগাদায়, আরও একটু। তারপর উত্তরটা পেয়ে গেছে, এইভাবে মুখে একটু হাসি নিয়ে উঠে পড়ে বলল—"বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু খোকা, আমিও যেমন তোমার কথা কাউকে বলব না, তুমিও কখনও···"—ওরই নকল ক'রে বলল—"কাউকে—কাউকে এক্কেবারে কাউকে বলতে পারবে না—ঠিক তো?"

একটু ভ্যাবাচাকাই খেয়ে গেছে খোকা। নীরবে মাথা কাৎ করল।

বাড়ির তৈরী খাবার এনেছে। ওকে দিল। ওদের বাড়ির জন্যেও আছে, সওগাৎ হিসেবে। বেশ বড একটা প্লেটে করে এনে সামনে ধরে দিতে খোকা একেবারে শিউরে উঠে বলল—"বাব্বা এত!"

কী মনে হল, সরোজ একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল। কষ্টে নিজেকে সংবৃত করবার চেষ্টা করতে করতে বলল—"না, এটা তোমাদের সবার জন্যে—মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমায় আলাদা দিচ্ছি···"

কৌতুকের সঙ্গে অন্য আরও একটা কি মিশে গিয়ে, নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না।

উঠে গিয়ে একটা রেকাবিতে তার জন্যে নিয়ে এসে সামনে রেখে বলল—"কিন্তু যা বলছিলাম—কাউকে এসব বলবে না? কাউকে—কাউকে—"

খোকা একটু বিমূঢ়ভাবে মাথা কাৎ করে প্লেটে হাত দিল।

চুপ করে বসে রইল সরোজ।···খোকা যে বলবেই—দেবেই বলে—এবার সেই চিন্তা নিয়ে অন্য কি একভাবে মন কোথায় গিয়ে গিয়ে পড়ছে।

ঘটকালী

পাশের বড়ির লোকেনদার বিয়ে হবার কোন আশাই ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল।

বেশ চমৎকার বৌদিদিটি হয়েছে; ফুটফুটে, সর্বদাই হাসিখুশি। সবচেয়ে ভালো লাগছে চিন্ময়ীর; সংক্ষেপে চিনুর। অন্তত চিনুতো তাই ভাবে, এবং ভাববার কারণও আছে যথেষ্ট। বাড়ির কেউ তো চায় নি যে বিয়েটা হয়। লোকেনদাও তো চায়নি, বরাবর ব'লে এসেছে এখন তার পডবার বয়স, তারপর রোজগার করতে আরম্ভ করবে, তারপর বুঝে দেখবে তখন যে বিয়ে করা যায় কিনা। বিয়ের কথা উঠলেই মুখটা তোলোপানা ক'রে থাকত। এখন অবশ্য বাডির সবার স্ফূর্তি। লোকেনদাদা মুখটা তোলোহাঁড়ি ক'রতে ক'রতেও এক একবার হেসে ফেলছে, হয়তো হয়েছেও বা একটু একটু স্ফূর্তি সবার সঙ্গে ওরও; কিন্তু তা ব'লে চিনুর মতো?

চিনুর সঙ্গে এক শুধু ঠাকুরমাকে ধরা যায় ও-বাড়ির। সবাই বলছে উনি না থাকলে বিয়েটা হোতই না এখন। আর সত্যিও তাই, চিনুতো বরাবর দেখে এল। কিন্তু, ও যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরমাই কি কিছু করে উঠতে পারতেন?

প্রথম যেদিন কথাটা উঠল, বেশ মনে আছে চিনুর। ওতো এ-বাড়ির চেয়ে ও-বাডির মেয়েই বেশি করে; লোকেনদা আর ঠাকুরমার কাছে কাছেই থাকে। লোকেনদা পড়ছিল নিজের ঘরে, ও পাশের চৌকিতে পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। ঠাকুরমা গিয়েছিলেন মিত্তিরদের বাড়িতে। ওদের বাড়ির গিন্নীর অসুখ, বাডাবাডি হয়েছে, দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন—"অখিল বাড়ি আছে, না, বেরিয়েছে কোথাও গা?"

লোকেনদার বাবা ঘরেই ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন—"কেন গা মা?—এই তো রয়েছি, বেরুইনি কোথাও।"

"...যোগেনদার মা আছেন কেমন?"

"যতক্ষণ আছে, আছে, পেরমাই না শেষ হলে তো যেতে পারবে না। আমি বলছিলুম অখিল বলেছে অনেকেই, তবে তোরা তো কেউ কান দিবিনি তা এবার আর কোনমতেই শুনব না আমি—লোকুর বিয়ে দে।"

লোকেনদা পড়তে পড়তে থেমে গিয়েছিল, বললে—বড়্ বড়্ করিসনে চিনু, চুপ কর্; পড়ায় ক্ষেতি হচ্ছে আমার।"

বড়্-বড়্ তেমন করছিলও না চিনু, আস্তে আস্তে আস্তেই পুতুলের সঙ্গে কথা

কইছিল, সেটুকু বন্ধ ক'রে দিলে। লোকেনদাও মনে মনেই পড়াতে লাগল তারপর থেকে।

জানালার ধারেই বসেছিল চিনু। ঠাকুরমার কথা শুনে লোকেনদার বাবা বললেন—"বলেছ, আমরাও উত্তর দিয়েছি, মনে হয়েছে বুঝেছও আমাদের কথাটা; আবার কি হোল?"

ঠাকুরমা বললেন—"বুঝেছি একথা তোদের কে বললে, বলছি, শুনবিনি, আমার কথার আর তো দাম নেই এ-বাড়িতে, মুখ বুজে আছি। কি এমন বিবেচনার কথা বলছ তোমরা যে বুঝতে হবে? ঐ একটা মানুষ নাৎবৌয়ের মুখ দেখতে পেলে না বলে আপসাতে আপসাতে মরছে। আজও কথা কইতে পারছে না, তবু মিন্‌মিন্ করে আমায় বললে—'সাধ একটা নিয়েই যাচ্ছি অখিলের মা, আমার দশা যে কি হবে সেখানে!'…ন, এবার আমি কোন মতেই শুনব না অখিল, ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি ও রকম আপসাতে-আপসাতে মরতে পারব না।

লোকেনদার বাবা বললেন—"যোগেনদার মা অন্যায় বলেন নি মা, যোগেনদার ছেলেটির বয়েস হয়েছে, বিয়ে এতদিন ফেলে রাখাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু লোকেনের কীই বা বয়েস বলো? তারপর তোমার বয়েস আর যোগেনদার মার বয়েস—সেটাও ভেবে দেখো। তুমি লোকেনের বিয়ে না দেখে যাবেই বা কেন, আর তোমায় যেতে দিচ্ছেই বা কে? লোকেনের পর শুভেনের বৌ নিয়ে আসতে হবে তোমায়, তারপর—সে পরের কথা পরে।"

লোকেনদার বাবা হেসে হেসে বলছিলেন; ঠাকুরমা উঠোনে দাঁড়িয়েই কথা কইছিলেন—"হ্যাঁ, এই করি ব'সে ব'সে, মার্কণ্ডের পেরমাই নিয়ে এসেছি তো"—বলে গরগর করতে করতে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

ফোঁস ক'রে একটা নিঃশ্বাসের শব্দ হতে চিনু লোকেনদার দিকে ঘুরে চাইল। জানালার দিকেই চেয়েছিল লোকেনদা! মুখটা গোমড়া করে আবার বইয়ের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"সেই এক কথা ঠাকুরমার, শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।"

অন্য অন্য বার ঠাকুরমা এইরকম কথাটা তোলেন, লোকেনদার বাবা ঐরকম ক'রে উত্তর দেন, ঠাকুরমা গরগর করতে থাকেন, তারপর আবার ভুলে যান। ওঁর কীর্তন শুনতে যাওয়া আছে গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরে, কথকতা শুনতে যাওয়া আছে। গঙ্গাস্নান আছে, পূজো আছে; আরও সব কাজ আছে, রামায়ণ পড়িয়ে শোনা, ভাগবত শোনা। ভুলেই যান, আবার অনেকদিন পরে মনে পড়ে, আবার তোলেন কথা। এবার কিন্তু আর ভুললেন না। যখন-তখন ঐ কথা এনে ফেলেন। হয়তো খাচ্ছেন লোকেনদার মা,

জিজ্ঞেস করলেন—"অম্বল আর একটু দোব মা? বলছ ভালো হয়েছে।"

বললেন—"দাও না হয় একটু। কামরাঙার অম্বলটা লাগে বড্ড ভালো। আমি মলে আমার কাজে যেন ওটা করা হয় বৌমা।"

লোকেনের মার মুখটা ভার হয়ে গেল, বললেন—"ভলো লাগে খাও, তবে খাওয়ার সময় ও-সব অলুক্ষণে কথা বোল না বাপু।"

ঠাকুরমা হাসলেন, বললেন—"কথাগুলো ব'লে রাখতে হয় মা, আর কবে আছি কবে নেই। আর, আমাদের মুখে এসব কথা কি দোষের কথা? যার যেটা সাধ ব'লে রাখতে হয়। সাধের কথায় মনে পড়ে গেল,—হ্যাঁ, বৌমা, অখিলকে ব'লে দেখেছ? কি বলে? দেখে যেতে পাবনা নাৎবৌয়ের মুখ?"

তারপর এই কথাই হতে থাকে।

দুপুর বেলা, চিনু মাথার কাছে বসে পাকা চুল তুলছে, ঠাকুরমা লোকেনদার মাকে তাগাদা দিচ্ছেন মাঝেমাঝে—"হোল বৌমা তোমার?"

রামায়ণ শুনবেন ওঁর কাছে। লোকেনদার মা অনেকক্ষণ পরে হাত মুছতে মুছতে এলেন, বললেন—"পাটগুলো সারতে-সারতে দেরি হয়ে যায় মা।"

ঠাকুরমা বললেন—"তা বুঝিনে? একা মানুষ। এই জন্যেই তো বলি—লোকুর একটি বউ এনে দাও আমায়, আমরা দু'জনে আমাদের ঘর-সংসার নিয়ে থাকি, তুমি তোমার ঘর-সংসার নিয়ে থাকো। বলেছ অখিলকে?"

লোকেনদার মা বললেন—"বলছি বৈকি মা। তোমায় বা উত্তর, আমাযও সেই উত্তর। অন্তত এই পাশটা দিয়ে নিক, বয়েসও দেখছ।" তোমায় তো কিছু বলতে পারেন না, আমায় ধমকও খেতে হয়—বলেন, তুমি কোথায় মাকে বুঝিয়ে বলবে, না, উলটে সুরে সুর মেলাতে আরম্ভ করেছ! আর সত্যিই তো মা, না হয় অন্তত এই পাশটাও দিয়ে দিক না। মাঝখানে একটা বাগড়া পড়ে যাবে তো।"

ঠাকুরমার মুখটা ভার হয়ে গেল, একটু হেসেই বললেন—"তবুও অখিল বলবে বৌমা আমার সুরেই সুর মেলাচ্ছেন! নাও, তুমি পড়ো; এ সাধটুকুও মিটুক তো। নাৎবৌ দেখবার সাধ যা মিটবে তা দেখতেই পাচ্ছি।"

চিনুর বড় কষ্ট হয়; সে তো ঠাকুরমারই দলে। সে অবশ্য বুড়ো হয়নি, এখন অনেক দিন বাঁচবে। একদিন দেখবেই লোকেনদা'র বৌ, তবু মনে হয় যদি আজই হয়ে যেত বিয়েটা, একটি বেশ টুকটুকে বৌদিদি আসতো তো চমৎকার হোত। আর, ঠাকুরমার জন্যে সত্যিই বড় কষ্ট হয়। অত কাত্‌রে কাত্‌রে বলছেন, কেউ কথা শুনছে না। ইচ্ছে হয় কিছু করে সে। কিন্তু কী যে করবে ভেবে পায় না।

অখিলকাকা তার কথা শুনবেন না, কাকীমাও না। লোকেনদার কাছে কিছু কিছু কথা চলে ওর, চেষ্টাও করেছিল একবার কিন্তু যা দাবড়ানিটা খেয়েছিল আর সাহস হয় না। ও অবশ্য একেবারে যে বিয়ের কথাই তুলেছিল তা নয়; কিছু দরকার থাকলে পড়ার সময় যেমন মাথায় হাত বুলোয় তেমনি হাত বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞেস করেছিল—"তুমি ঠাকুরমাকে তো ভালোবাস লোকেনদা, নয়?"

লোকেনদা পড়তে পড়তেই যেমন বলে তেমনি ক'রে বললে—"হঠাৎ ঠাকুরমাকে ভালোবাসার কথা যে?"

চিনু বলল—"না, তাই বলছি। উনি এবার মরে যাবেন কিনা।"

লোকেনদা বলল—"তোর কাছে যমরাজা খবর পাঠিয়েছে?"

চিনু বলল—"না, খবর নয়। বলছিলেন নাৎবৌয়ের মুখ না দেখতে পেলে বেঁচে থেকে কি হবে।"

লোকেনদা এতক্ষণ পড়তে পড়তেই বলেছিল, এইবার বই থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে চিনুর দিকে চেয়ে বলল—"তোর কানে ধরে ঐ কথা বলেছে? পোড়ারমুখী ঘটকালিতে নেমেছে।...তা ঠাকুরমা কাকে বলছিল ও কথা?"

চিনু বলল—"কাকীমাকে।"

লোকেনদা বলল—"কাকীমাকে! ওঃ কাকীমা বললেই যেন বিয়ে হয়ে গেল! তা কি বললে কাকীমা শুনি?"

চিনু বলল—"কাকীমা বললেন—এই পাশটা দিয়ে নিক।"

লোকেনদা বলল—"ব্যস, হয়ে গেল আর কি! লোকু যেন বিয়ের জন্য মুখিয়ে বসে আছে, পাশের খবর বেরল আর টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে চলল! এদিকে বিয়ে যে আমি একেবারেই করব না সে হুঁশ নেই কারুর। আর তুই পোড়ারমুখী খবরদার এসব কথার মধ্যে থাকবি নি, পুঁতে ফেলব।"

চিনু বলল—"থাকি না তো, পাকা-চুল তুলি যে, ওঁরা বলেন।"

লোকেনদা বলল—"তোকে বলেন?"

চিনু বলল—"আমি বসে থাকি, শুনতে পাই। কি করব?"

লোকেনদা বলল—"কিছু করবিনি। যা শুনিস এসে বলবি, আমি শুনে তার বিহিত করব। তুই কিছু করবিনি। খবরদার! তোর কথামালা কোথায়? নিয়ে আয়।"

তারপর থেকে চিনু আর কিছু বলেনা, নিজের দিক থেকেও না, ওঁদের মুখে যা শোনে তাও না। বড় বড় চোখদুটো পাকিয়ে যখন চায় লোকেনদা, এত ভয় করে! দরকার কি?

কিন্তু ঠাকুরমার জন্তে বড় কষ্ট হয়। মিত্তিরবাড়ির গিন্নিকে রোজই দেখতে যান তারপর রোজই ফিরে এসে খালি ঐ কথা। অখিলকাকা রইলেন তো তাঁকেই, নয়তো কাকীমাকেই। এঁদের মুখেও সেই একই কথা। ঠাকুরমা এক একদিন রাগে গরগর করতে থাকেন, এক একদিন গিয়ে শুয়ে পড়েন বিছানায়। তারপর একদিন একটু যেন অন্যরকম ভাবে মিত্তিরদের বাড়ি থেকে এলেন। মুখটা একটু হাসিহাসি, একটা ভালো কথা বলবার থাকলে যেমন হয়। বললেন—"বৌমা শোনো।"

সন্ধ্যাবেলা লোকেনদা সিনেমা দেখতে যাবে। চিনুকে ঘরের হুড়কোটা দিয়ে দিতে বলে রক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, "কি যে একটা ভুলে গেলুম" বলে—ফিরে এল।

কাকীমা আলো নিয়ে বড ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, এসে জিজ্ঞেস করলেন—"কি মা? ভালো কথা যেন মনে হচ্ছে। মিত্তির গিন্নী আছেন কি রকম?"

"তা, বলতে নেই, আজ একটু যেন ভালো। তবে তার কি বিশ্বাস মা?—পিদ্দিমটা নিবছে—এক একবার ঐ রকম দপ্ দপ্ করে উঠবে জ্বলে, তারপর দপ্ করে যাবেই নিবে। আমি বলছিলুম অন্য কথা বৌমা; একটি চমৎকার মেয়ে দেখলুম।"

লোকেনদা কি ভুলে গেছে ঠিক করতে না পেরে আস্তে আস্তে একবার বালিসের তলা, একবার বইয়ের গাদা, একবার আলনাতে জামার পকেট ওটকাতে লাগল।

কাকীমা বললেন—"সত্যি নাকি মা? কার মেয়ে?

ঠাকুরমা বললেন—"মেয়েটি হচ্ছে যোগেনের বড শালীর দেওর-ঝি। ওরা আজ গিন্নীকে দেখতে এসেছে কি না। কিন্তু কী চমৎকার মেয়ে বৌমা, আমি তো বাছা, মনে মনে লোকুর জন্তে ঠিক করে ফেলেছি। না, এবার আর তোমাদের কোন কথাই শুনছিনে। কেন, তোমাদের একটা ছুতো হয়েছে, আজ কাল সব মেয়েই বড়, তা ঐ তো রয়েছে ছোট মেয়ে, দাও না বিয়ে। দাও না কি, দিতেই হবে আমি কিছুতেই শুনছিনি। অবশ্য, রুগীর বাড়ি, কথা তেমন তোলা গেল না ভালো করে, তবে পাকে-প্রকারে যেমন বুঝলুম—ওদের সাবেক চালের বাড়ি, ছোট থাকতে থাকতেই বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। আমিও অবিশ্যি বলব অখিলকে, তবে তুমি ধরে পড়ো বৌমা—এ-মেয়ে আমি কোন মতেই হাতছাড়া হতে দোব না; আর পাশ করার ভরসায় থাকলে হাতছাড়া হয়েই যাবে।"

কাকীমা বললেন—"যেমন বলছ, লোভ তো হচ্ছে মা। কিন্তু জানই তো ওঁকে। তা, এক কাজ করো না, দেখাবার ব্যবস্থা করো না। নিজের চোখে যদি দেখেন, তুমি যেমন বলছ, মত ফিরেও যেতে পারে।"

ঠাকুরমা বললেন—"অখিলকে দেখানো তো মুস্কিল এখন। বিপদের বাড়ি; ঠিক ও ভাবে তো তোলা যায় না কথা। তবে তুমি দেখতে পার। যোগেনের শালীর সঙ্গে আলাপ হোল তো, আমাদেরই বয়সী, কালকে একবার আসতে বলেছি। বলেছে, গিন্নী যদি একটু ভালো থাকেন ওরই মধ্যে, তো কাল দুপুরে আসবে'খন একবার। বেশ মিশুকে মানুষটি। আসতে পারুক, না পারুক তুমি বলো বাছা অখিলকে। নাও, আমার আহ্নিকের জায়গাটুকু করে দাও।"

—"কি বড়্-বড়্ করে বুড়ি? কি ভুলে গেছলুম, কোন মতেই মনে করতে দিলো না—"বলে লোকেনদা বেরিয়ে গেল।

তারপর দিন লোকেনদা খেয়েদেয়ে ভয়ানক মাথা ধরল ব'লে আর কলেজ গেল না। চিনুও বসে বসে মাথায় হাত বুলুল। চিনুর খুব কিন্তু ইচ্ছে করছিল লোকেনদার জন্যে আনা মেয়েটিকে দেখতে। এই আসে—এই আসে, কিন্তু এল না তারপর লোকেনদার মাথা ছেড়ে অনেকখানি বিকেল হয়ে যেতে যখন খেলতে চলে গেল, সেই সময় যোগেন মিত্তিরের শালী এলেন। বললেন—দুপুরে গিন্নীর শরীরটা নাকি আবার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটা টাল খাওয়ার মতন, তাই আসতে পারেন নি।

মেয়েটিকে দেখলে চিনু। সত্যি কী চমৎকার যে! চিনুর সঙ্গে তো ভাবই হয়ে গেল। অখিল কাকাও দেখলেন। সন্ধ্যের সময় যখন অফিস থেকে ফিরলেন তখন ওরাও বসে তো। অবিশ্যি মেয়ে দেখার মতন ভালো করে দেখলেন না। তবু ওরা সামনের রকেই বসেছিল, ঘরে যেতে যেতে পেলেনই দেখতে।

লোকেনদাও একটু পেয়েছিল দেখতে। তবে সেকথা তারপর দিন টের পেলে।

চিনুর তো পেট ফুলছিল বলবার জন্যে। শুধু মেয়েটিকেই দেখে নি তো, তারপর যা কথা হয়েছে বাড়িতে তাও শুনেছে। বলবার জন্যে পে. ফুলছিল, অনেকবার ঘুরঘুরও করল লোকেনের কাছে, কিন্তু যা দাবড়ানি খেয়েছিল ভরসাই হোল না।

তারপর সকালে পড়তে পড়তে লোকেনদা নিজেই তুললে কথাটা—"হ্যাঁরে চিনু। কাল আমাদের বাড়ি কেউ এসেছিল নাকি? সন্ধ্যের সময় খেলে ফিরছি দেখি হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা বুড়ি আর একটা তোর মতন খুকি।"

বাঁচল চিনু; বলল—হ্যাঁ লোকুদা, সেই তারা, ঠাকু'মা কাল যাদের আসবার কথা বলেছিলেন না?—তুমি যখন সিনেমা দেখতে যাচ্ছিলে। যোগেন মিত্তিরের বড় শালী আর দেওর-ঝি। আমার মতন্ কো'থায়? ঢের বড় আমার চেয়ে।"

লোকুদা বলল—"অত দেখতে যাইনি খুঁটিয়ে। কাল ঠাকুরমা কি বলছিল তাও শুনিনি অত। কি ভুলে যাচ্ছিলুম। সেই কথা ভাবছিলুম, তা হঠাৎ তারা যে?"

চিনুর সাহস হচ্ছিল না। তবুও বলল—"ঠাকুমার ইচ্ছে লোকুদা…"

লোকেনদা একটা চোখ পাকিয়ে বলল—"আবার তুই ঠাকুরমার ইচ্ছের কথায় আছিস চিনু? তোর লজ্জা নেই। বেশ, যখন উঠলই কথাটা—ঠাকুরমার ইচ্ছে কি তাতো জানি, বুড়ি উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগেছে। এঁদের ইচ্ছে কিছু শুনেছিস? তাহলে বুঝি, নয়তো নিজেই বিহিত করতে হয়। ভালো করে জানিয়ে দিতে হয় আমার ইচ্ছেটা কি…মা কি বলেন?"

চিনুর একবার ভয় হচ্ছে, একবার মনে হচ্ছে ভয়টা কিসের? বলল—"এ মেয়েটিকে দেখে কাকীমারও বড্ড…"

"হয়েছে; বুঝেছি।" বলে লোকেনদা চোখ পাকিয়ে থামিয়ে দিল, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল—"আর বাবা?"

চিনু বলল—"কাকা বলছিলেন—বেশ তো, আমি তো দেব না বিয়ে এমন কথা বলছি না। মেয়ে তো দেখলুম কচি, বিয়ের-যুগ্যি হতে হয়ত লোকু ততদিনে আরও দুটো পাশ দিয়ে দেবে। তারপর করুক না বিয়ে।"

লোকুদা চোখ পাকিয়ে বলল—"ব্যস, উনি বললেন আর লোকু বিয়ে ক'রে বসল! বলিস, তাদের কচি মেয়ে বুড়ি করে তুললেও লোকুদার মত বদলাবে না। তার অনেক কাজ আছে জীবনে, দুটো পাশ দিলেই শেষ হয়ে যাবে না।"

ওসব কথা তো অখিলকাকাকে বলতে পারে না চিনু; কাকীমাকেও না। ঠাকুরমাকে বললে, উনি তো জিজ্ঞেসও করেন। লোকুদা কখন কি বললে না-বললে। ঠাকুরমা যেমন মুখ-টিপে একটু হাসেন, তেমনি হাসলেন শুধু।

এরপর ও বাড়ির মিত্তির গিন্নী হঠাৎ মারা গেলেন। তারপরেই চিনু একটা বুদ্ধি খাটালে; তারপরেই বিয়ে। আজ বৌভাত আর ফুলশয্যে। চিনুর যে কী মনে হচ্ছে কাকে বলবে!

গিন্নী মারা গেলেন বিকেলবেলা। সবাই মিত্তিরদের বাড়ি গিয়েছিলেন, সন্ধ্যেবেলা কাকা আর কাকীমা ফিরে এলেন। রকে বসে দু'জনে গল্প করছিলেন—গিন্নীরই কথা। পাড়ার একটা পুরোনো মানুষ চলে গেল ছেলে নাতিরা কাজকর্ম কেমন করবে, অবস্থা তো ভালোই—এই সব গল্প করছিলেন দু'জনে, এমন সময় ঠাকুরমাও এসে উপস্থিত হলেন।

জিজ্ঞেস করতে করতেই ঢুকলেন বাড়িতে—"অখিল আছিস?" তারপর ওঁদের রকে দেখতে পেয়ে বললেন—"এই তো রয়েছিস, বৌমাও রয়েছেন—আমার কথার জবাব দে তোরা—বলি, আমারও মিত্তির গিন্নির মতন নাৎবৌ-নাৎবৌ ক'রে মরতে

হবে ?···দেখলুম তো মানুষটা যাবার সময় তারক ব্রহ্মের নাম শুনবে কি ঐ চিন্তাই নিয়ে শেষ নিঃশ্বেস ফেললে। তোরাও আমার ঐ অবস্থা করবি কি ? তা হ'লে পষ্ট করে বল্, আমিও পষ্ট করে যা বলবার বলে যাই।"

আর যে সেরকম কাতরে-কাতরে বলছেন তা নয়। বেশ রেগে গেছেন যেন, একটু একটু কাঁপছেন। কাকীমা তো কথাই ক'ন না কাকা কাছে থাকলে, কাকা একটু চুপ করেই রইলেন। তারপর বললেন—"তুমি কোন্ সময় কি কথা এনে ফেলছ মা ? গিন্নী তোমায় বড্ড ভালবাসতেন, শোকটা লেগেছে। কাপড় ছেড়ে আহ্নিক সেরে একটু স্থির হও তারপর হবে এসব কথা।"

ঠাকুরমা বললেন—"ওসব ছেলেভুলনো কথা আর আমি শুনব না অখিল। স্থির হব কি, স্থিরই আছি আমি ! তোরা কথা দে, নৈলে এবাড়িতে আমার আহ্নিক করাও হয়ে গেছে, খাওয়াও হয়ে গেছে, আমায় কাশীতে রেখে আয় বিশ্বনাথের পায়ে···"

অখিলকাকা হেসে বললেন—"বরং সে কথা মন্দ বলনি। রেখে আসা নয়, চলো বরং ঘুরে আসবে একবার, পূজোর ছুটিটা আসছে। একবার ঘুরে এলে মনটাও বরং ঠিক হয়ে যাবে, কী যে একটা কথা মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে !"

ঠাকুরমা আরও চটে উঠলেন, বললেন—"ঠাট্টা রাখ্ অখিল, ঠাট্টা শোনবার মতন মনের অবস্থা নয় আমার। ঘুরে আসছি আমি আবার এই মায়ার বাঁধনের মধ্যে। আমি মিত্তির গিন্নীর মতন ক'রে মরতে পারব না পারব না পারব না। তার চেয়ে বাবার যদি দয়া হয়, কাটিয়ে দেন মায়া, বুঝব আমার কারুর সঙ্গে আর সম্বন্ধ নেই—না ছেলের সঙ্গে, না মেয়ের সঙ্গে, না বৌয়ের সঙ্গে, না নাতির সঙ্গে—সে এক নিশ্চিন্দি হয়ে বরং মরতে পারব।"

অখিল কাকা বললেন—"এই দেখো, কোথায় তোমার ঐ এক কথা হয়েছে—মরব। তা তোমায় তো বলছি, মরবার ঢের আগেই তোমায় নিশ্চিন্দি ক'রে দেব, শুধু একটা নাতির বিয়ে নিয়ে কেন মা ? শুভেনেরও বৌ দেখবে, তারপর নাৎজামাইয়ের সাধও বাকি রেখে যাবে নাকি ! মরতে তোমায় দিচ্ছে কে এখন ?"

কাকীমা উঠে পিঠে হাত দিয়ে বললেন—"ভেতরে চলো মা।"

বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন ঠাকুরমাকে। চিনুও গিয়েছিল, বললেন—"তুই বাইরে যা চিনু, খেল্‌গে।"

এর পরেই চিনু বুদ্ধিটুকু খাটালে তার। অবিশ্যি ভাগ্যিস লোকেনদা ঠাট্টা-টুকু করেছিল অমন করে, নৈলে ও-বেচারীর মাথাতেই কি আসত ? আর

মাথায় না এলে বিয়েটাই কি হোত? বৌদিদিই কি আসত? অমন চমৎকার টুকটুকে বৌদিদি।

সকালবেলা লোকেনদা পড়ছিল। ঠাকুরমার অসুখের মতন করেছিল, কাল থেকেই। খাননি। আজও খাবেন না। ওদিকে অখিল কাকাও নাকি খাননি। কাকীমাও না। ঠাকুরমার পায়ে হাত বুলুচ্ছিলেন, চিনু বাড়িতে ঢুকতে, উঠে গিয়ে বললেন—"তুই একটু বসগে যা তো মা ওঁর কাছে। মায়ে-ছেলের মন-কষাকষি, আমি মাঝখান থেকে গেলুম।"

চিনু গিয়ে বসেছে, ওপর থেকে লোকেনদা ডেকে পাঠালে। চিনু উঠে গেলে জিজ্ঞেস করল—"কাল শুনলুম নাকি বুড়ি বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়েছে?"

চিনু বলল—"হ্যাঁ, বলছিলেন যমে ভুলে থাকলে বিষ খেয়েই মরবেন।

লোকেনদা বলল—"বলগে যা না খেতে; ঐ রয়েছে। বলবি—ও খানিকটা থাক, আমি খানিকটা খাই, আর সেই দেওরঝিকে খানিকটা পাঠিয়ে দিক। সেখানে গিয়ে দিব্যি নাৎবৌয়ের মুখ দেখবে। এখেনে তো হোল না। এমন কথায় কথায় বিষ খাবার জাত দেখিনি বাবা, আবার এ-জঞ্জাল বাড়াতে বলে!...যা, বেরো।"

ঐতেই চিনুর মাথায় তো বুদ্ধিটুকু এল। লোকুদা খেয়ে দেয়ে কলেজ চলে গেলেন। চিনু ঠাকুরমার পায়ে হাত বুলুচ্ছিল, ঠাকুরমা ঘুমুচ্ছিলেন, কি চোখ বুজে পড়েছিলেন, কাকীমা চিনুকে ডেকে বললেন—"তুইও খেয়ে আয় মা সকাল সকাল, আমি ততক্ষণ বসছি। গোপালের ভোগটা আমাকেই দিতে হবে আজ, তুই এলে তখন উঠব।"

চিনু যখন খেয়ে এল, তখন ঠাকুরমা ঘুমুচ্ছেন, ঘুমুনোর নিঃশ্বাস পড়ছে আস্তে আস্তে। চিনু প্রথমটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল। ভরসা কি হয় চট করে? ক'বার ওপরে গেল লোকুদার ঘরে, কবার নেবে এল আস্তে আস্তে, তারপর একবার ওপরে গিয়ে ভরসা ক'রে বুদ্ধিটুকু খাটিয়ে, একেবারে পূজোর ঘরে গিয়ে কাকীমাকে বলল—"কাকীমা শিগ্‌গির এসো, কি কাণ্ড দেখোগে।"

নিজে সত্যি সত্যিই কাঁপছে, বুদ্ধিটুকু খাটাতে খুবই ভয় ভয় করছিলো তো। কাকীমা এইবার পূজোয় বসবেন আর কি, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। চিনু ঠাকুরমার ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিল, চুপি চুপি বলল—"ঐ দেখো, কিসের শিশি! আমি খেয়ে এসে পায়ে হাত বুলুতে যাব—দেখি একটা শিশি, তারপর গায়ের লেখাটা পড়ে দেখি বয়ে হ্রস্বই আর মূর্দ্ধন্য স!—তক্ষুনি ছুটে গেলুম তোমায় ডাকতে।"

তারপর কাকীমাও পা টিপে টিপে ঘরে গিয়ে শিশিটা তুলে কতখানি আছে দেখলেন, একবার ঠাকুরমার মুখের কাছে নাকটা নিয়ে গেলেন, তারপর সেই রকম করে বেরিয়ে এসে বললেন—"যা, তোর কাকা মিত্তিরদের বাড়িতে গেছেন, আজ অফিস যাননি। চুপি চুপি ডেকে আন। লোকুর ফুটবলের মালিস। খান নি, তবে—কিছু বুঝতে পারছি না, তুই ডেকে আন, শুধু বলবি কাকীমা শিগ্‌গির আসতে বলেছেন, কেন আমায় তা কিছু বলেন নি।"

অখিল কাকাও এসে বাইরেই সব শুনে [illegible]রকম পা টিপে টিপে ভেতরে গিয়ে সব দেখলেন। কাকীমা তো সরান নি শিশিটা, চৌকির মাথার কাছে যেমন রেখেছিল চিনু সেইরকমই ছিল। মুখও শুঁকলেন।

তারপর শিশিটা নিয়ে একেবারে উঠোনে বেরিয়ে এসে কাকীমাকে বললেন—"অবিশ্যি খেতে হলে অমন কাছে শিশি দাঁড় করিয়ে কেউ ঘুমোয় না। তবুও যদি ঐরকমভাবে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য থাকে, তো কাজ কি? আর সত্যিই—ওঁরই তো সব, একটা সাধ বুড়ো বয়সে, নিজেদের কথা ভেবে আমরা তার বাধা হয়ে পাপের ভাগী হই কেন?"

চিনুকে সাবধান করে দিলেন—ঘুণাক্ষরেও যেন এ-কথা কারুর কানে না যায়। তারপর শিশিটা সরিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে ডাকলেন—"মা!"

ঠাকুরমা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন, পুজো করা অব্যেস তো, বললেন—"কিরে? …হ্যাঁ গা, গোপালের ভোগটা দেওয়া হয়েছে বৌমা?"

অখিল কাকা বললেন—"না, হয় নি এখনও, তুমিই তো দেবে মা। ওঠ। আমি ভাবছিলুম লোকুর বিয়ের কথা। তোমার যখন এতই ইচ্ছে আর ওরা যখন রাখবেই না মেয়ে তদ্দিন, তখন আর কাজ কি দেরি করে? পুজোটা সেরে একটু জল খেয়ে নাও, তারপর একটা পরামর্শ ঠিক করি ব'সে। এই জন্যেই আজ অফিস গেলুম না।"

আজ বৌভাত আর ফুলশয্যে। বৌদিদিকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! আর কী আহ্লাদ যে হচ্ছে চিনুর!…কিন্তু একি অন্যায় অখিল কাকা আর কাকীমাদের! চিনু কখনও কাউকে বলতে পারবে না! সবাই বলবে শুধু ঠাকুরমার জন্যেই অমন টুকটুকে বৌ হোল লোকেনদার। চিনু বুঝি কিছুই করেনি?

ইতিহাস

আমি যাদের বাড়িতে পড়াই তাদের প্রতিবেশীর সেই ছেলেটি আবার সেদিনও এসে পাশটিতে বসল।

বছর নয়েকের ফুটফুটে ছেলেটি, এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি বড় বড় এবং ভাসাভাসা, একটু যেন বিষণ্ণ, ভাসাভাসা চোখ একটু যেমন হয়েই থাকে। এর আগে প্রথম যেদিন আসে, দিন চারেক হোল, আমি আমার ছাত্রকে ইংলণ্ডের রাজা জেম্‌সের সময়ের গান্‌পাউডার প্লটটা পড়াচ্ছিলাম। রাজা জেম্‌স্‌ মায়ের অধিকারে স্কটল্যাণ্ড থেকে এসে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন, কিন্তু কাউকেই খুশি করতে পারলেন না, শেষে ক্যাথলিক ধর্মের কয়েকজন মিলে একটা ষড়যন্ত্র করলে—রাজা যেদিন পার্লামেণ্ট-সভা উদ্বোধন করতে আসবেন সেদিন বারুদে আগুন দিয়ে পার্লামেণ্ট বাড়িশুদ্ধ সভাশুদ্ধ উড়িয়ে দেবে তারা। গাই-ফক্‌স্‌ নামে একজন ক্যাথলিক বারুদ নিয়ে পার্লামেণ্টের নীচে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সামান্য একটা ভুলের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ে গেল, বারুদের পিপেসুদ্ধ গাই-ফক্‌স্‌কে টেনে বের করা হ'ল —তারপর যা হয়ে থাকে।

ছেলেটি এক হাতে ভর দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমস্তটা শুনলে, ইতিহাস শেষ করে যখন অঙ্ক ধরলাম, আস্তে আস্তে উঠে গেল।

ছাত্র পরিচয় দিলে—তিনখানা বাড়ির পর এই গলিতেই ওদের বাসা। বড ভাই একটা সওদাগরি অফিসে কাজ করে। বাপ নেই। গরীব, কিন্তু পরিবারটি বড় ভাল। দুই বাড়ির মধ্যে যাওয়া-আসা আছে।

ছেলেটি মনে বেশ একটা রেখাপাত করেছে, চেহারায় তো বটেই, তাছাড়া তার অভিনিবিষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতেও। বললাম—"বড় হয়ে উন্নতি করবে, দেখো। অনেকগুলি লক্ষণ আছে।"

তারপর দিনও এল ছেলেটি। বাংলা কবিতা পড়াচ্ছিলাম, একটু বসল, কিন্তু সেরকম একাগ্রতা নেই; একটু পরে উঠেও পড়ল। কাল যাকে অত শান্ত দেখেছিলাম আজ তাকে যেন বোধ হ'ল বরং অন্য রকমই। প্রভেদটা বেশ একটু কৌতুকজনক মনে হ'ল।

বললাম—"উঠলে কেন? বোস না খোকা, তোমার নাম কি?"

উত্তর হোল—"সন্তোষ।"

একটু হেসেই বললাম—"সে তো কাল ছিলে, আজ তো মনে হচ্ছে না, ভাল লাগছে না বুঝি? কেন, পল্পটা তো বেশ সহজ।"

একটু শুধু অপ্রতিভভাবে হাসলে। অনিচ্ছা দেখে বললাম—"তা হলে না হয় যাও, তাতে আর লজ্জা কি? আবার যখন ইচ্ছে হয় আসবে।"

ও চলে যেতে ছাত্র মুখটা গম্ভীর করে বললে—"ও মাষ্টার মশাই, সে কথাতো আপনাকে বলিই নি। ও কাল অমন করে একঠায় কেন বসে বসে শুনছিল জানেন?

প্রশ্ন করলাম—"কেন?"

"ওর বাপ ছিলেন সে যুগের একজন বিপ্লবী, মাষ্টার মশাই! তাঁদের প্ল্যান ছিল ঐ রকম কতকটা, লাটসাহেবের বাড়িটা উড়িয়ে দেবেন। বিয়াল্লিশেই বোমা, ডিনামাইট এই সবের কারখানায় ধরা পড়েন। কিন্তু কোনরকমে পালান। এর ভাইয়ের যখন চাকরি হয়েছে, দেশ থেকে সবাই চলে এসেছে, ওর বাপ এসে বাড়িতে লুকিয়ে মাস দুয়েক কাটান, তারপরই ধরা পড়ে যান।"

সেদিন পড়ানোতে আর মন বসাতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটি যেমন গুরুগম্ভীর তেমনি বেদনাময়। এর ওপর মনে হোল নাম নিয়ে রসিকতা-টুকু করতে গিয়ে সেই বেদনার ওপরই আবার আঘাত দিয়েছি। এই আঘাত তার ওপর ওদের বাড়ির এই ইতিহাস—সব মিলিয়ে ছেলেটির প্রতি যেন আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। মনে হোল এমন একটি ছেলে, এর প্রতি যেন কর্তব্য রয়েছে আমার। বাংলার অগ্নিযুগে যাঁরা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা, অনুভব করলাম যে সেই শ্রদ্ধার এক কণা এই অগ্নিকণার ওপরেই এসে পড়েছে। কিন্তু যুগ বদলেছে, তার, সঙ্গে পটভূমি বদলেছে, তার সঙ্গে প্রয়োজন বদলেছে, আদর্শ বদলেছে, এখনকার যিনি যুগমানব তিনি বলেছেন—পুরোনো অস্ত্র ওসব ছাড়ো, অহিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করো।... স্বাধীনতা এল, এখন এই মন্ত্রকেই তো আরও সফল করে তুলতে হবে।

ছাত্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গলির খানিকটা এসেই দেখলাম, ছেলেটা এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য বললে না কথাটা, তবে বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

প্রশ্ন করলাম—"সন্তোষবাবু না? তা এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে উত্তর করলে—"না, এমনি।...আপনি বাড়ি যাচ্ছেন?

বিমলদা বলেছিলেন আপনাদের বাড়ি নাকি কাছেই।"

বললাম—"হ্যাঁ, এই গলি থেকে বেরিয়েই একটু গিয়ে। তুমি যাবে? কিন্তু রাত হয়ে আসছে যে?"

"তাতে কি? আমি তো অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমলদা'দের বাড়িতে থাকি।"

"বেশ, তা হ'লে এসো।"

তারপর হেসে বললাম—"বাড়িতে সবাই মনে করবেন'খন—বিমলদের বাড়িতেই তো ছিলে, নয় কি?...সে বেশ হবে।"

সন্তোষ পা বাড়িয়েছিল, লজ্জিত ভাবে হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে—"যাঃ।"

তার হাতটা ধরে বললাম—"না, এসো। আমি তোমায় সঙ্গে করে দিয়ে আসব।"

তারপরে, যেমন হাতে হাতে পেয়ে গেলাম ছেলেটিকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভও করে দিলাম। বললাম—"না, ওটা ঠিক নয়, কি বলো? যেটা হচ্ছে, যেটা করছি, সেইটে সত্য; ইচ্ছে করেই হোক্, অনিচ্ছাতেই হোক্, সেটা চাপা দেওয়া চলবে না। নয় কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তারপরে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলে—"আচ্ছা, সেই যে লুকিয়ে বারুদ দিয়ে রাজাকে উড়িয়ে দিতে গেছল—সে রকম গল্প আর জানেন আপনি?"

প্রশ্নটা যেন কাতুকুতু দিয়ে উঠল, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তার উল্টো ফল তো? বেশ একটু জোরেই হেসে উঠলাম।

কিন্তু নিরাশ হ'লে কখনও চলে, আর একজনের কথা যে মনে পড়ে গ্যাছে। এই রকমের বড় বড় টানাটানা চোখে স্বপ্ন-দৃষ্টি। এদের চোখে কি স্বপ্ন থাকে তা কি সব সময় বোঝা যায়? মনে হয় বিদ্রোহ, তারপর সেই বিদ্রোহ একটা বিশালতর স্বপ্নে সার্থক হয়ে ওঠে।

এই রকমই একটি শিশু, নরেন্দ্রনাথ—যৌবনের পূর্ণতায় একদিন দক্ষিণেশ্বরের যুগমানবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর তার নবমন্ত্রে দীক্ষা; কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল!

এ যুগের মন্ত্রমানব, তিনি নেই; কিন্তু মন্ত্র রেখে গেছেন। সেই মন্ত্রে আবার এক বিবেকানন্দকে যদি এনে ফেলতে পারি! বড় দরকার যে!

আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। মনে হ'ল যেন চিনতে আরম্ভ করেছে পথ। তারপর শিক্ষার মধ্যেই হঠাৎ একটা বিরক্তি এসে গেল—

সন্তোষের কয়েকদিনই দেখা নেই। রোজই যে আসত এমন নয়, সুতরাং ততটা খেয়াল করলাম না। নিজের কাজও আছে তো। অথচ দিন কয়েক যখন হয়ে গেল, ছাত্র বিমলকে কারণটা জিগ্যেস করলাম।

বিমল ভেবে একটু বেশি করেই বললে—"ও, সে কথা তো আপনাকে বলাই হয় নি। ওর বোন অরুণাদির বিয়ে যে!"

একে একে সব কথা বললে—"অত সুন্দর তো, সবই পছন্দ, অথচ দেনা পাওনার কথা উঠতেই ভেঙে যায়। এদিকে বয়েস তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না—সতেরো পেরিয়ে প্রায় আঠারোয় পড়তে চলল। অরুণাদি—আহা, অমন মেয়ে, আর ঐ একটিই, কাকীমার ইচ্ছে সুপাত্রে পড়ে; আর একটু মানানসই হয় সেটুকুও তো দেখতে হবে—বর একটু যদি মনের মত হোলো তো বাপ-মা কুমীরের মতন হাঁ করে আছে। এদিকে মেয়েও তো আর রাখা যায় না—কাকীমারা আবার একটু পুরোন ধরনের তো—শেষকালে এইখানে ঠিক হয়েছে। ছেলে এম. এ. পড়ছে, অবস্থা বেশ ভাল। বাপ কোন্ মফঃস্বল কলেজের অঙ্কের প্রফেসর। ভাইবোন আত্মীয়স্বজনে বেশ বড় সংসার..."

বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "দিতে হচ্ছে কতো?"

বিমল বললে—"তা বেশ মাষ্টার মশাই, প্রায় হাজার তিনেক ওদিকে...তোমার ঘরের খরচ না কুলোয়, তো আমরা কি করবো? এও অবস্থা খারাপ বলে দয়া করে। আমি দেখেছি বরের বাপকে, ইয়া লাস্—সেই রকম খাঁই হবে তো? সঙ্গে আবার বরের মামা—তিনি নাকি আরও এক কাঠি ওপরে যান; শোনা যাচ্ছে, তিনিই নাকি সব ঠিকঠাক করেছেন। এও একটা বরের বাপদের trick, না মাষ্টারমশাই? 'আমি কি জানি? বরের মামাকে গিয়ে বলোগে।'...অথচ একজন প্রফেসর।...অঙ্কেরই প্রফেসর তো, না মাষ্টারমশাই?

বেশি মুখ খুলে গেছে দেখে একটু বাধা দিতে হ'ল—"আচ্ছা থাক, তুমি এখন পড়তো।"

বিমল বইয়ের দিকে চেয়ে একটু গুন্‌গুন্ করলে, তারপর মাথা তুলে বললে—"যাঃ, আসল কথাটাই যে বলা হয়নি। পাবেন কোথায় অত টাকা কাকীমারা! কাকা কিছু করতেই পারেন নি দেশ-দেশ করে, সন্তোষের দাদা একশ'-দশটি টাকা মোটে মাইনে পান, তাইতেই বাড়ি ভাড়া, তাইতেই সব। ফল হোল—কাকীমার এক আধখানা গয়নাগাঁটি যা ছিল, আর দেশের ধানজমিটুকু—যার উপর নির্ভর..."

"যাক, তুমি পড়ো। পেলে একদিন তুমিও ছাড়বে না।···আমিই কি ছাড়ি?" হেসেই বললাম, তবে তারই মধ্যে মুখটা যে একটু কঠিন করে নিলাম, তাতে বিমল আর তুললো না ও প্রসঙ্গ।

পরদিন সন্তোষ এল। ঢলঢলে বিষন্ন চোখ দু'টি আরও বিষন্ন; বেশ বোঝা যায়, বাড়ির দুশ্চিন্তা শিশুর মনকেও ভারাক্রান্ত করেছে। আমি ওকে একটু প্রফুল্ল করবার জন্যেই বললাম—"সন্তোষবাবুর দিদির তো বিয়ে হ'তে চলল, নেমন্তন্ন যেন বাদ না যাই।

সন্তোষের মুখে যে সামান্য দীপ্তিটুকু ছিল, যেন এক মুহূর্তে নিভে গেল। কে যেন একটা কষাঘাত হানলে আমার পিঠে—এই দুঃস্থ, নিপীড়িত পরিবারের পক্ষে উৎসবে একটি বেশি লোককেও বলা যে কত কঠিন, কত হিসাব খতিয়ে দেখতে হয় তা কেন বুঝলাম না?

তারপর দিন যখন এলো সে-ভাবটা একেবারে কেটে গেছে। মুখে চোখে একটা হাসি লেগে রয়েছে, একটু চঞ্চল। হাতে ভর দিয়ে যেমন বসে সেই ভাবেই চুপকরে বসল, তবে মনের চঞ্চলতায় কয়েকবারই হাত বদলাল; বিমলকে একটা ট্রিগনোমেট্রির অঙ্ক বোঝাচ্ছিলাম, তারই মধ্যে একটু দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"সন্তোষের আজ যে বড় হাসি-হাসি ভাব, কিছু নতুন খবর আছে?" সেইরকম লজ্জিতভাবে হেসে বললে—"না···আপনি পড়ান না, অঙ্কটা শুনতে বেশ ভালো লাগছে, তাই···"

দু'জনেই হেসে উঠলাম আমরা, বললাম—"আমার বোঝাতে মাথা ধরে যাচ্ছে, আর তোমার শুনেই হাসি ধরে না!"

বিমল বললে, "নগদ টাকাটা নিয়ে নাকি তোর দাদা ধরাধরি করতে গিয়েছিলেন আবার? কিছু শুনলে নাকি রে বুড়ো?"

আবার সন্তোষের মুখটা দীপ্তিহীন হয়ে গেল, বললে—"না, উনি তো ছিলেন না; মামা একটু রেগেই দাদাকে···"

কথাটা শেষ না ক'রে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল।

পড়ানো শেষ হ'লে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল সন্তোষ, তারপর একটুখানি পাশে-পাশে গিয়েই দু'হাতে আমার ডান হাতটা ধরে ঝুলে পড়ল। লজ্জিতভাবে মুখটা তুলে বললে—"আপনারও নেমন্তন্ন মাষ্টারমশাই, যাবেন তো?"

কালকের কথাটা মনে করে একটু অপ্রস্তুতই হয়ে গেছি, তার ওপর ছেলে-মানুষের করা নিমন্ত্রণ, একটু সমস্যায় পড়েই হঠাৎ কি উত্তর দেব ঠিক করে

উঠতে পারছিলাম না, সন্তোষ দু'টো হাত বাড়িয়ে ধরে একেবারে জিদ ধরে বসল—"না, আপনাকে যেতেই হবে মাষ্টারমশাই, কখনও ছাড়ব না, আমি ধরে নিয়ে যাব…কোন কথা শুনব না…"

এক রকম এভাবেই গলিটা অতিক্রম করলাম, বাসায় এসে দেখি একটি ভদ্রলোক বাইরের রকে অপেক্ষা করছেন, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স, নমস্কার করে বললেন—"এই যে, এসে গেছেন। পরিচয় নেই আমার সঙ্গে, তবে আপনার ভক্তটির বড় ইচ্ছা।…দয়া করে যাবেন, কালই বিয়ে; ভাবলুম ফরম্যালি একবার বলে আসি।"

প্রতিনমস্কার করে হেসে বললাম—"না এলেও কি রেহাই ছিল? দেখছেন তো?"

পরের দিন সন্ধ্যা হতেই সন্তোষ এসে টেনে নিয়ে গেল। খুব উৎসাহ। দিদির বিয়ের উৎসবের আনন্দটা ওর দেহ-মন থেকে উপচে-উপচে পড়ছে, তবে লক্ষ্য করলাম তারই মধ্যে এর পেছনে যে বিষাদময় কাহিনী, সেটা যেন একটু লেগেই রয়েছে কোথায়। বাসাটি ছোট, পাশেই একটা প্রাইমারী স্কুল, তিনটি ঘর, তারই একখানি বড় ঘর নিয়ে আসর হয়েছে, সন্তোষ অল্প আয়োজনের মধ্যে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে তার পুরুষত্বটা যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলছে। পায়ে চঞ্চলতা, মুখে হাসি, চোখে দীপ্তি; তারই মধ্যে কিন্তু এক একবার যেন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে; গতি হয়ে পড়ছে মন্থর, চোখের দীপ্তি যাচ্ছে নিভে।

একবার উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে একটু সরে, একটু পাতলা অন্ধকার দেখেই এক জায়গায় দাঁড়াল একলা গিয়ে। একটু চোখে চোখেই রাখছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে পেছনে গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলাম—"অত কি ভাবছ?"

ঘুরে দেখেই একটু থতমত খেয়ে গেল বটে, কিন্তু তখনই সামলে নিলে, এমন কি একটু হেসেও উঠল, বললে—"কৈ, কিছু ভাবছি না তো মাষ্টারমশাই!"

একটু হেসেই বললাম—"ভাবছিলে বৈকি।" এবার একটু মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম—"না, অত ভাববার কি আছে? কেউ যদি দেখে ফেলে—ধরো তোমার দিদিই যদি দেখে ফেলে—কত কষ্ট হবে তার? একটা আনন্দেরই দিন তো। তা ছাড়া এক্ষুণি বরযাত্রীরা আসবেন—মনে একটা খুঁৎখুঁতুনি থেকে গেলে তাঁদের আদর-যত্নে দোষ হয়ে যেতে পারে।… এই ধরো না, তোমাকেই তোমার দাদা বোধ হয় মালাগুলো পরিয়ে দিতে বলবেন—বরের বাপকে ভালো মালা পরিয়ে বিশেষ করে খাতির করতে হবে—মামাকেও; সে সময় তোমার যদি কত নিয়েছেন,

কি করছেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়…নয় কি? ভেবে দেখো না।…তাঁরা তো আবার গুরুজন হচ্ছেন, তোমার দিদির—তোমারও।"

একটু বেশি করেই ভেবে দেখলে সন্তোষ মাথাটা হেঁট করে। পরে, একটা যেন বেশ ভালো কথা মনে পড়ে গেছে এইভাবে হঠাৎ মুখটা তুলে বললে—"সে মাষ্টারমশাই—আমি…এই আসুন না, দেখাচ্ছি…"

যে ঘরটায় আসর করা হয়েছে, পাছে ছেলেপুলেরা ধামসায় তাই তার কপাটে শেকল চড়ানো; বরযাত্রীরা এলে খুলে দেওয়া হবে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বললে—"খুলুন না শেকলটা।"

বেশ ভালো করে সাজানো ঘরটি। সামনে দেয়াল ঘেঁসে বরাসন, যেমন হয়ে থাকে, একটু উঁচু। তার ডান দিকটা বেশ খানিকটা বাদ দিয়ে আর একটি আসন; একটু হয় তো বা বেশিই উঁচু—ওপরে একটি রঙান টেবিল-ক্লথ দিয়ে আলাদা করা।

বেশ উৎসাহের সঙ্গে মুখের দিকে চেয়ে বললে—"দেখুন মাষ্টার মশাই, বরের বাবা আর মামার জন্যে আলাদা করে দিয়েছি—আমিই বুদ্ধি করে করেছি—গুরুজনই তো মাষ্টারমশাই বলুন? আর বর হল ছেলে তো, তিনি নিচুতে বরের সামনে কি করে বসবেন বলুন?"

মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম—"চমৎকার! সত্যিই খুব ভালো হয়েছে সন্তোষ। মনে কিছু পুষে রাখতে নেই। বাঃ বেশ!"

সন্তোষ প্রশ্ন করলে—"কিন্তু ওঁদের জায়গায়, যদি অন্য কেউ বসে পড়ে?"

ছেলেমানুষ বুদ্ধি করে একটা করেছে, যদি বিফল হয় তাই একটু চিন্তিতই।

আবার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম—"তা নিশ্চয় কেউ বসবে না। তবুও ওঁরা ঢোকবার সময় বলে দেবো'খন এসো।'

কিন্তু অত সহজে কি যায় মনের দুঃখ? সন্ধ্যার পর, বরযাত্রীদের আসবার সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল, বিষণ্ণতাটুকু যেন আরও চেপে বসতে লাগল সন্তোষের ওপর। শুধু বিষণ্ণতা নয়, একটা দুশ্চিন্তাও, একটা যেন ভয়ও মাঝে মাঝে। বড় ব্যথিত হয়ে পড়েছি; এইটুকু শিশু, তাকেও সংসারের ভবিষ্যৎ ভেবে এত মুশড়ে পড়তে হোল উৎসবের দিন! হায়রে সমাজ!

হঠাৎ একসময় কলরব উঠল—বরযাত্রীরা এসে গেছে। বড় রাস্তায় গোটা দুই তিন মোটরের হর্ন বেজে উঠল এবং ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের দল শাঁখ বাজাতে বাজাতে ছুটল সেইদিকে। আমিও আর কয়েকজনের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলাম

অভ্যর্থনার জন্তে—হঠাৎ থেমে যেতে হোল, দেখি সন্তোষ আবার চুপটি করে সেই-খানটিতে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ছেড়ে ওর কাছেই এগিয়ে গেলাম। আমার পায়ের শব্দে ঘুরেই তাড়াতাড়ি কি যেন একটা লুকোবার চেষ্টা করলে, কাছে গিয়ে দেখি একটা লাল মলাটে বাঁধানো ছোট বই, নামটার ওপরও নজর পড়ল—গীতা।

ওদিকে আমার চিন্তাটা মাত্র একটুখানি অগ্রসর হবার অবসর পেয়েছিল—একটা উল্লাস! আমার শিষ্য পরম দুঃখে গীতার আশ্রয় নিয়েছে। বুঝতে পারুক আর নাই পারুক—সে তো আলাদা কথা।

পরমুহূর্তেই কিন্তু—কি করে, তা গীতার ভগবানই জানেন, আমার চিন্তায় গান পাউডারের প্লট আর বাংলার বিপ্লবীদের 'গীতা' কি করে এক হয়ে মিশে গেল, আমি দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে আসরের দিকে ছুটলাম।

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। যতক্ষণে বরের বাপের উঁচু আসনের ওপর থেকে জাজিমটা টেনে তুলেছি ততক্ষণে বরযাত্রীদের নিয়ে সবাই পৌঁছে গেছে। দেখেই কাছেই বরের বাপকে চিনতে বিলম্ব হোল না। বিপুল-দেহ গৌরবর্ণ ভদ্রলোক, মুখে বরের বাপের হাসি লেগে রয়েছে।

অবশ্য লেগে আর থাকতে পেলে না হাসিটুকু।

জাজিমের নীচে দোহারা করে পাটকরা একটা সুজনী তার নীচে আলপনা দেওয়া দুটি বড বড পিঁড়ি একসঙ্গে জোড়া—বর আর কনের পিঁড়ে দুটি কি করে জোগাড় করেছে, কখন এনেছে, আর কে কে আছে এর মধ্যে তা সন্তোষই জানে। পিঁড়ির নীচে সারবন্দি গুটি দশ-বারো বেশ বড় বড বোম পটকা। আজকের রাত্রের রাজা জেম্‌স্‌সুদ্ধ সমস্ত পার্লামেণ্টকে শেষ উড়িয়ে দিতে পারত—যেমন বিপুলায়তন রাজা, মুহূর্তমাত্র দেরি হোত না।

তুমুল একটা কোলাহল উঠল উৎসব বাড়িতে, চারিদিক থেকে লোক ছুটে গেল। অগ্নিকাণ্ড না হলেও বরযাত্রীরা সব জ্বলে উঠেছে, "বিয়ের তো কথাই নেই—থানা, পুলিশ, হাত-কড়ি, জেল।" গলাবাজিতে মামাকে আলাদা করে বেশ চেনা যায়।

অমি তার মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে গভীর মিনতির সঙ্গে বরের বাপের হাত দুটি ধরে বললাম—"আপনাকে একটু ওদিকে গিয়ে সব কথা শুনতেই হবে দয়া করে।"

বেশ খানিকটা দূরে একটু অন্ধকার আর নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গেলাম।

এত বড় বিভীষিকার মধ্যেও হাসবার ক্ষমতা আছে, বিষাদটা কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে, শুধু তাই নয়, তাঁর চরিত্রের আভাস পাওয়া গেল খানিকটা। দেখলাম বাইরেটার মত ভদ্রলোকের ভেতরটাও খুব ঢিলে ঢালা—ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন,

মেয়ের সঙ্গে রেওয়াজমত আরও কিছু ঘরে আসছে এই পর্যন্তই জানেন। কোথা থেকে আসছে, কি ক'রে আসছে, সে বৃত্তান্তটা ওঁর সম্বন্ধী পর্যন্ত গিয়েই আটকে গেছে। এখন যখন জানতে পেরেছেন, তখন এই আসার ব্যাপারটা বন্ধ করবেন।

বেরিয়ে যখন এলাম, হাসিতে থলথলে দেহের খাঁজে খাঁজে লহর উঠছে। সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে, তারই মধ্যে থেকে সন্তোষের দাদা বেরিয়ে এসে পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বললে—"আমায় মাফ করুন, রক্ষা করুন আমায়, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না।"

হাসিটা আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে ওকে টেনে পাশে তুলে নিলেন, বললেন—"ও কথাগুলো যে আমিই বলবো গো; কিন্তু তোমায় বলে তো কোন ফল নেই—সেই 'গাই-ফক্‌স্‌টি' কোথায়, খুঁজে বের করতে হবে যে!···

ফিরে যাও ভালেস

কদিন বেশ চমৎকার কাটছে বিশুর। দিদির বিয়ের কদিন থেকেই কেউ না কেউ আসছেই বাইরে থেকে, দাদারা, পিসিমারা, কাকিমা, মাসিমা, আরও কারা সব, দেখে নি এর আগে। খেলার সাথী রোজ যাচ্ছে বেড়ে, কাউকে কাউকে চেনে, আবার অনেককে চেনেও না; মেয়ে, ছেলে। ভাব হয়ে যাচ্ছে, নূতন নূতন খেলার আমদানি করছে তারা। নূতন নূতন খাবার আসছে সবার সঙ্গে, মুখ চলছে অষ্টপ্রহর। পড়ার হাঙ্গামা যথেষ্ট কমেছে। যারা পড়তে বলবে তারা শুধুই ছটফট করে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক; সবাই বলছে, কারুরই মরবার ফুরসৎ নেই। কেউ হয়তো বলবে একবার—"বিশু, বইয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক তুলে দিয়েছ।" ব্যাস ঐ পর্যন্ত, আবার হনহন করে কোনও কাজে চলে গেছে।

পরশু বিকেলে বাইরের উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো হল, দুর্গাতলায় পুজোর সময় যেমন টাঙানো হয়। তার টেনে টেনে চারিদিকে আলো ঝোলানো হল। রাত্রে যখন জ্বলল সবগুলো কি যে চমৎকার! বাড়িতে আরও যদি দিদি থাকত! ···খুকুর বিয়ে; সে তো কতদিন—কতদিন পরে!

চমৎকার কাটছিল, শুধু কালকের সকালটা একটু যেন কিরকম হয়ে গেল, ভালো লাগছিল না বিশুর। কাকা আর ছোটদা কেন ওরকম করতে গেল!

কাজকর্মের বাড়ি হৈ-হৈ হচ্ছে, কারুর মরবার ফুরসৎ নেই, এমন সময় কাছারীর দিক থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে একদল লোক তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। এরকম দেখেছে বিশু এর আগে, অনেকবার। এখান থেকে ওখান পর্যন্ত লোকের দল চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তা দিয়ে যেতে থাকে, কারুর কারুর হাতে পতাকা—কখনও লাল, তাতে সাদা কি সব আঁকা; কখনও তিনটে রংয়ের, ওদের বাড়িতে যেমন একবার টাঙানো হয়েছিল। গলা ফাটিয়ে চেঁচায়,—বিশুও শিখেছে—ইনকিলাব জিন্দাবাদ!—মহাত্মাজী কি জয়! জয় হিন্দ! —সুভাষবাবু কি জয়!...

গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াল ওরা খেলা থেকে ছুটে গিয়ে। এগিয়ে আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে। এবার কিন্তু ওসব বলছে না তো। চেঁচামেচিতে সবটা শুনতে পাচ্ছে না ভালোরকম, 'তবে, ফিরে যাও। চাই না!'—এটা যেন বারবারই যাচ্ছে শোনা। তারপর এগিয়ে আসতে আরও দেখা গেল এবার পতাকাগুলোও নূতন রকমের সব। কালো কালো, আর অন্যবারের চেয়ে আরও অনেক বেশি, আর চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে খুব তুলে তুলে সেগুলো নাড়ছে সবাই। শুধু তাই নয়; একেবারে সামনে বড় বড় দুটো লাঠির ওপর লম্বা একটা কালো কাপড় টাঙানো, তার মাঝখানে বড় বড় সাদা সাদা অক্ষরে কি সব লেখা রয়েছে, রাস্তার একধারে একটা লাঠি তুলে ধরেছে একজন। অন্যধারে অন্য লাঠিটা তুলে ধরেছে আর একজন। পড়তে একটু একটু শিখেছে বিশু, দলটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গলা বাড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, মোটা মোটা অক্ষর, পারছেও বেশ পড়তে—"ফিরে যাও ডালেস," তার নীচে "চাই না তোমায়"। এমন সময় পাশে নন্তু, পুঁটে, ভোম্বল, বাবু—সবাই বলে উঠল, "ওরে, ঐ ' কাকা, বিশু...কাকা কে তোর?...তোর ছোটদা রে!"

সত্যিই, ওদিককার লাঠিটা ধরে রয়েছে বিশুর কাকাই, বাড়ির গলির সামনে এসে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু ওর কাকাই তো! ছোটদাকেও দেখতে পেলে। সে ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায় একটা পতাকা তুলে ধরে বুক ফুলিয়ে এদিকেই চাইতে চাইতে যাচ্ছে।

বিশু যে ছুটে গিয়ে সবার আগে বাড়িতে খবরটা দিলে, সে ওর খুব আনন্দ হয়েছিল ব'লেই। লোকের ওপর লোক, লোকের ওপর লোক, ঐ রকম পতাকা হাতে ক'রে বুক ফুলিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলেছে সবাই, বড় চমৎকার লাগে ওর, ইচ্ছে করে যাই ঐ রকম ক'রে। বড় হ'লে যাবেই, এখন নিজেদের মধ্যে

খেলা করে কখন কখন, দল একটু পুরু হ'লে। এমনি যে-কেউ এই রকম ক'রে দিয়ে গেলেই লাগে চমৎকার, আজ আবার নিজের কাকা নিজের দাদাকে দেখে ওর মনটা যেন নেচে উঠল একেবারে। সবাই ছুটল খবরটা পৌছে দিতে বাড়িতে, কিন্তু বিশু সবাইকে পেছনে ফেলে গেল এগিয়ে। আর সামনেই পেয়ে গেল একেবারে বাবাকেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—"ছোট কাকা আর ছোটদাও আছে বাবা!"

আগে ভাগে ওদের নামটাই করে দিলে, পাছে অন্য কেউ ব'লে দেয়, তারপব বাকিটা বললে, "ওই যে—ওরা সবাই চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে, কাকে 'ফিরে যাও, চাই না" বলতে বলতে।'

ততক্ষণে নন্তু, ভোম্বল, পুঁটে, বাবুরাও আরম্ভ করে দিয়েছে বলতে—কি রকম পতাকা নিয়ে যাচ্ছে, সামনে কালো কাপড়ের উপর সেই লেখা, আর কারা আছে…

ফল কিন্তু একেবারে উল্টো। বাবারও মরবার ফুরসৎ নেই, হনহন করে কী একটা কাজে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে সেজকাকার নাম ধরে চিৎকার করে উঠলেন। হঠাৎ বাড়ির ওরকম গোলমালটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সবাই এল ছুটে। বাবা ভয়ানক রাগলে যেমন হয়—মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, সেজকাকা এলে বললেন, "শচীন যাও তো। যেমন আছ তেমনি দুটোকে ডেকে নিয়ে এসো, 'না' বললে বলবে—এ-বাড়িতে যেন আর না ঢোকে ⋯⋯ বলে দেবে,—দুঃখু নেই আমার যদি না আসে ওরা, তবে এ-বাড়িতে আর জায়গা নেই। যাও!"

তারপর থেকেই সব যেন কিরকম হয়ে গেল। এত আহ্লাদ করে এসেছিল বলতে, এরপর থেকে যার কাছেই যায়—বকুনি, খিচুঁনি—"কি দরকার ছিল ওঁকে গিয়ে খবরটা দিতে সাত তাড়াতাড়ি! মস্ত বড় সুখবর দিলেন⋯কে খোঁজ রাখে কাজের বাড়িতে? যখন নিজে হতে আসত, তখন আসত। ওঁর বাহাদুরিটা না নিলে আর চলত না।"

"ইস্টুপিড! গর্দভ!"

লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছে সারাক্ষণ।

যখন এল দুজনে সে যা একচোট বকুনি। কাকার শুধু বকুনির ওপর দিয়েই গেল, বাবা বললেন—"বুড়ো পাঁড়, তোমায় আর সাজা কি দোব এ বয়সে, এমনি লজ্জা যদি না হয়। এলে কেন? তোমার নিজের বাড়ির কাজ কে সামলে দেয় আর তুমি কিনা—ছি-ছি-ছি। যাও ঘুরে বেড়াওগে পতাকা ঘাড়ে করে।"

ছোটদার ব্যবস্থা হল, সমস্ত দিন বেলতলার ছোট ঘরটার বন্ধ থাকতে।

ছোটদার জন্যেই কষ্ট বিশুর। কাকা তো যখনই পেয়েছে দেখতে, দূর থেকেই চোখ পাকিয়ে আঙুল তুলে শাসিয়েছে—"তোমায় দেখে নোব রাসকেল, চুকলির অব্যেস ছাড়িয়ে দোব…এগারোর কোঠা থেকে নামতা, আর দ্বিতীয় ভাগে যত যুক্তাক্ষর আছে।…"

—ওকে এড়িয়েই লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছে।

ছোটদার জন্যে বড় কষ্ট হয়। বাড়িতে এত হাসি-খুশি, হৈ-চৈ, এত কাণ্ড, আর সে বেচারি একলা ঘরে বন্ধ। ইচ্ছে জানলাটির কাছে গিয়ে বসি, কিন্তু ভয় বাবা যেমন চটে আছেন শেষকালে তাকে শুদ্ধ না দেন বন্ধ করে। তাতেও রাজী ছিল বিশু, দুজনে থাকত একরকম, কিন্তু ওঘরেই যে করবেন বন্ধ তারও তো কোন ঠিক নেই।…খেলা আর ভাল লাগছে না। শুধু তাই নয়, নন্তু-পুঁটেদের ওপরও মনটা বিগড়ে রয়েছে—ওরাই আগে গিয়ে বলে দেবে সেই ভয়েই না বিশু অত জোরে ছুটে এসে তাড়াতাড়ি দিলে খবরটা বাবাকে, নইলে বিশুর আর কি এমন মাথাব্যথা ছিল? শুধু তো তাই নয়, ছোটদার সাজা তো হলই, বিশুও খেল বকুনি, এখন আবার ছোটকাকা শাসাচ্ছে ধারাপাত আর দ্বিতীয় ভাগে দেখে নেবে। ওদের কেউ এসে আগে বললে তো আর এইটুকু হত না॥ ওদের সঙ্গে এখন আড়ি চলেছে বিশুর। চিবুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়, তবু মনে মনে আড়ি চলেছে এখনও!

একলা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল বিশু। প্রথম খানিকক্ষণ এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। কথাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সেখানে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, যেখানে তারা পান সাজছে, কুটনো কুটছে। দাঁড়ালেই তার ওপর দিয়েও একটা ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে, সে যে কেন বলতে গেল ঋ' আহ্লাদ করে এ কথা ভেবে কান্না ঠেলে আসছে বিশুর, তবু গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—ছোটদার কথা 'আহা!' করে বলছে সবাই, ভালো লাগছে শুনতে। একটা এরকম আশাও থাকে মনে, এত বলছে সবাই, কেউ যদি বাবাকে গিয়ে বলে একবার। কেউ বললে না; তারপর কাজের হৈ-চৈয়ে ছোটদার কথাটা একেবারে চাপাও পড়ে গেল।

বড় কষ্ট হচ্ছে। ছোটদা বড্ড ভালবাসে বিশুকে। আরও খানিকটা ঘোরাঘুরি করলে বিশু,—তারপর একসময় একটু একটু করে নজর এড়িয়ে গেলই চলে বেল-তলার কুঠুরিটার কাছে।

ছোটদা জানালাটির ধারে এসে চুপটি করে বসেছিল আকাশের দিকে চেয়ে।

বিশু পাশ দিয়ে গিয়ে যখন দাঁড়াল, একটু শুধু চোখ ঘুরিয়ে দেখলে, কিছু

বললে না। কিছু যে বললে না সেইজন্যে বিশুর মনটা যেন আরও উথলে উথলে উঠতে লাগলো। নিজেও একটু চুপ করে রইল, তারপর "আর কখনও বলব না ছোটদা"—বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

খানিকক্ষণ যখন কাঁদা হয়েছে, ছোটদা জানালা দিয়ে হাতটা গলিয়ে কাঁধের উপর রাখল, খুব নরম গলায় মিষ্টি করে বললে, "কেঁদো না ভাই, কারাগারে তো তোমার ছোটদা ভয় পায় না, কারাগারই তার স্বর্গ।"

আর একটু পরে কান্নাটা ভাল করে থামতে যখন চোখ মুছে চাইল বিশু, দেখে তার কাঁধে হাত দিয়ে আরও জোরে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে ছোটদা। তারপর চোখ দুটো নামিয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে, "তুই কাঁদছিস বিশু, কিন্তু আজ আমার যে কী দিন! বাবা গবর্মেণ্ট হয়ে আমায় বন্দী করেছেন—আমি জানি, ঠিকদুপুর হলেই বেহ্মদত্যি নেমে আসবে বেলগাছ থেকে; তবু কি ভেবেছিস, আমি ভয় পেয়েছি? তবু কি ভেবেছিস ভয় পাইয়ে আমায় আমার ব্রত থেকে টলাতে পারবেন বাবা?…যাও ভাই, কাঁদতে আছে?"

আরও কান্না ঠেলে আসছিল বলেই বিশুর মন হ'ল একটা কিছু না বলতে—"তোমরা কালো পতাকা নিয়ে যদি না ঘুরতে…"

ছোটদা পিঠ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে বসল, শেষ করতেও দিলে না, বলে উঠল, "কালো পতাকা ছাড়ব আমি? প্রাণ থাকতে? কালো পতাকার মানে যে কি সেটা তুমি জান না বলেই বলছ ভাই—ওটা আমাদের ঘৃণা—লোকটাকে আমরা কত ঘেন্না যে করি তাই বোঝাবার জন্যেই তো ঐ কালো পতাকা—ও কি আমরা ছাড়তে পারি? বাবা গবর্মেণ্ট হয়ে আমায় বন্দী করেছেন, আবার মুক্তি পেলেই তুলে ধরব কালো পতাকা। আমাদের যত রাগ, যত আক্রোশ, যত ঘেন্না ঐ কালো পতাকার মধ্যে। ছোটকাকাকে বাবা দয়া দেখিয়ে হাত ক'রে নিয়েছেন, তা বলে কি আমায়ও পারবেন? এখুনি ছেড়ে দিন, আমি আবার যতের বাড়ি থেকে সেই 'ফিরে যাও'—বড় পতাকাটা নিয়ে…"

এইখানেই থেমে গেল ব্যাপারটা। কে জানে সেজকাকা কতক্ষণ এসে পিছনে ছিলেন দাঁড়িয়ে, বললেন, "নাও, ঢের বীরত্ব হয়েছে, বাড়িতে কাজ, কোথায় একটু ফাইফরমাশ খেটে উপকার করবেন, তা নয়…আর যারা বাইরে থেকে আসছে—বরযাত্রী, যাদের নেমন্তন্নও করে এসেছ—তারা যখন কালো ঝাণ্ডা নেড়ে দিয়ে চলে যাবে?—নাও, বেরিয়ে এস বীরপুরুষ।"

দরজার চাবিটা খুলে দিলেন।

ঐখানেই শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। কতক্ষণই বা? একদিনের মধ্যে ঐটুকু মনটা খুব খারাপ হয়েছিল বিশুর; তারপরেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের নেমন্তন্নই খেয়ে এসেছে বিশু এর আগে, নিজের বাড়িতে হ'লে আরও কি যে চমৎকার! কত হৈচৈ করে সাজানো, গোছানো, আনা, নেওয়া, ফরমাশ খাটা! ছোটকাকা আর ছোটদাই সবার চেয়ে ছোটাছুটি করলে তারপর। একটু কষ্ট হয়েছিল বৈকি বিশুর ওরই মধ্যে একবার একটু,—মুক্তি তো পেলে ছোটদা, কিন্তু যেমন তখন জোর করে বলেছিল, কৈ গেল না তো কালো পতাকা নিয়ে আর। বিশু একবার বলেও ছিল একটু একলা পেয়ে, ছোটদা কতকগুলো কাগজের শেকল নিয়ে সামিয়ানার দিকে যাচ্ছিল, ধমক দিয়ে বললে, "দাঁড়া, আমার বলে এখন মরবার ফুরসৎ নেই, বরযাত্রীরা এসে পড়ল ব'লে—আমায় বলে কিনা কে কোথায় এসেছে, কালো পতাকা দেখাও গে!…ফু!"

সবার মতো জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল।

বিশুও যে চাইছিল ছোটদা আবার পতাকা নিয়ে বেরোয় এমন নয়, এমন হাসি-খুশি, সাজানো গোছানো ছেড়ে ছোটদা আবার গেলে বরং কষ্টই হত তার, তবু শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে।

ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল হৈ-চৈ, আমোদ-আহ্লাদ; তারপর বিকেলের শেষ দিকে যখন বরযাত্রীরা এল তখন থেকে তো আরও। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে রায়েদের খালি বাড়ি খুলে তাদের জায়গা করা হয়েছিল, তারা আসবার পর হৈ-চৈ, আমোদ-আহ্লাদ আবার দু' জায়গায় পড়ল ছড়িয়ে। বিশু যে কোন্‌খানটায় থাকবে আর কোন্‌খানটায় থাকবে না যেন ঠিক করে উঠতেই পারছে না। তারপর একটু একটু করে বরযাত্রীদের ওখানেই গেল আটকে। প্রথমত, দিদির বিয়েতে ফাই-ফরমাশ খাটা আগে যেমন ভালো লাগছিল আর তেমন ভাল লাগছে না, আর বাড়ির দিকে থাকলে একটা না একটা কিছু করতেই হয়, সবটা শেষ পর্যন্ত ওর ঘাড়েই এসে পড়ে কিনা! বড়দা মেজদাকে কিছু আনতে বললে, মেজদা বললে ছোটদাকে, ছোটদা বললে বিশুকে; সেজকাকা সেজদাদাকে কিছু রেখে আসতে বললে, সেজদাদা বললে ছোটদাকে, ছোটদা বললে বিশুকে। তার চেয়ে এদিকে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট। তারপর যখন থেকে দিদির বরের সঙ্গে আলাদা হ'য়ে গেল তখন থেকে তো কথাই নেই, কি ভালো লাগছে যে বিশুর এখানটা।

কি চমৎকার বর যে হবে দিদির।…বিশু আস্তে আস্তে দোরের কাছ থেকে

উঁকি মেরে দেখছিল। একলা ছিল দিদির বর, ডাকলে—

"তোমাদের বাড়ি এখানে খোকা ?"

আরে। সে দিদির ছোট ভাই, যার সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বাড়ি তা হলে কোথায় হবে আবার !···পেটে যেন সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল বিশুর, তবে লজ্জাও তো করছিল একটু একটু, কিছু বললে না, শুধু মাথা নাড়লে।

"এঁদের কেউ হও, যাঁদের বাড়িতে বিয়ে ?"

এত হাসি পাচ্ছে বিশুর। এবার মুখে হাতটা চেপে একটু হেসে নিয়ে বললে, "দিদির ছোট ভাই।"

"সে তো ছোট হলে সব ভাই-ই সব দিদির ছোট ভাই···"

আবার মুখ চেপে খানিকটা হেসে নিলে বিশু; বললে, "সব দিদি নয়···"

"তবে ?"

"যে দিদির বিয়ে হবে।"

দিদির বর একটু চুপ করে গিয়ে বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় করে নিয়ে, হাসি-হাসি করে নিয়ে চেয়ে রইল একটু, তারপর একবার চারিদিক দেখে নিয়ে একটু গলা নামিয়ে বললে, "আরে, বড় কুটুম ! আগে বলতে হয় !"

কাছে টেনে জড়িয়ে ধরলে বিশুকে। তারপর থেকে যে কি ভাব হ'য়ে গেছে দিদির বরের সঙ্গে। কি যে চমৎকার দিদির বর।

আর কি সুন্দর যে নিদবর ! তার সঙ্গেও ও-ই ভাব করিয়ে দিলে কিনা। ওরা গল্প করছিল, এমন সময় সে এল। বিশুর মতোই; শুধু হাফ প্যাণ্ট পরা নয়, ধুতি পাঞ্জাবী। দিদির বর বললে, "নাও, ভাব করো, কে বলো দিকিন ?"

কি করে জানবে বিশু ? শুধু একটু হাসলে একবার ওর দিকে দেখে নিয়ে।

"তুমি যেমন দিদির ছোট-ভাই, ও-ও তেমনি দাদার ছোট ভাই।"

এই সময় আর-একজন এসে বসল, দিদির বরের মত অত বড়। দিদির বর তাকে বললে, "এটি আমার বড় কুটুম হে নিখিল।"

ও একটা "নমুনা" না কি বললে—তাইতে দুজনেই একটু একটু হেসে উঠল। তারপর দিদির বর আবার সেই ছোট ছেলেটিকে দেখিয়ে চোখ বাঁকিয়ে বললে, "ও শুধু দাদার ছোট ভাই-ই নয়। আবার ছোট বরও আজকে—নিদবর জানো তো ?"

জানে না যেন বিশু ! সে কথা বলবার আগেই কিন্তু দিদির বর বললে, "এক কাজ করবে ? ওর জায়গায় দিদির বিয়ের নিদবর হবে ?"

নিখিল ওকে বলল, "তোমার যে সবুর সয় না; হতে না হতেই ঠাট্টা!"

দিদির বর তা হলে ঠাট্টাই করছে! বিশু বেচারী তো জানে না ঠাট্টা করতে, তবু মনে হল কথাটা উলটে দিলে যেন মজা হতে পারে একটা। ততক্ষণে অনেক কথাও হয়েছে, আর লজ্জা নেই। দিদির বরের কোলেই আর একটু গুটিয়ে বসে, মুখটা তুলে বললে, "আর ও দিদির ছোট ভাই হবে?"

দুজনেই হেসে উঠল, তবে নিখিলবাবু যেন বাবাদের তাসের আড্ডার মতো উঠল হেসে, ওকে দিদির বরের কোল থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বললে, "বেশ ভাই, বাঃ! চল মিষ্টিমুখ করাইগে তোমায়। আমি তোমার দলে কিনা, ওর বোনকে বিয়ে করেছি।"

কি হ'ল জানে না বিশু; তবে একবার যে ভয় হয়েছিল দিদির বর হয়তো রাগ করবে, সে-সব কিছু নয়, বরং আরও ভাব হলো ওর সঙ্গে, আবার ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে; আরও কত গল্প হল। কী যে চমৎকার দিদির বর!

সন্ধ্যার সময় সব আলো জ্বলে উঠলো। অত আলো এর আগে দেখে নি বিশু। তারপর একটু রাত হ'লে কত বাজনা-বাজি ক'রে, কত ফুলপাতায় সাজানো মোটরে করে—পিছনে আরও কত মোটর—দিদির বর এসে নামল। ওঃ, কি সুন্দর! সেই বর নাকি! বিশু তো আগে চিনতেই পারে নি; কত সুন্দর সাজগোজ! এত ভাল লাগছিল বিশুর। আর দিদির বরের জন্যেই তাদের বাড়িতে আজ এত কাণ্ড ব'লে আরও যে কত ভালো লাগছিল। তারপর যখন নেমে খানিকটা এসে আর সবাইকে ছেড়ে বিশুর দিকেই চেয়ে হেসে, তার হাত ধরে শামিয়ানার মধ্যে ঝকমকে রাঙা আসনটায় এসে বসল, ও ' যে আরও কত ভাল লাগছিল বিশুর; কত মস্তবড় মনে হচ্ছিল নিজেকে; বিশু ভেবেই কূল পাচ্ছিল না!

তারপর গান, বাজনা, বাজি পোড়ানো। তারপর বাড়ির মধ্যে দিদির বরকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে, আগে একলা একলা, তারপর দিদিকে নিয়ে এল সবাই। কি সুন্দর দিদিকে দেখাচ্ছিল, কি সুন্দর কাপড়, কত গয়না!...কত আলো, কত লোক!

এদিকে বাইরে ভোজ। এত বড় ভোজ তো বিশু আর কখনও দেখে নি বাড়িতে। নুন পরিবেশন করলে, জ. পরিবেশন করলে, পুঁটে যখন ছুটে ডাকতে এল—"দেখবি আয়, তোর দিদিকে এবার বাসরঘরে নিয়ে যাচ্ছে সবাই"—বিশু বড়দের মত বললে, "দাঁড়া, আমার নাকি এখন মরবার ফুরসৎ আছে?"

বাসরঘরও দেখে এসেছিল, অবশ্য পুঁটে সে কথা জানে না। উপরের বড় ঘরটায় ঝকমক করছে ইলেকট্রিক আলো, অন্য কোনও ঘরটায় আর তত আলো নেই। একঘর মেয়ে, সবাই সেজেগুজে, গয়না পরে, কতরকম এসেন্সের গন্ধ আসছে ভেসে, আর সবাই হাসি-খুশি। এরকম আর কখনও দেখেনি বিশু এ-বাড়িতে—কোন বাড়িতেই। ঘরের মাঝখানে বসে আছে দিদির বর আর দিদি। ওঃ, এখানে আবার কত সুন্দর যে দেখাচ্ছে দিদির বরকে, আশ্চর্য বোধ হচ্ছে বিশুর; যতবার দেখবে ততবার আরও সুন্দর হয়ে যাবে নাকি দিদির বর? কি ভালো যে লাগছিল।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনলে বাসরঘর থেকে কত গান কত বাজনা আসছে ভেসে···দিদির বর ওকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত আলো, কত গান, কত খাবার, কত খেলনা, কত আদর···

এটা কিন্তু স্বপ্ন দেখেছিল বোধহয়। সকাল বেলা উঠে দেখে বিছানাতেই শুয়ে সে। উঠে পড়ল বিশু, কালকের সেই সব কথা মনে পড়ছে।

একি, সবটাই স্বপ্ন ছিল নাকি? বাড়িতে সাড়াশব্দ নেই, শুধু কয়েকজন চাকর-বাকর এদিক-ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে আস্তে আস্তে। চারিদিকে নোংরা। বাইরে গিয়ে দেখে, শামিয়ানা-টানা কিছু নেই, শুধু একখানা বড় সতরঞ্চি একদিকে গোটানো পড়ে আছে···ঘুমন্ত বাড়িতে একটু ঘোরাঘুরি করে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল বিশু। বুকটা টিপটিপ করছে—এইরকম সবটাই যদি স্বপ্ন হয়—বাসর-ঘর, দিদির বর, সেই রকম দিদির···

বাসরঘরটা বন্ধ, আর সব ঘরের মতোই।—কান্না-পাচ্ছে বিশুর, গলা টনটন করছে।

না, স্বপ্ন তো নয়! তবু একটা যেন কি। বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠল। দিদির বর তো একেবারেই আর তত সুন্দর নয়। মুখ শুকিয়ে গেছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখের সেই ফোঁটাগুলো মুছে মুছে গেছে; হাসি নেই একেবারে, ওকে দেখেও তো কিছু বললে না, বিশু দেখে হাসতে যাচ্ছিল ব'লে অভিমান হ'ল ওর, কান্নাটা যেন এবার বেরিয়েই পড়বে।

আরও সবাই উঠল। খানিকটা হৈ-চৈ ঘোরাঘুরি হল আরম্ভ, কিন্তু কেমন যেন চাপা, কালকের সঙ্গে কিছু মিল নেই—কালকের সেই স্বপ্নের সঙ্গে।

তারপর আবার ঘুরতে ঘুরতে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে, মা একধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।···মনটা হুহু করছে বিশুর, আর সামলাতে পারছে না নিজেকে, জিজ্ঞেস

করতে সাহস হচ্ছে না কাউকে।...তারপর একবার দেখে পিসিমাও কাঁদছেন—তারপর আরও সবাই, লুকিয়ে লুকিয়ে, চোখ মুছে মুছে...

তারপর একবার দেখে দিদি নিজেই বাবার ঘরে বিছানার কোণের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। পিসিমাদের রাখুদিদি পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে আছে। বিশু জানত না বলে একেবারে ভিতরে চলে গিয়েছিল, রাখুদিদি ওকে দেখে বললে—"এই যে বিশু, একটু দাঁড়া তো ভাই দিদির কাছে, আমি আসছি এখুনি।

বিশু ভয়ে ভয়ে, লজ্জায় লজ্জায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলতেও পারছে না। কিছু না বললেও দাঁড়াতে পারছে না। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "কাঁদছ দিদি?—কেন?"

দিদি ওকে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিলে, তারপর সে কি কান্না! আর থামতেই পারে না। তারই মধ্যে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'আমায় যে তোদের কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে ভাই একেবারে—"

আরও কত সব বললে—দিদিকে যেন দেখে আসে বিশু—যেন খোঁজ নেয় দিদি গেল, কি, রইল।—যেন ভুলে না যায়—আরও কত কি সব!

এই দিদির বর, ওদের জামাইবাবু। মিলছে দিদির কথার সঙ্গে; আজকের জামাইবাবু—কেমন যেন শুকনো, রোগা, উস্কখুস্ক—দেখলে তেমন করে হাসে না, এ সব পারে। বাড়িশুদ্ধ লোকের চোখের জল নামিয়েছে। দিদিকে নিয়ে যাবে একেবারে—ধরে রাখবে, ছাড়বে না...বিশু গেলেও কি দেখতে দেবে?—পাতালপুরীর কোন্ লুকনো ঘরে—সোনার পালঙে শুইয়ে রেখে পাহারায় থাকবে দাঁড়িয়ে!

অবশ্য অত শুকনো, অত বিশ্রী ছিল না সমস্ত দিন দিদির বর। নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হল, তবুও কালকের মতন নয়...কালকেরটা ছিল স্বপ্নই।

ডেকেছিল বিশুকে একবার, যখন একবার দেখলে বিশুকে। যায়নি কিন্তু বিশু।...আর ভালবাসে না, যাবে না কখনও আর।

দিদিকে নিয়ে যাবে তিনটের সময়। বরযাত্রীরা রয়েছে সেখানেই, জামাইবাবু কিন্তু বাড়িতে আছে আজ সকাল থেকেই। ও রয়েছে বলেই বাড়িটাও যেন আর ভাল লাগছে না বিশুর, আড়াল থেকে এক-একবার যা দেখেছে তাতে কি যে মনে হয়েছে...তবে, সেটা ভালবাসা নয় মোটেই। তারপর খাওয়া-দাওয়া ক'রে চলে গেছে নন্তুদের বাড়ি। যতীনদার ভাই নন্তু, ওর সঙ্গে ভাব সবচেয়ে বেশি।

কোনখানে লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শুধু নন্তকেই যায় সব কথা বলা।

যাবার সময় খোঁজ পড়েছিল বিশুর, দিদি আবার সবচেয়ে বেশি ওকেই ভালবাসত। কিন্তু পাওয়া গেল না খোঁজ। গাড়ির সময় উতরে যায়, বেরিয়ে পড়তেই হ'ল।

তারপর পাওয়া গেল দেখা।

বোসেদের পুরোনো বাড়ির পাশে যেখানে তিন-চারটে ছোট ছোট আতা গাছের ঝোপ—সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশু। বিশু আর নন্ত। ঝোপের আড়ালে ভালো দেখা যায় না, তবে একটা জিনিস স্পষ্টই যাচ্ছে দেখা—দুটো লাঠিতে আটকানো সেই কালো পতাকাটা, একদিকে ধরেছে বিশু, অন্যদিকে ধরেছে নন্ত, আতা-ঝোপের আড়াল থেকে, পতাকাটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে! কালো কাপড়ের ওপর বড় বড় সাদা অক্ষরগুলি যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে—

—ফিরে যাও ডালেস। চাই না তোমায়।

দিদির বর নেমে হাসতে হাসতে তুলে নিলে বিশুকে।

সবার হাসি ছাড়িয়ে বিশুর কান্না সব চেয়ে ওপরে উঠল। সকাল থেকে যত কান্না ছিল জমা। হাত-পা ছুঁড়ে অস্থির করে দিল সবাইকে, যাবে না, জামাইবাবুর সঙ্গে কোথাও যাবে না, ও দত্যি, ও দিদিকে নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধ করে রাখবে। কখনও দেবে না আসতে।*

* পঞ্চাশের দশকে একবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালেস ভারতে এলে কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাঁকে বয়কট করা হয় কালো পতাকা দেখিয়ে, তাঁর কোন ভারত-বিরোধী মতামতের জন্য।

আবিষ্কার

বারান্দায় উঠে কড়া নাড়তে চাকর এসে দরজা খুলে দিলে।

জিজ্ঞেস করলাম, "সময় আছে ?"

"একটু বাজারে গেছেন দুজনে। বসুন না, এক্ষুনি আসবেন!"

উত্তরটা দিয়ে সরে দাঁড়াতে ভেতরে গিয়ে একটা সোফায় বসলাম। কয়েক

জোড়া পায়ের ওপর থেকে নেমে আসার শব্দ উঠল। একটু ভারি, আর সঙ্গে একটু হাল্কা, তার চেয়েও একটু হাল্কা। একটু পরেই তিনটি ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়াল, ঘরে-পাতা গালিচার ওপর। ছেলেটি বড়। বয়স দশ বারো বছর হবে। পরের দুটি মেয়ে। বছর কয়েক করে বাদ দিয়ে। প্রশ্ন করলাম, "কোথায় গেছে তোমাদের বাবা মা ?"

সব চেয়ে ছোট মেয়েটি হাঁটুতে হাত দিয়ে সব চেয়ে শেষে নেমে ইতিমধ্যে সব চেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বছর তিনেকের হবে। ছেলেটির কিছু বলবার আগে সে-ই উত্তরটা দিল,—"বাবা মাল্ ছজে দোকানে গেছেন গো। তুমি চা ঠাবে ?"

ওরা দুজনে খিল খিল করে হেসে উঠল , যেন ইচ্ছা করেই তামাসাটা দেখছিল। ছেলেটি বলল—"ঐ জন্যে দাদু-দিদিমা ওর নাম দিয়েছেন গিন্নী-দিদি। আমাকেই তো জিজ্ঞেস করেছেন আপনি। আমি বলব। ও কিন্তু এগিয়ে যাবেই।"

বললাম, "তুমি যদি না এগোও তো ও এগুবে না ?"

ছোট্ট মেয়েটি কাছেই এসে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিয়ে ডান হাতে মুঠো তুলে ধরে বললাম, "কী বল গিন্নী-মা। তুমি আমাদের আবার মা-ই হলে তো ?"

মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানিয়ে আবার প্রশ্ন করল, "চা ঠাবে ?"

"খাব 'খন। বোস। গল্প করি আগে।"

ওরা দুজনে মুখে একটু করে কৌতুকের হাসি নিয়ে তামাসা দেখছে, ছেলেটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম,—"তা তোমরা কবে এলে পাটনা থেকে বিলু ?"

"আজ সকালে..."

ছোট মেয়েটি বলে উঠল, "ওগো, গাগি তিন ঘণ্টা লেট খিল !"—ঘুরে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে আমার মুখের দিকে চাইল।

ওরা দুজনে সামনের সোফাটায় বসেছে। খিলখিল করে হেসে উঠল !

দিদি বলল, "ঐ তো গিন্নীর বিদ্যে—পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে—তিন !"

"তিন নয় গো ?"—একটু অনুযোগের দৃষ্টিতে আমার পানে ঘুরে চাইল। বললাম,—"ওর কথা শুনো না। আঙুল তো তোমার। তিন হল কি পাঁচ হল, ও কী করে জানবে ?"

একটু যে ধাঁধায় পড়ে গেছে, সেই সুযোগে বিলুকে প্রশ্ন করলাম,—"তা সকালে এসে যে আবার বিকেল হতে না হতেই দুজনে বাজারে ছুটেছে !"

"পুজোর জামা-কাপড় কিনতে।"—ছেলেটি উত্তর দিল। বলল, "সেখানে

[illegible] তো দেরী হয়ে গেল।”

“তা তোমাদের নিয়ে গেল না যে?”—গল্প চালাবার জন্যেই প্রশ্ন করলাম।

বলল—“বাপ নিয়ে গেছেন?”

একটু থেমে নিয়ে বলল, “আর জানেন?”

আবার একটু থেমে বোনের দিকে চেয়ে বলল, “বলে দেব খুকু?”

খুকু ঠোঁট দুটো জড়ো করে হেঁট করে ছিল। বলল, “বল না। টি হবে।

বিনু বলল, “বাবা বলেন, ‘খুকু একটু বড় হয়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি না হলে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না।’ যত্ত গল্প জুড়ে দেয় তো, বাড়ির কথা বলে। নিয়ে যাবেন কী করে?”

বড় মেয়েটি নাকী সুর বলল, “ব্যস্! ও না গেলে আমাদের যাওয়াও বন্ধ। দেখুন না।” আমি কোলে একটু চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তাই নাকি খুকুমণি?”

গোল মুখটা তুলে, আমার চিবুকে হাত দিয়ে বলল—“আমি জানি, টা বব্বো না? বলি টো?”

“কী সব জানো, আমায় বল তো? আমি তো দোকান করছি না, কিছু না।”

ওদের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটু চোখ নাচিয়ে বলল, “বব্বো টো। অনেক কটা।”

তারপর আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, এবার যেন কিছু বলতে যাবে, এমন সময় বাইরে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ানোর শব্দ হল।

“ব্যাবা এসেছে”—বলে ওরা দুজনে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমিও ওকে নামিয়ে দাঁড়াতে যাব, খুকুমণি মুখের দিকে চেয়ে বলল,—“ওগো, ছোন”—একটু মগ্ন হয়েই।

দুটো প্যাকেট নিয়ে একটু হন্তদন্ত হয়েই সময় এসে ঢুকল। বলল—“এই দ্যাখো! তুই এসে বসে আছিস! কতক্ষণ?”

“তুই এলেই যতক্ষণে ছুটোছুটি করতে বেরিয়ে গেছিস। কী ব্যাপার বল্ দিকি?”

“আর বলিস নে ভাই, ভোরে গাড়ি পৌঁছুবার কথা। মোকামার লাইনে মালগাড়ি ডিরেল্‌ড্ হয়ে তিন ঘণ্টা লেট। সকালেই বাজারটা সেরে রাখবার কথা। আর উপায় নেই। খেয়েদেয়েই বেরিয়ে পড়তে হল।”

“এদের বাড়িতে রেখে?”

“বিয়েবাড়ি তো! ‘নেই’ আঁকজমক দেখে মেয়েটো কাকে কী জিজ্ঞেস করেছে, [illegible] কী বলেছে, ওই থেকে যেখানে যাবে সে রেলই হোক দোকানই হোক—

কন্যাও করে না বলা পর্যন্ত···বলে দোষ হবে ?"

"যাও না, আমি জানি গো।"

সমর হেসে উঠে কী বলতে যাবে, ওর বৌ অনুরাধা এক বাক্স প্যাকেট নিয়ে দুটো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়েও উঠে এল। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "অনেকক্ষণ বসে আছেন নিশ্চয়ই ?"

'বসিয়ে রাখলে কী করব, তবু এতক্ষণ খুকুমণির সঙ্গে গল্প করছিলাম, অসুবিধে হয় নি। আবার কী একটা মস্তবড় কথা বলবে বলেছে।"

অনুরাধা ওর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "খবরদার বলছি—বসুন, আমি আসছি এগুলো রেখে।"

সমর হেসে কী বলতে যাচ্ছিল, সিঁড়ির কাছ থেকে ডাক এল—"ওগো, একবার এসো শিগগির। ওটাকেও নিয়ে এসো। ফ্রকের মাপটা দেখবে।"

সমর—"এখুনি আসছি ভাই"—বলে হাসতে হাসতে উঠে পড়েছে, খুকুমণিও নামতে যাবে কোল থেকে, আমি একটু চাপ দিয়ে বললাম—"বাঃ আমায় সেই কথাটা বলতে হবে না ?"

"শোন—"

আমি কান এগিয়ে দিতে খুকু বলল, "বাবা মাকে কি হয় বলো তো ? বর্ হয় মেজদাই। টোপর চড়ে বিয়েতে অনেক আলো—অনেক বাজনা—অনেক গালি —অনেক ছব......"

সমর হাসতে হাসতে নেমে এল। বলল, "শুনিয়ে ছাড়লে তো ? ওই এক রোগ দাঁড়িয়েছে।"

আমি বললাম, 'হ্যাঁ! ও বলছে 'বাবা মার বর হয়'।"

অনুরাধাও সব দেখে হাসতে হাসতে নেমে এসে বসল, "দিলে তো শুনিয়ে ?"

বেশ হাসি উঠল একটু। ওদের দুজনকে ওপরেই রেখে এসেছে। অনুরাধার সঙ্গে আমার একটু ঠাট্টার সম্বন্ধ অন্য দিক দিয়েও। বললাম, "অত ভয়েরের কথা! মেসো নয়, অন্য কেউ নয়, স্বয়ং বাপ—তা, বাপের এত বড় গৌরব! এত বড় ব্যাপারটা ও আবিষ্কার করেছে, বলবে না সবায়ের কাছে ?"

"ব্যস্! চলল·· আমি তা হলে উঠলুম।" বলে রাধা ওঠবার উপক্রম করল।

অবশ্য উঠল না। এই রকটা একটু নাড়াচড়া করবার জন্যেই আমি আবার পাটনার প্রসঙ্গটা তুললাম।